ত্রয়ী

বাল্মীকি ও কালিদাস
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

মিত্রালয়
॥ ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২ ॥

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ নিবেদন ॥

পালি 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' বইখানির ভিতরে ভারি সুন্দর ছোট একটি উপাখ্যানে দেখিতে পাই, মানুষের মৃত্যুর পরে যে আবার পুনর্জন্ম হয় সে সম্বন্ধে রাজা মিলিন্দ ভদন্ত নাগসেনকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে সে কি যে মরিয়া যায় সে, না অন্য ?' নাগসেন উত্তর করিলেন,—'একেবারে সে-ই নয়, আবার অন্যও নয়।' এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের ব্যাখ্যায় তিনি আরও অনেক উপমা দিয়াছেন। যেমন আমরা একটি আম মাটিতে পুঁতি, তাহা হইতে নূতন গাছ হয়, সেই গাছ হইতে কালে আবার নূতন আম হয়। এই আমগুলি যে আমটি বপন করা হইয়াছিল ঠিক সেই আমই নয়. আবার একেবারে সম্পূর্ণ পৃথকও নয়, এই উভয়ের ভিতরে একটা আশ্চর্য যোগ আছে। ছ'মাসের শিশুকন্যা যখন আঠার বছরের যুবতী হইয়া ওঠে তখন তাহারা দুইজনে সম্পূর্ণ একও নয়, সম্পূর্ণ পৃথকও নয়।

মানুষের সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও দেখিতে পাই এই একই সত্য। অতীত যে একেবারে নিঃশেষে চলিয়া যায় তাহা নয়, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আবার আছে তাহার পুনর্জন্ম বর্তমানের রূপে। বর্তমান অতীতের সহিত একেবারে একও নয়, আবার অতীত হইতে সে সম্পূর্ণ পৃথকও নয়; একেরই কর্মানুযায়ী রূপান্তরিত পুনর্জন্ম হইতেছে অপর। ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করিতেই গ্রন্থখানি লিখিত। আশা করি এই আলোচনার ভিতর দিয়া বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের কতকগুলি মূল ধারারও সন্ধান পাওয়া যাইবে, আবার বাল্মীকি, কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভাকেও পূর্ববর্তিগণের সহিত তুলনায় স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার সুবিধা হইবে।

গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ-কবি কালিদাসের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া আদি-কবি বাল্মিকীর সহিত তাঁহার যোগ দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই যোগের সন্ধান না পাইলে কালিদাসের কবি-প্রতিভাকে কখনও সম্পূর্ণ বোঝা হয় না।

আবার ভারতের বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট কবি-প্রতিভাকেও ভাল করিয়া বোঝা হয় না যদি সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত—বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগকে আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে না পারি। গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে সেই যোগটিকেই স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

এক কবির সহিত অন্য কবির যোগের প্রকার এবং পরিমাণ বিচার করিতে গিয়া বহুস্থানেই উভয় কবির কাব্য পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিতে হইয়াছে, এবং এ-জন্য উভয় কবিরই কাব্যাংশ বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। আশা করি উদ্ধৃতির এই 'বহুলতা' 'বাহুল্য' বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশের বই বহুদিন হয় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল; পরিবর্তন পরিবর্ধনের জন্যই নিঃশেষ হইবামাত্র পুনর্মুদ্রিত করি নাই। সময় সুযোগের অভাবে কয়েকবৎসর যাবৎ গ্রন্থখানি পড়িয়াছিল। এবারে গ্রন্থখানির পরিবর্তন খুব বেশি করি নাই—পরিবর্ধন অনেকটা করিয়াছি। 'মিত্রালয়ে'র পক্ষ হইতে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থখানির প্রকাশভার সানন্দে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

৪১/৩৫ চারু এভেনিউ
কলিকাতা-৩৩

বিনীত
গ্রন্থকার

বাল্মীকি ও কালিদাস

॥ ১ ॥

যে যুগে রামায়ণ মহাভারতের মত কাব্য রচিত হইত সে যুগের কাব্যও যেমন ছিল বিপুলায়তন, সে যুগের কবিগণও ছিলেন তেমনই বিপুলায়তন। একটি দানাকে কেন্দ্র করিয়া যেমন স্ফটিকের সকল দানা একত্রে বাঁধিয়া উঠে অথবা একটি জীবকোষকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য কোষের সমবায়ে যেমন জীবদেহ গড়িয়া ওঠে, সে-যুগে তেমনই একটি বিশেষ প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া সে যুগের ছোট বড় সকল প্রতিভা একত্রে দানা বাঁধিয়া উঠিত। বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ বা ব্যাস-রচিত মহাভারত পাঠ করিলে মনে হয়, কয়েক দিনে বা কয়েক বৎসরে কোনও বিশেষ কবি এই বিপুলায়তন কাব্যগুলি রচিত করেন নাই, এই কাব্যগুলি বহন করিতেছে একটি বিপুল যুগের জীবন-ইতিহাস,—তাহারা রচিতও হইয়াছে একটি বৃহৎ যুগ ব্যাপিয়া। নলের পূর্ত-প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া বিপুল বানরবাহিনীর কর্মতৎপরতা যেমন দক্ষিণ সাগরের উপরে বিরাট্ সেতুবন্ধ নির্মাণে সক্ষম হইয়াছিল, তেমনি করিয়াই বাল্মীকি এবং ব্যাসের প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া সে-যুগের অসংখ্য কবির ছোট বড় বহু সাহিত্য-সাধনার সমবায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে রামায়ণ ও মহাভারতের কাব্য-পরিধি। এইরূপ ছোট বড় বহু কবিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই বিপুলায়তন রামায়ণ ও মহাভারতের কবিরাও বিপুলায়তন।

যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন পর্যন্তও মানুষের সমাজ-বিবর্তন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদগ্রতাকে প্রসব করে নাই; সমাজ ব্যবস্থায় তখন পর্যন্ত চলিতেছিল যৌথ-কারবারের লেন-দেন। কাব্যের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই সেই যৌথ-ব্যবস্থা। বড় বড় মহাজনের বিপুলায়তন বাণিজ্য-পোতের সহিত নিজেদের ভরা বাঁধিয়া দিয়া ছোট ছোট মহাজনেরা নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীতে ভাসিয়া পড়িতেন; এবং তাহা করিয়াছেন বলিয়াই এখন পর্যন্ত তাঁহাদের ভরা ডুবি হয় নাই; হাজার হাজার বৎসরের ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করিয়াও রামায়ণ মহাভারতের ভিতর দিয়া সে ভরা আসিয়া আমাদের বিংশ শতাব্দীর ঘাটে ভিড়িয়াছে।

কালিদাস এবং বাল্মীকির ভিতরকার যথার্থ সম্বন্ধ নির্ধারণ করিতে হইলে কবিগুরু বাল্মীকির কবি-পুরুষটিকে এমনি ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার

প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, একান্ত সংশয়াতীত না হইলেও কালিদাস যেমন করিয়া ঐতিহাসিক পুরুষ, বাল্মীকি আমাদের নিকটে তেমনতর ঐতিহাসিক নন। লৌকিক এবং অলৌকিক বহুবিধ কাহিনী এবং কিংবদন্তীর কুজ্ঝটিকার অন্তরাল হইতে বাল্মীকির যথার্থ কবি-সত্তাটিকে আজ আর খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। সুতরাং প্রথমেই সংশয় আসে, কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ নির্ধারণ করিতে বসিয়াছি। আমরা তাই যখনই কবি বাল্মীকির কথা বলি তখন বাল্মীকির কবি-সত্তা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা কি বুঝি সে প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাল্মীকি আমাদের নিকটে কোন বিশেষ ব্যক্তি-পুরুষ নহেন, তিনি রামায়ণিক যুগের কবি-প্রতিভার প্রতিনিধিস্বরূপ।

রামায়ণ কাব্যখানিকে আজ আমরা যেরূপে পাইতেছি এইরূপে যে ইহা বাল্মীকি নামক কোনও একজন ঐতিহাসিক কবির লিখিত নয় এ সংশয়ের যৌক্তিকতা গ্রন্থের ভিতরেই এখানে-সেখানে নিহিত আছে। প্রারম্ভেই দেখি, বাল্মীকি এই কাব্যাংশ লিখিত হইবার কালে ব্রহ্মা-নারদাদির সমশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার ভিতরকার অলৌকিক উপাদানের কথা বাদ দিলেও দেখিতে পাই, বাল্মীকি মুনির কবিত্বলাভের ইতিহাস তিনি নিজেই স্বহস্তে একটি তৃতীয় পুরুষের ন্যায় অমন কলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এ-কথা মন খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে চাহে না। 'উত্তর-কাণ্ডে'র সব না হইলেও অনেকাংশ যে উত্তরকালের যোজনা এ-কথার আভাস হয়ত এই কাণ্ডটির নামের ভিতরেই নিহিত আছে। এরূপ সংশয়ের স্থল বহু রহিয়াছে। কিন্তু আমরা কোন ঐতিহাসিক তর্কের ভিতরে বর্তমান আলোচনায় প্রবেশ করিতে চাহি না। মোটের উপরে আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য আদি-কবি বাল্মীকিকে আদি কবি-সমাজের মুখপাত্র বা প্রতিনিধিরূপেই গ্রহণ করিব, আমাদের নিকটে আদি কবি-সমাজের যৌথরূপের অভিব্যক্তিই আদি-কবি বাল্মীকি।

কিন্তু এ-সত্ত্বেও একটা মুস্কিল থাকিয়াই যায়। বাল্মীকির বিরাট্ পক্ষপুটে যে শুধু বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন কবিই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক অর্ধপ্রাচীন এবং অর্বাচীন কবিও এই কবির দলে ভিড়িয়া গিয়া বেমালুম আত্মগোপন করিয়াছেন। সমস্যা ইঁহাদিগকে লইয়া। কিন্তু এ-সমস্যার কোন সমাধান নাই। পাণ্ডিত্যের কম্পাস্ এখানে দিঙ্-নির্ণয় করিতে সাহায্য না করিয়া দিগ্-ভ্রান্তও করিয়া তুলিতে পারে। সেই জন্যই

পণ্ডিত-সুলভ ছাঁটকাটের ভিতরে আমরা বেশী যাই নাই। এ-ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই, আমরা আমাদের আলোচনায় বাল্মীকি সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি তাহার সমর্থনে রামায়ণের বিশেষ কোন অংশের একটি-আধটি দৃষ্টান্তের উপরই নির্ভর করি নাই,—গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ হইতে উদ্‌ধৃতির দ্বারা সেই কথা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এই প্রমাণ-প্রয়োগের ভিতরে অ-খাঁটি অংশ যেটুকু থাকিবার সম্ভাবনা তাহা দ্বারা আমাদের মূল বক্তব্য খুব শিথিল হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের ভারতবর্ষ গুরুবাদের দেশ; কিন্তু গুরুবাদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, গুরুর মাহাত্ম্য স্থাপনের দ্বারা শিষ্যের গৌরব কোথাও ম্লান হয় না,—আরও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া ওঠে। আদি-কবি বাল্মীকিকে তাই পরবর্তী কবিগণ কবিগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাল্মীকি সম্বন্ধে এই আদিকবি এবং কবিগুরু আখ্যা দুইটির সার্থকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রামায়ণই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম কাব্য। এই প্রসঙ্গেই প্রথমে বেদের কথা উঠিতে পারে। বেদের ভিতরে কবিত্ব যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু তাহা অবিমিশ্র নহে। বৈদিক ঋষিগণের গাথাগুলির ভিতরে একটা বিস্ময়ের প্রেরণায় ধর্ম এবং সাহিত্য পরস্পরে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য মহাভারত রামায়ণের পরবর্তী না পূর্ববর্তী রচনা এ-বিষয়ে পণ্ডিত মহলে সংশয় রহিয়াছে। কিংবদন্তী অনুসারে রামায়ণ পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বহু পণ্ডিতের মতে মহাভারত প্রাচীনতর। এই পরবর্তী মত স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে পারি, রামায়ণই ভারতবর্ষের আদিকাব্য। মহাভারত মূলতঃ ইতিহাস; বর্তমান যুগে আমরা তাহাকে 'মহাকাব্য' শিরোনামায় পরিচিত করাইলেও তাহার প্রাচীনতর পরিচয় ইতিহাস রূপে। এই ইতিহাসের ভিতরে রাজনীতি আসিয়াছে, সমাজনীতি আসিয়াছে, ধর্মনীতি আসিয়াছে, তাহারই ভিতরে ফুটিয়াছে তাহার কাব্যত্ব। কিন্তু কাব্যত্বে মহাভারতের মুখ্য পরিচয় নহে। রামায়ণের ভিতরে আবার রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্মের কথা যেটুকু থাকুক না কেন, কাব্যত্বেই তাহার মুখ্য পরিচয়। এই জন্যই বলিতে হয়, রামায়ণই ভারতবর্ষের আদিকাব্য এবং বাল্মীকিই ভারতবর্ষের আদিকবি। এই আদিকবিকে কবিগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ভারতবর্ষের সকল কবি। তাই কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধুসূদন পর্যন্ত এই কবিগুরুর চরণে প্রণতি জানাইয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস বাল্মীকির এই কবিগুরুত্বকে শ্রদ্ধায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং কালিদাসের ভাস্বর প্রতিভার উপরে বাল্মীকির শিষ্যত্বের ছাপ অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই শিষ্যত্বের ছাপ শুধু 'রঘুবংশে' নহে, কালিদাসের সমগ্র কাব্যসৃষ্টির ভিতরে ছড়াইয়া আছে; তাহারই বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কোনও কবি-প্রতিভার উপরে পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কবি-প্রতিভার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে সর্বদাই যেন একটা সঙ্কোচ রহিয়া গিয়াছে, পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক প্রভাব গ্রহণের ভিতরে যেন কবি-প্রতিভার প্রকাণ্ড একটা দৌর্বল্য প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রভাব-গ্রহণের ভিতরে এক দিকে যেমন একটা দুর্বলতা থাকিয়া যাইতে পারে, অন্য দিকে সে যে দৃঢ় বলিষ্ঠতারও পরিচায়ক এ-কথাটা সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অক্ষমের প্রভাব-গ্রহণ কাব্যসৃষ্টির ভিতরে আত্মপ্রকাশ করে হীন চৌর্যবৃত্তিতে ও অধম অধিকারীর ক্ষেত্রে তাহা দেখা দেয় অন্ধ অনুকরণের রূপে। কিন্তু সবলের ক্ষেত্রে তাহা দেখা দেয় স্বীকরণের রূপে। এই সার্থক স্বীকরণের ভিতরে প্রতিভার দৈন্য নাই, সক্রিয় সবলতা আছে, তাহার গ্রহণ-শক্তি এবং পরিপাক শক্তির প্রাচুর্যের পরিচয় রহিয়াছে।

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই প্রাচীনের স্বীকরণের ভিতরে অবমাননা নাই, ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে। নিরন্তর এই স্বীকরণের ভিতর দিয়াই ত চলিতেছে ইতিহাসের অখণ্ড ধারা। বর্তমান কাহাকে বলে? স্তূপীকৃত অতীতের আত্মাহুতির হোমশিখা হইতেই বাহিরিয়া আসে বর্তমানের হেমদ্যুতি। অতীতের অসংখ্য 'গতকাল'-গুলি নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে পৃথিবীর একটি 'আজ'-এর ভিতরে; নবপ্রভাতের অরুণিম অঙ্কুরটির শিকড় যতখানি পারে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে অতীতের সরস ভূমিতে; নতুবা সে শাখাবাহু-ফুলফলে বাড়িয়া উঠিবার উপজীব্য সংগ্রহ করিবে কোথা হইতে?

মানুষ তাহার অখণ্ড সাধনার দ্বারাই চাহিতেছে তাহার চরম বিকাশ; 'কালে'র সঙ্গে 'আজে'র নিবিড় যোগের ভিতরেই রহিয়াছে মানুষের সকল সাধনার অখণ্ডতা। সাধনার যৌথত্বের ভিতরেই ত নিহিত চরম মঙ্গলের আদর্শ ও আশা। সর্বপ্রকার স্বীকরণের ভিতর দিয়াই দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আমাদের সাধনা লাভ করে এই যৌথ রূপ। এক যুগ তাহার যুগব্যাপী সাধনায় মানুষের ইতিহাসকে যেখানে আগাইয়া

দিয়া যায় সেই সাধনাকে স্বীকার করিয়া—অর্থাৎ আত্মসাৎ করিয়াই আরম্ভ হয় নবযুগের যাত্রা। এক যুগকে অপর যুগ এমনই করিয়া স্বীকার করিয়া—আত্মসাৎ করিয়া না লইলে মানুষের ইতিহাসের আদিযুগের আর শেষ হইত না,—নতুবা প্রতিযুগকেই ত আবার প্রথম হইতে নূতন করিয়া যাত্রা সুরু করিতে হইত।

এক যুগের সাহিত্য তাই যুগের বুকে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়া নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া যায় নব নব সম্ভাবনার বীজরূপে নব-যুগের নবীন উর্বর ক্ষেত্রে। বাল্মীকির বীজ তাই ফুটিয়া ওঠে কালিদাসের নূতন ফুলে, আবার কালিদাসের প্রতিভা ও সাধনা বীজরূপে ঝরিয়া পড়িয়া নূতন নূতন ফুল ফুটাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিতে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে। বাল্মীকির ভাব ও ভাষা, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গিকে কালিদাস সগর্বে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারকে প্রকৃতরূপে গ্রহণ এবং নিজের সাধনায় তাহাকে নানা ভাবে উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তোলা—এইখানেই ত উত্তরাধিকারীর উত্তমাধিকারিত্ব। পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত ধন-রত্নকে গ্রহণ করিবার এবং ব্যবহার করিবার ক্ষমতা যাহার নাই সে ত অভাগ্য বঞ্চিত! কালিদাসের সে ক্ষমতা ছিল, তাই তাই তিনি বাল্মীকির যোগ্যতম উত্তরাধিকারী।

বাল্মীকির নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল দায়ভাগ গ্রহণ সত্ত্বেও কালিদাসের প্রতিভা অম্লানজ্যোতিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কালিদাস তাঁহার লব্ধ দায়ভাগের দ্বারা কোথাও আচ্ছন্ন বা বিমূঢ় নহেন; তাই তাঁহার 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণ-ক্ষমা-প্রজ্ঞা' প্রতিভা তাহার নব নব উন্মেষণী শক্তিতে অব্যাহত ভাবে নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আসলে কালিদাস বাল্মীকির সকল দানকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রকৃতির দানের মত। তাঁহার কবি-মানসের ভিতরে তাঁহার চারিপাশের জীবন—আলো-বাতাস, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-প্রান্তর যেমন করিয়া গিয়া ভিড় করিয়া বাসা-বাঁধিয়াছিল, বাল্মীকির নিকট হইতে লব্ধ সকল চিন্তা, ভাব, আদর্শ তেমন করিয়াই তাঁহার কবি-মানসে বাসা বাঁধিয়াছিল। এই সকলের সমবায়ে গঠিত তাঁহার সমগ্র কবি-মানস; সেখানে স্বোপার্জিত ধন এবং ঋকৃথ-সূত্রে লব্ধ ধনের ভিতরে কোনও ভেদ নাই। প্রাচীনের সকল উপাদান তাঁহার 'হৃদয়-বৃত্তির জারক-রসে জারিত' হইয়া একেবারে তাঁহার নিজস্ব হইয়া গিয়াছিল; ইহাকেই বলে প্রাচীনের স্বীকরণ। কালিদাসের কাব্য পড়িতে পড়িতে

বহু স্থানে বাল্মীকির স্মরণ হয়; সে স্মরণ সর্বত্র 'বোধপূর্ব'ও নহে, অনেক সময়ে 'অবোধপূর্ব'; সব জড়াইয়া এই কথাই মনকে নাড়া দিতে থাকে, বাল্মীকির কাব্য কিরূপে কালিদাসের কাব্যে নব পরিণতি লাভ করিয়াছে! এই নব-পরিণতির ভিতরে কালিদাস বাল্মীকির ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিকে অনেক স্থানে যে আরও গভীর এবং ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাল্মীকির নিসর্গ-প্রীতি ও কালিদাসের নিসর্গ-প্রীতি, বাল্মীকির উপমা-প্রয়োগ ও কালিদাসের উপমা-প্রয়োগের ভিতরে হয়ত সাধর্ম্য বহু রহিয়াছে; কিন্তু স্থানে স্থানে বাল্মীকির ভিতরে যাহার আভাস রহিয়াছে কালিদাস তাহাকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছেন। কালিদাসই যে শুধু বাল্মীকিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন নহে, কবিগুরু বাল্মীকিও গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ববর্তিগণকে। আমাদের পরবর্তী আলোচনার ভিতরেই দেখা যাইবে, বাল্মীকি যেমন বরহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন কালিদাসের শিয়রে, বৈদিক ঋষিগণ তেমনই বরহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন বাল্মীকির শিয়রে। কালিদাস যেমন শুধু তাঁহার নিজের যুগকেই তাঁহার সাহিত্যে প্রতিফলিত করেন নাই, সেখানে যেমন পটভূমিরূপে তিনি অতীতকেও গ্রহণ করিয়াছেন, বাল্মীকির ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথাই বলা চলে।

কালিদাস এবং বাল্মীকির ভিতরকার সম্পর্কটা অনেকখানি রবীন্দ্রনাথ এবং কালিদাসের সম্পর্কের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা 'বর্ষামঙ্গল' বা 'নববর্ষা' পড়িতে পড়িতে অবোধপূর্ব ভাবে কালিদাসের স্মরণ হইতে থাকে, এ যেন বীণার মূলতারে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট তারগুলির ঝঙ্কার। এ-জাতীয় কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে আমরা সব সময়ে স্পষ্ট বুঝিতে পারি না রবীন্দ্রনাথ কালিদাস হইতে কি কি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কতটা গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এ-কথা মনে হয়, ভাবে, দৃশ্যে, ভঙ্গিতে ভাষায় কালিদাস যেন রবীন্দ্রনাথের সহিত এক হইয়া অতি সহজ ভাবে মিলিয়া আছেন। কালিদাসের ভাব, চিত্র ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের ভিতরে গিয়া বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কালিদাসের 'মেঘদূত'কে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়াছেন, রচনা লিখিয়াছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা বা কবিতা পড়িলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, ইহা কালিদাস-রচিত পটভূমিকার উপরে সৃষ্ট একান্ত ভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'নবমেঘদূত'। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতা পড়িলে যেমন

মনে হয়, কালিদাসের নিকট হইতে কবি অনেক গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই মনে হয়, কালিদাসের 'মেঘদূতে'র পটভূমিতে তিনি নূতনও অনেক কিছু দিয়াছেন; 'মেঘদূতে'র ভিতরে তিনি যে নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার দান; সে দান কালিদাসকেও মহিমান্বিত করিয়াছে আপনাকেও মহিমান্বিত করিয়াছে। কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন যুগে নানা ভাবে দোলা দিয়াছে। এর ভিতরে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে যতবার 'কুমার-সম্ভবে'র দোলা লাগিয়াছে 'কুমার-সম্ভব'কে অবলম্বন করিয়া কবি ততবার নূতন ভাবে ও নূতন ভঙ্গিতে কাব্য-রচনা করিয়াছেন; কিন্তু কালিদাসের পটভূমিতে ইহার প্রত্যেকটি কবিতাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দান, এবং রবীন্দ্রপ্রতিভাও এই কবিতাগুলির ভিতরে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। কালিদাসের যুগ-মানস এই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া কি পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহারই সুষ্ঠুতম পরিচয় রহিয়াছে এই কবিতাগুলির ভিতরে: ভাব ও প্রকাশ-ভঙ্গি উভয়ের ভিতরেই রহিয়াছে গভীর বিবর্তন। এই বিবর্তনের ভিতরেই সাহিত্যের ইতিহাসের অখণ্ড যোগ এবং এইখানেই সাহিত্য সাধনার যৌথরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনার সকল সিদ্ধিকে—তাঁহার সকল ভাব ও ভাষাকে আমরা আজ আবার লাভ করিয়াছি তাঁহার উত্তরাধিকারী রূপে, সেই উত্তরাধিকারের ভূমিকায় যদি আমরা আনিতে পারি নব নব পরিণতি নিত্যনবীন সৃষ্টিতে তবে সেইখানেই ত রবীন্দ্রনাথের সকল দানের মর্যাদা। আমরা গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব বলিয়া এখানে এ বিষয়ে আর আলোচনা করিলাম না।

কবি হিসাবে বাল্মীকি ও কালিদাসের তুলনামূলক আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও দু'একটি কথা বলা দরকার। একটা কথা প্রথমেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতেছি, আমাদের উদ্দেশ্য কোন তুলনামূলক 'বিচার' নহে, আমাদের উদ্দেশ্য তুলনামূলক 'আলোচনা'। তুলনামূলক 'বিচারে'র প্রয়াস এবং পদ্ধতি আমাদের নিকটে মূলতঃই ভুল বলিয়া মনে হয়। দুই যুগের, দুই দেশের বিভিন্নধর্মী দুই কবির ভিতরে কে বড় কে ছোট এ প্রশ্নই আসে না। একই দেশের দুই যুগের বিভিন্নধর্মী দুই কবির ভিতরেও এই ভালমন্দের প্রশ্নটা সর্বত্র সাধু নহে।

সুতরাং আমাদের আলোচনার ভিতরে বাল্মীকি ও কালিদাসের কবিধর্মের দোষগুণের কথা প্রসঙ্গক্রমে যতই উল্লেখ করি না কেন, সেই সকল দোষগুণ লইয়া তুলনায় কে ছোট কে বড় হইয়া উঠিয়াছেন এ জাতীয় অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা আমরা করিব না। আমাদের তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্য উভয় কবিকে তাঁহাদের বিভিন্ন যুগের পটভূমিকার উপরে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়ের কবি-প্রতিভাকে সাদৃশ্যে ও বৈষম্যে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখা। অধিকন্তু একটি বিশেষ দেশের সাহিত্যের ইতিহাস বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণের সাধনার ভিতর দিয়া কি করিয়া একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র রূপে আবর্তিত হইয়া বিভিন্নযুগের ভিতর দিয়াই একটা যোগসূত্র রচনা করিয়া চলে, বাল্মীকি-কালিদাসের সকল লেন-দেনের ভিতর দিয়া আমরা সেই জিনিসটি লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

বাল্মীকি ও কালিদাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে কবি অশ্বঘোষের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে: কারণ এই তিনজন কবির ভিতরে ইতিহাসের যোগ খুব নিবিড়। অশ্বঘোষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মহলে কিছু কিছু বিতর্ক থাকিলেও মোটের উপরে তিনি যে বাল্মীকি ও কালিদাসের মধ্যবর্তী কবি সে-কথা অনেকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর এ কথার প্রমাণ সন তারিখের ভিতরে স্পষ্ট করিয়া পাওয়া না গেলেও এই তিনের কাব্যের ভিতরে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। অশ্বঘোষ তাঁহার 'বুদ্ধ-চরিত', 'সৌন্দরানন্দ' প্রভৃতি কাব্যে বাল্মীকির রামায়ণ হইতে ঋকৃথ-সূত্রে অনেক রীতি, উপমা, ভাষা, গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কালিদাসের কাব্যের সহিত অশ্বঘোষের কাব্যের মিলও অতি স্পষ্ট।

এতদিন আমরা জানিতাম, সংস্কৃতের কাব্য-রীতি কালিদাস কর্তৃকই প্রচলিত এবং প্রচারিত: অন্ততঃ কালিদাসের পূর্বে কোথায়ও আর ইহার নমুনা মেলে নাই। বাল্মীকির রামায়ণে কাব্যত্ব প্রচুর রহিয়াছে, কিন্তু কাব্য-রীতিটির স্পষ্ট প্রতিষ্ঠা নাই। কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ছন্দঃ-প্রয়োগে, বচন-বিন্যাসে, অলঙ্কার-প্রয়োগে কাব্য-শৈলীর একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক সময় মনে হইত, বাল্মীকির রামায়ণের কাব্যরীতি এবং কালিদাসের কাব্যরীতির ভিতরে যে ব্যবধান তাহাকে লঘু করিবার জন্য মাঝখানে কোনও মধ্যধর্মাবলম্বী কবির আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। অশ্বঘোষের আবিষ্কার আমাদের মনের এই কৌতূহলকে অনেকখানি নিবৃত্ত করে। এখন পর্যন্ত যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে

সংস্কৃতের এই বিশিষ্ট কাব্যরীতির প্রথম পরিচয় রহিয়াছে বাল্মীকির কাব্যে, তারপরে অশ্বঘোষের কাব্যগুলির ভিতরে। কালিদাস সেই রীতিকে অবলম্বন করিয়াই কাব্য-রূপের একটি বিশিষ্ট পরিণতি দান করিয়াছেন। 'বুদ্ধ-চরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' কাব্যের প্রথমাংশ পাঠ করিবার সময় বিষয়ের বর্ণনায়, বচন-রীতিতে, অলঙ্কার-প্রয়োগে কেবলই কালিদাসের স্মরণ হইতে থাকে। বর্ণনায় বহুস্থানে শ্লোকে শ্লোকে উভয় কবির ভিতরে মিল দেখান যাইতে পারে। অশ্বঘোষ রামায়ণকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন, কালিদাস রামায়ণের সহিত অশ্বঘোষকেও আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাই ত কাব্যের ক্ষেত্রে অখণ্ড সাধনা এবং এই অখণ্ড সাধনার ফল সাহিত্যের ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে রক্ষা করা। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অশ্বঘোষের সহিত একদিকে বাল্মীকির এবং অন্যদিকে কালিদাসের যে মিল রহিয়াছে সে আলোচনার ভিতরে বিস্তারিত ভাবে প্রবেশ করি নাই, কারণ প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে এই আলোচনা আরও কেহ কেহ করিয়াছেন। একান্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা এই মিলের উল্লেখ মাত্রই করিলাম। তবে গ্রন্থ-মধ্যে স্থানে স্থানে পাদটীকায় আমরা অশ্বঘোষের কাব্য হইতে কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়াছি, তাহার ভিতরেও আমাদের কথার অনেকখানি যাথার্থ্য মিলিবে।

কালিদাস বাল্মীকির নিকটে কোথায় কতখানি ঋণী এ কথা আলোচনার পূর্বে কালিদাসের কবি-প্রতিভা এবং বাল্মীকির কবি-প্রতিভার ভিতরে যে পার্থক্য রহিয়াছে সে-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। এই কবি-ধর্মের পার্থক্যের পশ্চাতে রহিয়াছে অনেকখানি যুগধর্মেরই পার্থক্য। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বাল্মীকির রামায়ণ এবং কালিদাসের 'রঘুবংশে'র কথাই উল্লেখ করিতেছি। কালিদাসের 'রঘুবংশ' পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা কোন বিশেষ কবি কর্তৃক রচিত; রামায়ণ পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা রচিত নহে,—হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিভাগে ইহা শস্যের মতন উৎপন্ন। কালিদাস আত্ম-সচেতন সুনিপুণ ভাস্কর, অতি যত্নে ধীরে-সুস্থে খুদিয়া খুদিয়া রঘুবংশের মূর্তিগুলি তৈয়ার

করিয়াছেন, তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া সুডৌল, মসৃণ এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন,—দুর্লভ মণিমুক্তায় খচিত সে কাব্য ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের গভীর যোগে, বর্ণনার বিরল নৈপুণ্যে, বাগ্‌ভঙ্গির রমণীয় চাতুর্যে রঘুবংশ পরম আস্বাদ্য,—কিন্তু এ-কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, যে-যুগের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন, সে যুগের জীবনের সহিত কবির ঐকাত্ম্য বা নিবিড় যোগ ছিল না; ফলে কবিকে সমগ্র রঘুবংশকে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইয়াছে বিশুদ্ধ কবিকল্পনার সাহায্যে তাঁহার নিজের যুগের পটভূমিকায়। কিন্তু বাল্মীকি যেন সুনিপুণ কৃষক; তাঁহার যুগে একটি বিস্তীর্ণ ভূমিভাগের ভিতরে বৃহত্তর সমাজ-জীবনে ফলিয়াছিল যত সোনার ফসল তাহাকেই বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কবি-কল্পনা দ্বারা আঁটি বাঁধিয়াছেন রামায়ণ কাব্যরূপে। রামায়ণের পত্রে পত্রে তাই সহজ জীবনের ভিড়; একটা বৃহৎ জাতির যুগান্তব্যাপী জীবন-ইতিহাস—তাহার কলমুখরতাই আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তোলে। বাল্মীকির কাব্যের ছোট বড় সকল সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্য, বীরত্ব-ভীরুতা একান্ত জীবন্ত হইয়াই দেখা দেয়; কালিদাসের 'অজবিলাপ' বা 'রতি-বিলাপ'-রূপ দীর্ঘ শোকবর্ণনাও বিলাপের নামে দীর্ঘ-বিলাস; সে বিলাসের ভিতরে চমৎকৃতির প্রাচুর্য রহিয়াছে, কিন্তু প্রাণ-প্রাচুর্য নাই।

পাশ্চাত্য কাব্যবিভাগ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা বলিতে পারি, বাল্মীকির কাব্য খাঁটি এপিক্ কাব্য—কালিদাসের কাব্য 'সাহিত্যিক এপিক্' বা কৃত্রিম এপিক্। রামায়ণের যুগ হইতে কালিদাস বহু দূরে নির্বাসিত; সেখান হইতে কল্পনার মেঘদূত পাঠাইয়া তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না, আর সেই তথ্যকে কাব্যে রূপায়িত করিতে সমসাময়িক জীবনের পটভূমিকে বাদ দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাল্মীকির কাব্যে যে যুগ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা তাঁহার নিজেরই যুগ; সে যুগের বৃহত্তর সমাজ-সত্তা অপরূপ কাব্যমূর্তি লাভ করিয়াছে বাল্মীকির কবি-প্রতিভার ভিতর দিয়া; বাল্মীকির কাব্য তাই এত জীবন্ত।

বস্তুতঃ, কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যের অন্য যতই মহৎ গুণ থাক, বাল্মীকি-রামায়ণের বলিষ্ঠ সজীবতা সেখানে বিরল। বাল্মীকি রামায়ণকে আমরা অধুনা যেভাবে পাইতেছি তাহার প্রারম্ভেই যে কবি-জিজ্ঞাসা দেখিতে পাইতেছি তাহা হইল একটি বিশুদ্ধ মনুষ্য-জিজ্ঞাসা—একটি গুণবান্, বীর্যবান্,

ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, চারিত্রযুক্ত, সর্বভূতহিতে রত, বিদ্বান্, সমর্থ এবং অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন মানুষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥ (আদি, ১।২-৩)

এই জাতীয় একটি আদর্শ মানুষ (এবংবিধং নরং) সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল লইয়াই কবিগুরু বাল্মীকির কবি-জিজ্ঞাসা ; সুতরাং রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষকে ভাষার তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া তোলার দিকেই তাঁহার ঝোঁক সর্বাপেক্ষা বেশি। মহর্ষি নারদের নিকটে এইরূপ আদর্শ মনুষ্য রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া কবিগুরু স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন,—'কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্ (আদি-২।৪১)—সমগ্র রামায়ণ কাব্যখানিকেই আমি এইভাবে (মনুষ্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া) রচনা করিব।

এই মৌলিক জীবন-প্রেরণার প্রাধান্যের জন্য বাল্মীকির রামায়ণে আমরা যেরূপ সত্যকার জীবনের আলেখ্য দেখিতে পাই কালিদাসের কাব্যের ভিতরে তাহা পাই না।

বাল্মীকি বর্ণিত লক্ষ্মণ-চরিত্রের ন্যায় একটি প্রাণবন্ত চরিত্র আমরা কালিদাসের নিকট হইতে আশা করিতে পারি না। এই লক্ষ্মণ-চরিত্রকে এতখানি জীবন্ত করিয়া তুলিতে বাল্মীকির কোন কায়ক্লেশ বিপুল আয়োজন ছিল না,—অতি সহজ ভাষায় তাহা মূর্তি লাভ করিয়াছে তাঁহার কাব্যে। রামের নির্বাসনের বার্তা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অতি রূঢ় ভাষায় তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছিল ; ধর্মজ্ঞ রাম নানা নীতিবাক্যে লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু সে সকল ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ—

তদা তু বদ্ধা ভ্রূকুটীং ভ্রুবোর্মধ্যে নরর্ষভঃ।
নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ॥
তস্য দুষ্প্রতিবীক্ষং তৎ ভ্রূকুটীসহিতং তদা।
বভৌ ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মুখস্য সদৃশং মুখম্॥
অগ্রহস্তং বিধুন্বংস্তু হস্তী হস্তমিবাত্মনঃ।
তির্যগূর্ধ্বং শরীরে চপাতয়িত্বা শিরোধরাম্॥
অগ্রাক্ষ্ণা বীক্ষমাণস্তু তির্যগভ্রাতরমব্রবীৎ॥ (অযো, ২৩।২-৫)

'নরর্ষভ লক্ষ্মণ দুই ভুরুর মধ্যে ভ্রূকুটী বদ্ধ করিয়া বিলস্থ রোষিত মহাসর্পের ন্যায় ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার সেই দুর্দর্শনীয় ভ্রূকুটীসহিত মুখ ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের মতন রূপ ধারণ করিল; দেহে তির্যক্ গ্রীবা ভঙ্গি করিয়া এবং হস্তী যেরূপ তাহার কর সঞ্চালন করে সেই অগ্রহস্ত পরিচালনা করিয়া কটাক্ষদ্বারা ভ্রাতাকে বক্রভাবে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণ বলিল,—

নোৎসহে সহিতুং বীর তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি। (ঐ ২৩।১১)

—'তুমি যতই ধর্মবাক্য বল, এ-জাতীয় অবিচার সহ্য করিতে আমার কোনই উৎসাহ নাই,—এ বিষয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।'

পিতৃআজ্ঞা পালনের পক্ষে ধর্মের দোহাই দিয়া রামচন্দ্র যেমন বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিল 'ভাই লক্ষ্মণ' অতি নিরীহ ভাবেই তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই; সেও তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছিল। লক্ষ্মণ এই প্রসঙ্গে দৈববিশ্বাসকে ধিক্কার দিয়া পৌরুষের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, মাতা কৈকেয়ী এবং পিতা দশরথকে স্বার্থপর শঠ বলিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াছে, রামচন্দ্র যাহা ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন লক্ষ্মণ তাহাকে 'দ্বৈধ্য' বলিয়া অভিহিত করিযাছে, কামাতুর স্ত্রৈণ পিতার বাক্যকে 'অধার্মিষ্ঠ' এবং 'বিগর্হিত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। পিতৃআজ্ঞাকে রামচন্দ্র দৈব-জাত বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল বলিয়া লক্ষ্মণ বলিয়াছিল,—

বিক্লবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানঃ ন দৈবং পর্যুপাসতে॥

'যে ব্যক্তি কাতর এবং বীর্যহীন সে-ই দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; যাঁহারা বীর এবং লোকবিখ্যাত তাঁহারা কখনও দৈবের উপাসনা করেন না।'

তাহার পরে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, রাজা দশরথ একান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত বলিয়া যদি রামচন্দ্র রাষ্ট্রবিপ্লবের কোনও আশঙ্কা করিয়া থাকেন তবে সে আশঙ্কাও একান্ত অমূলক, কারণ—

রাজ্যঞ্চ তব রক্ষেয়মহং বেলেব সাগরম্॥ (অযো-২৩।২৯)

'বেলা যেমন করিয়া সাগরকে রক্ষা করে আমি তেমন করিয়া তোমার রাজ্য রক্ষা করিব।'

ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ এই প্রসঙ্গে রামকে বলিয়াছিল—

ন শোভার্থামিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।
নাসিরাবন্ধনার্থায় ন শরাস্তম্ভহেতবঃ॥ (ঐ ২৩।৩১)

—'আমার এই দীর্ঘ বাহু দু'টি অঙ্গের শোভা বৃদ্ধির জন্য হয় নাই,—আর ভূষণের জন্য ধনু ধারণ করি নাই, বন্ধনের জন্য অসি এবং স্তম্ভের জন্য এই শরগুলি ধারণ করি নাই।' কালিদাসের হাতে এই জাতীয় বীরত্ব-প্রকাশ বিপুল আয়োজনের অপেক্ষা রাখিত।

কিন্তু মজা এই, লক্ষ্মণ এত বিদ্রোহ, বীরত্ব, এবং ক্রোধ ত প্রকাশ করিল; তাহার পরে যখন সত্যই বুঝিতে পারিল, দাদার মন কিছুতেই টলিবার নহে, বনে সে যাইবেই, তখন—

এবং শ্রুত্বা তু সংবাদং লক্ষ্মণঃ পূর্বমাগতঃ।
বাষ্পপর্যাকুলমুখঃ শোকং সোঢ়ুমশক্নুবন্॥
স ভ্রাতুশ্চরণৌ গাঢ়ং নিপীড্য রঘুনন্দনঃ।
সীতামুবাচাতিযশাং রাঘবং চ মহাব্রতম্॥
যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগগজাযুতম্।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ॥ (অযো-৩১।১-৩)

'পূর্বে আগত লক্ষ্মণ এই সংবাদ শুনিয়া শোক সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বাষ্পপর্যাকুলমুখে ভ্রাতার দুইটি চরণ গাঢ়ভাবে নিপীড়ন পূর্বক মহাযশ সীতাকে এবং রাঘব রামচন্দ্রকে বলিল, 'মৃগগজ সমাকুল বনে যদি যাইবার বুদ্ধি করিয়াই থাক, তবে আমি ধনু ধারণ করিয়া বনে তোমার অনুগমন করিব।'

বনে যাইয়াও লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কালে যে কয়েকটি কথা বলিয়া দিয়াছিল তাহাও তাহার পূর্বাপর চরিত্রের সহিত আশ্চর্য সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

লক্ষ্মণস্তু সুসংক্রুদ্ধো নিশ্বসন্ বাক্যমব্রবীৎ।
কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ॥

রাজ্ঞা তু খলু কৈকেয্যা লঘু ত্বাশ্রুত্য শাসনম্।
কৃতং কার্যমকার্যং বা বয়ং যেনাভিপীড়িতাঃ॥

যদি প্রব্রাজিতো রামো লোভকারণকারিতম্।
বরদাননিমিত্তং বা সর্বথা দুষ্কৃতং কৃতম্॥

ইদং তাবৎ যথাকামমীশ্বরস্য কৃতে কৃতম্।
রামস্য তু পরিত্যাগে ন হেতুমুপলক্ষয়ে॥

অসমীক্ষ্য সমারব্ধং বিরুদ্ধং বুদ্ধিলাঘবাৎ।
জনয়িষ্যতি সংক্রোশং রাঘবস্য বিবাসনম্॥

অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং লোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥

বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ ঘনশ্বাস ফেলিয়া এই কথাই সুমন্ত্রের মারফতে রাজা দশরথকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল,—'কি অপরাধে যে রাজপুত্র রামচন্দ্র নির্বাসিত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। রাজা যদি কৈকেয়ীর লঘু শাসন মান্য করিয়াই আমাদের সকলের পীড়াদায়ক এই কাজ করিয়া থাকেন তবে তাহা ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন তাহা জানি না। লোভ কারণের জন্য অথবা বরদানের জন্য যদি রামকে বনে পাঠান হইয়া থাকে তবে যে রাজা সর্বথা দুস্কৃত কর্ম করিয়াছেন তাহাতে বাধা নাই; তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সর্বময় কর্তা হইয়া যথেচ্ছভাবে এই কাজ করিয়াছেন, রামকে পরিত্যাগের ইহা অপেক্ষা অন্য কোনও হেতু আমি লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। তিনি বুদ্ধির লাঘবতাবশতঃ কোনও বিচার বিবেচনা না করিয়া রামের নির্বাসনরূপ যে বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন তাহা অবশ্যই সংক্রোশ উৎপন্ন করিবে। আমি মহারাজের মধ্যে পিতৃত্ব বলিয়া কোনও জিনিস লক্ষ্য করিতে পারিনা; আমার ভ্রাতা, ভর্তা, বন্ধু, পিতা, সবই রামচন্দ্র।'

শক্তিশেলাহত এই লক্ষ্মণের জন্যই আবার রাম শোক করিয়া বলিতেছিল,—আমি যখন অযোধ্যায় ফিরিব তখন মাতৃগণ সকলেই আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে,—

সহ তেন বনং যাতো বিনা তেনাগতঃ কথম্।

(যুদ্ধ ১০১।১৭)

'তুমি বনে যাইবার কালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে, ফিরিবার কালে তাহাকে বিনা ফিরিলে কেন?' এ-শোকের ভিতর কবি-কল্পনার অতিশয়োক্তি নাই—এ-শোক এবং এ-শোকের ভাষা সবই বাল্মীকি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার চারিপাশে ছড়ান সাধারণ জনগণের জীবন হইতে।

আমরা বাল্মীকির রামায়ণে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতে পারি—এখানে মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, বাৎসল্য, পতিত্ব, সতীত্ব যাহাই দেখিতে পাই—তাহার কিছুই অত্যন্ত প্রথাবদ্ধরূপে আমাদের নিকট দেখা দেয় নাই। রামচন্দ্র বিমাতা কৈকেয়ীর সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিন্দা-উক্তি প্রয়োগ করেন নাই; কিন্তু ভরত তাহার নিজের মাতাকে চিনিত,—তাই দেখিতে পাই, দশরথের মৃত্যুর পরে যখন অযোধ্যা হইতে ভরতের নিকটে মাতুলালয়ে দূত

গিয়াছিল তখন ভরত একে একে সকল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মায়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—

আত্মকামা সদাচণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ॥ (ঐ-৭০।১০)

'নিজের কামনা পূরণেই যাঁহার দৃষ্টি, সর্বদাই যাঁহার চণ্ডীমূর্তি, যিনি ক্রোধপরায়ণা এবং প্রাজ্ঞমানিনী সেই সুস্থা মাতা কৈকেয়ী কি বলিয়া দিয়াছেন ?'

অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া ভরত সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া এবং নিজের মাতাকেই সমস্ত বিপর্যয়ের মূল জানিয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিল,—

কুলস্য ত্বমভাবায় কালরাত্রিরিবাগতা।
অঙ্গারমুপগুহ্য স্ম পিতা মে নাববুদ্ধবান্॥ (ঐ-৭৩।৪)

'আমাদের কুলের ধ্বংসের জন্য তুমি কালরাত্রিরূপে আগতা; আমার পিতা অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।'

মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকটে নিজের মাতার পরিচয় দিয়াও ভরত বলিয়াছিল,—

ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্যকামাং কৈকেয়ীমনার্যামার্যরূপিণীম্॥
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।
যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ॥ (ঐ-৯২।২৬-২৭)

'ক্রোধপরায়ণা অশিক্ষিতা দৃপ্তা সুভগমানিনী ঐশ্বর্যকামা আর্যরূপিণী অনার্যা নৃশংসা এবং পাপনিশ্চয়া ইহাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবেন; ইহা হইতেই আমার এই বিষম বিপদের মূল দেখিতে পাইতেছি।'

আবার রামচন্দ্র সম্বন্ধেও দেখিতে পাই,—রাবণবধের পর সীতা উদ্ধার করিয়া রাম সীতাকে সর্বজনসমক্ষে বলিয়াছিল—

অদ্য মে পৌরুষং দৃষ্টমদ্য মে সফলঃ শ্রমঃ।
অদ্য তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽহং প্রভবাম্যদ্য চাত্মনঃ॥ (যুদ্ধ ১১৫।৪)

'আজ আমার পৌরুষ সকলে দেখিতে পাইল, আজ আমার সকল শ্রম সফল, আজ আমি প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ, আজ আমি নিজের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত'; কিন্তু—

প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়ং॥
তদ্ গচ্ছ ত্বানুজানেঽদ্য যথেচ্ছং জনকাত্মজে।
এতা দশদিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে ত্বয়া॥

(ঐ ১১৫।১৭-১৮)

'তোমার চরিত্র আজ সন্দিগ্ধ, সুতরাং স্মিতমুখে আজ তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেও নেত্রাতুর লোকের নিকট প্রদীপের ন্যায় তুমি আজ আমার বিশেষ প্রতিকূলারূপে প্রতিভাত হইতেছ ; সুতরাং হে জনকনন্দিনী, তোমাকে আমি এই অনুজ্ঞা দিতেছি,—এই দশদিক্ পড়িয়া রহিয়াছে—তুমি ইহার যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার, তোমাকে দিয়া আমার আর কোন কাজ নাই।' চরিত্রের এত বড় একটা কঠোরতাকে এতখানি রূঢ় সরলতার ভিতরে প্রকাশ করিয়া কবিগুরু রামচন্দ্রকে একটি রক্তমাংসের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। সীতাও সরোষ রাঘবের এই রোমহর্ষণ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া গজেন্দ্রহস্তাভিহতা বল্লরীর ন্যায় প্রব্যথিতা হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাষ্পপরিক্লিন্ন নিজের মুখ মার্জনা করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে সে উত্তর করিয়াছিল—

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে ॥ (যুদ্ধ ১১৬।৫-৬)

'হে বীর, তুমি বীর হইয়াও প্রাকৃতজনের প্রাকৃত বাক্যের ন্যায় এরূপ শ্রোত্রদারুণ অসদৃশ বাক্য আমাকে শুনাইতেছ কেন? তুমি আমাকে যেরূপ জান, হে মহাবাহো, আমি সেরূপ নহি, শপথ করিয়া বলিতেছি—আমার নিজের চারিত্র দ্বারাই তুমি প্রত্যয় লাভ কর।' বেশ বোঝা যাইতেছে, এই সীতা পরবর্তী কালের লোহা-বাঁধান সতীত্বের ফ্রেম নহে,—এ সতী হইলেও রক্তমাংসের নারী।

রামচন্দ্র যে-দিন দূর হইতে অতর্কিতভাবে শর সন্ধান করিয়া বালীকে হত্যা করিয়াছিল, সেদিন বালী ভূমি-নিপতিত হইয়াও সগর্বে রামচন্দ্রকে যে পরুষ বাক্য বলিয়াছিল, বাল্মীকি তাহাকে 'প্রশ্রিতং ধর্মসহিতম্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বালী বলিয়াছিল,—

ত্বয়া নাথেন কাকুৎস্থ ন সনাথা বসুন্ধরা।
প্রমদা শীলসম্পূর্ণা পত্যেব চ বিধর্মণা ॥
শঠো নৈকৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যাপ্রশ্রিত-মানসঃ।
কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাত্মনা ॥
ছিন্নচারিত্র্যকক্ষ্যেণ সতাং ধর্মাতিবর্তিনা।
ত্যক্তধর্মাঙ্কুশেনাহং নিহতো রামহস্তিনা ॥

(কিস্কিন্ধা ১৭।৪২-৪৪)

'হে কাকুৎস্থ, তোমাকে নাথরূপে লাভ করিয়া বসুন্ধরা যে সনাথা হইয়াছে তাহা বলা যায় না,—বিধর্মী পতি দ্বারা শীলসম্পূর্ণা প্রমদা যেমন কখনও পতিযুক্ত হয় না। তুমি শঠ পরাপকারী, ক্ষুদ্র, তোমার মন মিথ্যাশ্রিত; দশরথের ন্যায় মহাত্মা কর্তৃক তোমার মত পাপ কিরূপে জাত হইল? চারিত্র্যের গলবন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, সৎ ব্যক্তিগণের ধর্মকে অতিক্রম করিয়াছে, ধর্মের অঙ্কুশকে ত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ একটি রামহস্তী দ্বারা আমি আজ হত হইলাম।' রামচন্দ্রের প্রতি এই জাতীয় ভর্ৎসনাকে 'প্রশ্রিতং বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্,' বলিয়া অভিহিত করিবার ভিতরে যে সংস্কারবর্জিত স্বাধীন দৃষ্টি রহিয়াছে তাহাই রামায়ণ কাব্যখানিকে একটা বলিষ্ঠতা দান করিয়াছে।

কিষ্কিন্ধা-কাণ্ডের সুগ্রীবের চরিত্রের ভিতরেও আদিম অনার্য জীবনের একটা বর্বর বলিষ্ঠতা প্রস্ফুট হইয়াছে। সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া রামচন্দ্র বালিবধ পূর্বক সুগ্রীবকে বানর রাজ্যের নিষ্কণ্টক রাজা করিয়া দিয়াছিল; বিনিময়ে সুগ্রীব সীতা অন্বেষণ করিয়া তাহাকে উদ্ধারের সহায়তা করিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। সম্মুখে বর্ষাকাল—এখন বন-প্রান্তর, পর্বত-গুহা সকলই জলে ভরিয়া যাইবে—অতএব সকলকে শরতের আগমন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল। রাম-লক্ষ্মণ বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, সুগ্রীব তাহার নবলব্ধা স্ত্রী তারাকে লইয়া গুহাস্থিত রাজধানীর ভিতরে প্রস্থান করিল।

রামচন্দ্রের হৃদয়-আকাশকে বেদনার মেঘে ভরিয়া দিয়া ঘন বর্ষার সমাগম হইল—রামচন্দ্রের অশ্রু বর্ষণের সহিত ঘনবর্ষণের ফলে বেদনার মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গেল,—দেখা দিল বিমলব্যোম—গতবিদ্যুদ্বলাহকের শরৎ কাল। রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—কিন্তু মিতা সুগ্রীবের আর কোনও সাড়া নাই। সুগ্রীবের একে রাজ্যসমৃদ্ধি লাভ—নবীনা সুন্দরী স্ত্রী লাভ—অতএব মধুপানে আরক্তলোচনেই তাহার সুখের দিন ধীর মন্থর কাটিতে লাগিল—মিত্রতার প্রতিশ্রুতি সে কখন ভুলিয়া বসিয়া আছে। অপেক্ষায় অধৈর্য হইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিল,—

স কিষ্কিন্ধাং প্রবিশ্য ত্বং ব্রূহি বানরপুঙ্গবম্।
মূর্খং গ্রাম্যসুখে সক্তং সুগ্রীবং বচনান্ মম॥
অর্থিনামুপপন্নানাং পূর্বং চাপ্যুপকারিণাম্।
আশাং সংশ্রুত্য যো হন্তি স লোকে পুরুষাধমঃ॥

(কিষ্কিন্ধা—৩০।৭০-৭১)

'সেই কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিয়া তুমি মূর্খ গ্রাম্যসুখে সক্ত বানরপুরুষ সুগ্রীবকে আমার এই কথাগুলি বলিয়া আইস,—বলবীর্যশালী অর্থী—যে পূর্বে অনেক উপকারও করিয়াছে—তাহাকে একবার আশা দিয়া যে লোক তাহা নষ্ট করে সে পুরুষাধম।' লক্ষ্মণ তখনই উত্তর করিয়াছিল,—'বানরের কি কখনও সাধুবৃত্তি হয়?—সে কখনও কর্মফল সম্বন্ধের কথা চিন্তা করে না।'

ন বানরঃ স্থাস্যতি সাধুবৃত্তে
ন মন্যতে কর্মফলানুষঙ্গান্। (ঐ-৩১।২)

ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ অকৃতজ্ঞ বানররাজকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য শরধনু লইয়া সুগ্রীবের রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। গিরিসঙ্কটে সুগ্রীবের দুর্গে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ চারিদিকে বৃক্ষে বৃক্ষে বানরশ্রেণী দেখিতে পাইল,—লক্ষ্মণের রোষায়িত করাল মূর্তি দেখিয়া ভীত সংত্রস্তভাবে বানরগণ ছুটিয়া সুগ্রীবকে খবর দিল, কিন্তু—

তারয়া সহিতঃ কামী সক্তঃ কপিবৃষস্তদা।
ন তেষাং কপিসিংহানাং শুশ্রাব বচনং তদা॥
(ঐ—৩১।২২)

সে সময়ে তারার সহিত আসক্ত কামী কপিরাজ সে সকল বানরগণের কথা মোটে কানেই তুলিল না। বানরগণ অনন্যোপায় হইয়া প্রাণভয়ে যে যেখানে পারিল বৃক্ষের অন্তরালে পলাইয়া রহিল। লক্ষ্মণকে দেখিয়া বানরকুল কিলকিল শব্দে মহান্ কোলাহল তুলিল, এবং সেই কোলাহলে সুগ্রীবের নেশা টুটিয়া গেল, বর্ষার চারিমাসের নিরবচ্ছিন্ন মদবিলাসের পর যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই—

তেন শব্দেন মহতা প্রত্যবুধ্যত বানরঃ।
মদবিহ্বলতাম্রাক্ষো ব্যাকুলস্রগ্বিভূষণঃ॥ (কি—৩১।৪১)

সেই মহান্ কোলাহল শব্দে বানর সুগ্রীব জাগিয়া উঠিল—তখনও সে মদবিহ্বল—চক্ষু দুইটি তাম্রবর্ণ—মাল্য-ভূষণ শিথিল হইয়া গিয়াছে।

দ্বারী অঙ্গদ সত্বর গিয়া পিতৃব্য এবং মাতাকে লক্ষ্মণের আগমনবার্তা জানাইল। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের পুরীতে পূর্বপ্রতিশ্রুতি পালনের কোন আয়োজন-চিহ্ন দেখিতে পাইল না,—সীতার অন্বেষণের জন্য কোথায়ও কোনও উৎকণ্ঠার লক্ষণ নাই,—চারিদিকে আছে শুধু ভোগবিলাসের আয়োজন। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের পুরীতে প্রবেশ করিল, ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া

কৃতঘ্নতার উচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইল; এমন সময় সুগ্রীবপত্নী তারা অনুনয় বাক্যে লক্ষ্মণের শরণ গ্রহণ করিল।

সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী
প্রলম্বকাঞ্চীগুণহেমসূত্রা।
সলক্ষণা লক্ষ্মণসন্নিধানং
জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ॥ (ঐ—৩৩।৩৮)

মদবিহ্বলাক্ষী তারার প্রতিপদে পদস্খলন হইতেছিল, স্বর্ণ সূত্রের কাঞ্চী প্রলম্বিত হইয়া পড়িয়াছিল; স্তনভারে অঙ্গযষ্টি অবনমিত হইয়া পড়িতেছিল—এইরূপে সুলক্ষণা তারা লক্ষ্মণের সন্নিধানে গমন করিল। তারার অনুনয়ে লক্ষ্মণের ক্রোধের উপশম হইল। সুগ্রীবও চৈতন্য প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে সীতার অন্বেষণের জন্য উদ্যোগ-আয়োজনে তৎপর হইল।

আমরা এখানে সুগ্রীবের যে বন্য প্রাকৃতজনোচিত চরিত্রটি পাইতেছি তাহার চারিপাশে একটা সজীব বাস্তবতা জাগিয়া উঠিয়াছে। বাল্মীকির কাব্যদৃষ্টি নাগরিক রাজা, রাজপুত্র বা রাজপুরোহিত প্রভৃতিতেই নিবদ্ধ ছিল না, চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে তাঁহার কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কাব্যের ভিতরে যাহাকে যতটুকু স্থান দিয়াছেন দেশ-কাল-পাত্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তাহার ভিতরেই তাহাকে সর্বত্র সজীব করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাসের রঘুবংশে বর্ণিত সকল চরিত্রগুলি এইভাবে অপক্ষপাতে কবি-কল্পনার অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অভিজাতের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট, সেই পক্ষপাতিত্বের দ্বারাও যে তিনি তাঁহার অভিজাত চরিত্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না।

বানরগণের চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে কবি বাল্মীকি যেমন তাঁহার বাস্তব-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন রাক্ষসগণের চরিত্র বর্ণনাতেও তিনি সেই মুক্তদৃষ্টি ও বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। রাবণের চরিত্র অতি জটিল, সে চরিত্র বাদ দিয়া আমি কুম্ভকর্ণের চরিত্রের একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছি। কুম্ভকর্ণকে আমরা একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী বলিয়াই জানি—একদিনে অনেক মদ্য-মাংস গ্রহণ করিয়া সে ছয়মাস ঘুমে বেহুঁশ হইয়া থাকিত। কিন্তু আশ্চর্য এই ছয় মাস সে ঘুমে বেহুঁশ থাকিত বটে, আবার যখন জাগিয়া উঠিত তখন তাহার ধর্মবোধ এবং এবং বীরত্ববোধের হুঁশ অন্য কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। রাম

লক্ষ্মণের সবানরসৈন্য লঙ্কায় প্রবেশের সংবাদ জানিয়া রাবণ যেদিন রাক্ষস-বীরগণকে রাজসভায় আহুত করিয়া যুদ্ধ বিষয়ে তাহাদের বুদ্ধি-পরামর্শ চাহিয়াছিল সেদিন—

তস্য কামপরিতস্য নিশম্য পরিদেবিতম্।
কুম্ভকর্ণঃ প্রচুক্রোধ বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ (লঙ্কা—১২।২৭)

সেই কামাতুর রাবণের শোক প্রলাপ শুনিয়া কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল এবং ক্রুদ্ধভাবেই রাক্ষসরাজকে অনেক কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত রাবণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া সসৈন্য শত্রুর নিধনের ভার কুম্ভকর্ণ গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রথমে সে রাবণকে বলিয়াছিল,—'আপনি যখন রাম ও লক্ষ্মণের নিকট হইতে বলপূর্বক সেই সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তখন ত আপনি এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গেও কিছু পরামর্শ করেন নাই,—নিজেও একবার মাত্র ভাবিয়াই সঙ্কল্প করিয়া লইয়াছিলেন, এখন আমাদের বুদ্ধিপরামর্শের দ্বারা আপনার উপকৃত হইবার কোনও আশা নাই। আপনি এই যে পরস্ত্রীহরণ রূপ অতুলনীয় কর্মটি করিয়াছেন, ইহা করিবার পূর্বেই আপনার আমাদের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল।'[১] রাজধর্মের উল্লেখ করিয়াও কুম্ভকর্ণ রাবণকে ভৎর্সনা করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাক্ষস হইলেই বা অধিক মদ্য মাংসপ্রিয় বা অধিক নিদ্রালু হইলেই যে তাহার মধ্যে ন্যায়বোধ বা ধর্মবোধ কিছু থাকিতেই পারিবে না, কবি বাল্মীকির সে জাতীয় কোনও সংস্কার ছিল না। রাবণকে সর্বপ্রকার ভৎর্সনা করিয়াও কুম্ভকর্ণ যখন বুঝিল দুইটি সাধারণ মানুষ এবং তাহাদের অনুচর বানর সৈন্য দ্বারা রাক্ষসকুলের অসম্মানের সম্ভাবনা তখনই সে শত্রু নিধনের সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় করিয়াছিল।

অপরদিকে দেখিতেছি, রাবণকে সৎ বুদ্ধি দান করিতে গিয়া ভ্রাতা বিভীষণ রাবণ কর্তৃক ভৎর্সিত হইয়া বলিয়াছিল,—

পুরুষাঃ সুলভা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥
বদ্ধং কালস্য পাশেন সর্বভূতাপহারিণা।
ন নশ্যন্তমুপক্ষেয়ং প্রদীপ্তং শরণং যথা॥

১। লঙ্কা—১২।২৮—২৯।

দীপ্তপাবকসঙ্কাশৈঃ শিতৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
ন ত্বামিচ্ছাম্যহং দ্রষ্টুং রামেণ নিহতং শরৈঃ॥
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ নরা রণে।
কালভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ॥
তন্মর্ষয়তু যচ্চোক্তং গুরুত্বাদ্ধিতমিচ্ছতা।
আত্মানং সর্বদা রক্ষ পুরীঞ্চেমাং সরাক্ষসাম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা॥

(লঙ্কা—১৬।২১—২৫)

'হে রাজন্, সতত প্রিয়বাদী পুরুষ সুলভ; কিন্তু অপ্রিয় পথ্যের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। জ্বলন্ত গৃহকে যেমন উপেক্ষা করা উচিত নয় তেমনই কালের সর্বভূত-অপহরণকারী পাশের দ্বারা বদ্ধ তোমাকে উপেক্ষা করাও আমার উচিত মনে হয় নাই। রামের দীপ্তপাবক সদৃশ স্বর্ণালঙ্কৃত শাণিত শর সমূহের দ্বারা আমি তোমাকে নিহত দেখিতে ইচ্ছা করি না। বলবন্ত বীরগণ, অস্ত্রবিদ্ নরগণও কালপ্রাপ্ত হইলে অবসন্ন হয়—যেমন বালুকার সেতু। যাক্, তোমার হিত ইচ্ছা করিয়া যাহা কিছু বলিলাম তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিও,—সর্বদা নিজেকে রক্ষা কর—রাক্ষসসহ এই পুরীকেও রক্ষা কর। তোমার মঙ্গল হোক্, আমি চলিয়া যাইতেছি, আমাকে-বিনা সুখী হও।'

কিন্তু এতখানি স্পষ্টবাদী দৃঢ়চেতা ধার্মিক বিভীষণও রামের পক্ষে যোগ দিতে আসিয়া কি অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল? কবি বাল্মীকি ধার্মিক বলিয়া বিভীষণকে অতি সহজে সাদর সম্বর্ধনার অধিকারী করিলেন না। বিভীষণ আসিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেও রামচন্দ্র যখন তাহার বুদ্ধিমান্ অনুচরগণের নিকট পরামর্শ চাহিলেন তখন প্রায় সকলেই মত দিল, ধার্মিক হইলেও 'বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্তব্যো বিভীষণঃ।' কেহ কেহ বিভীষণের পিছে গুপ্তচর লাগাইবার পরামর্শ দিল; কেহ কেহ আবার সংশয় প্রকাশ করিল,—বুদ্ধিমান্ বিভীষণ পিছনে গুপ্তচর লাগাইলেই টের পাইবে এবং তাহাতে তাহার মন খারাপ হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং ঠিক গুপ্তচর না লাগাইয়া কিছুদিন পর্যন্ত অতি সাবধানে তাহার কথা-বার্তা আকার-ইঙ্গিত প্রভৃতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহার আসল মনোগত ভাব লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করা হোক্। এই সমস্ত জিনিসের ভিতর দিয়া বাল্মীকির লোকজ্ঞান এবং সেই লোকজ্ঞানজনিত বাস্তব-

নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে কোথাওই তিনি বিশুদ্ধ 'টাইপ' মাত্র সৃষ্টি করেন নাই। যে পারিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়া চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন সেই পারিপার্শ্বিকতার ভিতর দিয়াই তিনি অঙ্কিত চরিত্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পৌরুষ বা বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা বা চরিত্রের বর্ণনায়ই যে বাল্মীকির বলিষ্ঠতার প্রকাশ তাহা নহে। সহজ হাস্য-কৌতুক বা শোক-হর্ষ প্রকাশের ভিতরেও এই সজীব বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ছোট দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। হনূমান লঙ্কা হইতে সীতার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; বানরগণ হনূমানের নিকটে সীতার সংবাদ জানিতে পারিয়া 'মদোৎকট' হইয়া মধুপানের মানসে সুগ্রীব-রক্ষিত মধুবনে প্রবেশ করিল। হর্ষের আতিশয্যে—

গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ
নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ
প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ ॥
পরস্পরং কেচিদুপাশ্রয়ন্তি
পরস্পরং কেচিদতিব্রুবন্তি।
দ্রুমাদ্দ্রুমং কেচিদভিদ্রবন্তি
ক্ষিতৌ নগাগ্রান্নিপতন্তি কেচিৎ ॥
মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা
মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসংপতন্তি।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি
রুদন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি ॥
তুদন্তমন্যঃ প্রণুদন্নুপৈতি
সমাকুলং তৎ কপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ ॥ (সুন্দর—৬১।১৬-১৯)

'কেহ কেহ গান ধরিয়া দিল, কেহ কেহ তুমুল হাস্য আরম্ভ করিয়া দিল; কেহ কেহ নৃত্য আরম্ভ করিল, কেহ কেহ প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল,—কেহ কেহ পাঠ সুরু করিল, কেহ কেহ ঘুরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ লম্ফ দিতে লাগিল, কেহ কেহ প্রলাপ বকিতে লাগিল। কেহ

কেহ পরস্পরে ভর করিতে লাগিল,—কেহ কেহ পরস্পরে গালমন্দ আরম্ভ করিয়া দিল,—কেহ কেহ গাছ হইতে বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল, কেহ কেহ পাহাড়ের চূড়া হইতে ভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ উন্মত্ত আবেগে ভূমিতল হইতে গিয়া বড় বড় বৃক্ষের অগ্রভাগে পড়িতেছে, যে গান করিতেছে তাহার কাছে কেহ পরিহাস করিয়া আগাইয়া যাইতেছে, যে রোদন করিতেছে তাহার কাছে কেহ তীব্রতর রোদন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে;—আবার একজনে যাহাকে নানাভাবে পীড়ন করিতেছে অপরে তাহাকে বিনোদন করিতে আসিতেছে; এইরূপে সেই সমস্ত কপিসৈন্যই একেবারে সমাকুল হইয়া উঠিল; সেখানে এমন কেহ ছিল না যে মত্ত হইয়াছিল না,—এমন কেহ ছিল না যে দৃপ্ত হইয়াছিল না।' হর্ষোন্মত্ত কপিগণের এই চিত্রটি বেছন্দ হৈ-হুল্লোড়ে একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বনরক্ষক সুগ্রীবের বৃদ্ধ মাতুল দধিবক্ত্র এই প্রমত্ত বানরগণকে বারণ করিতে গিয়া যে লাঞ্ছনা লাভ করিয়াছিল তাহা আরও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের ভিতরে এরূপ বেসামাল বেছন্দ প্রমত্ততার স্থান নাই,—সেখানে সকলই পরিপাটি।

আসলে কালিদাসের যুগটাই পরিপাটি যুগ, সেখানে বেসামাল ভাবে হাসিতে পারা ও কাঁদিতে পারার সুযোগ কম। প্রিয়জনের জন্য শোক করিতে হইলেও নিখুঁত শ্লোকসমষ্টির ভিতর দিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া ইনাইয়া-বিনাইয়া বিলাপ করিতে হয়। বাল্মীকির যুগটায় কোনদিক হইতেই আঁটসাঁট ছিল না; তখনও সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম তরল বায়বীয় অবস্থাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া একেবারে শক্ত শীতল কাঠামবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে নাই। সেটা ছিল বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সর্বত্রই একটা গড়িয়া উঠিবার যুগ। কালিদাসের যুগ একটি বিলাসী সামন্ততন্ত্রের যুগ। সেই সামন্ততন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-জীবন কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতেছিল নাগরিক জীবনের স্বচ্ছন্দ বিলাসে। কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাস ছিলেন রাজকবি, নব-রত্নসভার তিনিই ছিলেন উজ্জ্বলতম রত্ন। এ-সকল কথা সত্য হোক কি না হোক, এ-কথা সত্য যে কালিদাসের সাহিত্য মূলতঃ নাগরিক সাহিত্য, রামায়ণ অনেকখানি 'আরণ্যক' সাহিত্যেরই সম-গোত্রীয়। কালিদাসের যুগে 'উদ্যানলতা' এবং 'বনলতা'র ভিতরকার ভেদও বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং যেখানে

দূ'রীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ'

সেখানেও কবির নাগরিকজনসুলভ বৈচিত্র্যপ্রয়াসী সুকুমার রসবোধেরই পরিচয় রহিয়াছে। কবির বৈচিত্র্যপ্রয়াসী নাগরিক রসিক মনের পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 'মেঘদূতে'র ভিতরে। উদ্‌গৃহীতালকান্তা পথিক-বনিতাগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইবার লোভ, জনপদ-বধূগণের ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দ্বারা পীয়মান হইবার লোভের ভিতর এই নাগরিকবৃত্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আসলে কিন্তু কবির অধিক পরিচয় 'বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতা' হর্ম্যগুলির সহিত; এবং কবি পথিকবধূ এবং জনপদবধূগণের কথা যতই বলুন, মেঘকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন,—

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥ (মেঘদূত)

'তুমি উত্তর দিকে প্রস্থান করিয়াছ, সুতরাং তোমার পথ একটু বক্র হইবে,—তথাপি উজ্জয়িনীর সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখ হইও না, সেখানকার পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিত লোলাপাঙ্গের সহিত যদি রমণ না কর তবে তুমি চক্ষুদ্বারাই বঞ্চিত হইলে।'

অবশ্য আদিম জীবনের সজীবতা ও বলিষ্ঠতাকে আমরা কালিদাসের যুগে আশা করিতে পারি না। কালিদাসের যুগে সমাজ-বন্ধন মনুর শাসনের দ্বারা দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ছিলেন সেই যুগের কবি যখন নিয়মনিষ্ঠ রাজার শাসনগুণে প্রজাগণ মনুর কাল হইতে প্রচলিত বিধিমার্গকে অণুমাত্র অতিক্রম করিত না—যেমন সুনিপুণ সারথি-চালিত রথের চক্র অগ্রনেমির রেখামাত্র অতিক্রম করে না।—

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥

(রঘু—১।১৭)

কালিদাসের কবি-কল্পনাও যে এই মনুশাসিত সমাজের নেমিবৃত্তের দ্বারা খানিকটা শাসিত হইয়াছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এই জন্যই কালিদাসের কাব্যে জীবনের সহজ প্রকাশ কম।

কিন্তু কালিদাসের কাব্যে—বিশেষ করিয়া 'রঘুবংশে' বাল্মীকির কাব্যের অনুরূপ জীবনের বাস্তবতা ও বলিষ্ঠতার অভাব আছে বলিয়া এ-কাব্য একান্ত প্রাণহীন বা দুর্বল নহে। জীবনের বাস্তবতা ও বলিষ্ঠতার

অভাবকে কালিদাস পূরণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহার কবিকল্পনার বলিষ্ঠতা ও বিরল কারুনৈপুণ্যের দ্বারা। তা ছাড়া কালিদাসের কাব্যে জীবনের সজীবতা নাই—কিন্তু ঐশ্বর্য আছে। এ ঐশ্বর্য সর্বদা বহিরৈশ্বর্য নহে—আন্তরৈশ্বর্যও একান্ত অপ্রচুর নহে। জীবনের এই ঐশ্বর্য উপযুক্ত বর্ণনার ভিতরে একটা চিত্তপ্রসারী মহিমাকে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। রঘুবংশের প্রারম্ভেই এই ঐশ্বর্যের পরিচয় রহিয়াছে। সেখানে 'রঘুবংশের' যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় রহিয়াছে ভাষায় ছন্দে—বচনা-ভঙ্গিতে—আভিজাত্যে—সে সমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতনই পাঠকের চিত্ততটে আসিয়া আঘাত করিতে থাকে।

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্॥
যথাবিধি-হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্॥
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্।
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যেমুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥[১]

এমনি করিয়া রঘুগণের যে বর্ণনা চলিতে লাগিল তাহার ভিতর দিয়া আমরা রঘুগণের বাস্তব জীবনের যাথার্থ্যকে লাভ না করিতে পারি, কিন্তু সব জুড়িয়া একটা ঐশ্বর্য—একটা মহিমাই এখানে প্রধান লাভ। ইহার পরেই এই রঘুবংশীয় রাজা দিলীপের যে বর্ণনা দেখিতে পাই তাহার ভিতরে অতিশয়োক্তির ফলে দিলীপের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য যতই মুছিয়া যাক না কেন, একটা ব্যক্তি-বিয়োজিত রাজ-মহিমা এবং সেই রাজ-মহিমাকে প্রকাশ করিবার বচন-চাতুর্য সেখানে চিত্তের ভিতরে একটা গভীর চমৎকৃতি দান করে।

(১) "সেই আমি—যাঁহারা আজন্ম শুদ্ধ—যাঁহারা ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত কর্ম করেন—যাঁহারা আসমুদ্রক্ষিতির প্রভু—স্বর্গলোকেও যাঁহাদের রথের গতি—যাঁহারা যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন—অর্থীদিগকে যথাকাম অর্চিত করিতেন—অপরাধীর যথাবিধি দণ্ডদান করিতেন—যথাকালে (স্বীয় কর্তব্যে) প্রবোধিত হইতেন, যাঁহারা ত্যাগের জন্যই অর্থ সঞ্চয় করিতেন, সত্যের জন্য মিতভাষী ছিলেন, যশের জন্য বিজয় যাত্রা করিতেন—সন্তানের জন্যই দার পরিগ্রহণ করিতেন,—যাঁহারা শৈশবে বিদ্যা অভ্যাস করিতেন—যৌবনে বিষয় ভোগ করিতেন—বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন—এবং অন্তকালে যোগদ্বারা তনুত্যাগ করিতেন—(এমন রঘুগণের অন্বয় বর্ণনা করিব)।

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ॥
সর্বাতিরিক্তসারেণ সর্বতেজোঽভিভাবিনা।
স্থিতঃ সর্বোন্নতেনোর্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনা॥
আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ॥
ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥

... ...

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবি॥
সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্।
শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্বী ধনুষি চাততা॥
তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥
জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥
জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।
অনাকৃষ্টস্য বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ।
তস্য ধর্মরতেরাসীদ্ বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা॥
প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

(রঘু—১।১৩-১৬, ১৮-২৪)

এইরূপে শ্লোকের পর শ্লোকে কালিদাস অপূর্ব বাগ্বৈদগ্ধ্যে যাঁহার বর্ণনা করিতে লাগিলেন তিনি একটি বিশেষ দেশ-কালের একজন রক্তমাংসের দেহধারী রাজা নহেন, তিনি কালিদাসের চিত্তভূমিতে জাত একটি রাজমহিমার বিগ্রহবান্ প্রতীক মাত্র। তাঁহার বিশাল বক্ষ, বৃষের ন্যায় স্কন্ধ,—তিনি শালপ্রাংশু, মহাভুজ; তাঁহার আত্মকর্মক্ষম দেহ—যেন মূর্তিমান ক্ষাত্র ধর্ম। তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সারবান্, সর্বতেজের অভিভবকারী, সর্বাপেক্ষা উন্নত—এই হেতু তিনি যেন পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া মেরু পর্বতের ন্যায় বিরাজমান

ছিলেন। আকারসদৃশ ছিল তাঁহার প্রজ্ঞা—প্রজ্ঞার সদৃশ আগম—আগমের সদৃশ কর্মারম্ভ—আরম্ভের সদৃশ ফলোদয়। ভয়ানক আবার কমনীয় নৃপগুণ সমূহের দ্বারা তিনি আশ্রিতগণের নিকট অধৃষ্যও ছিলেন—আবার অভিগম্যও ছিলেন—যেমন জলজীবগনের নিকটে রত্নসমাকীর্ণ অর্ণব। প্রজাগণেরই মঙ্গলার্থে তিনি তাহাদের নিকট হইতে দান (কর) গ্রহণ করিতেন—যেমন রস গ্রহণ করে রবি—সহস্রগুণে ফিরাইয়া দিবার জন্য। সেনা তাঁহার পরিচ্ছদের ন্যায় ভূষণমাত্র ছিল ; শাস্ত্রে অকুণ্ঠিতা বুদ্ধি এবং ধনুকে সংযোজিত জ্যা—এই দুইটি দ্বারাই তাঁহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। তাঁহার এমন মন্ত্রগুপ্তি ছিল এবং আকার ইঙ্গিত এমন গূঢ় ছিল যে কেহই কিছু বুঝিতে পারিত না ; অতএব তাঁহার প্রারম্ভ সকল—অর্থাৎ সকল কর্মানুষ্ঠান প্রাক্তন সংস্কার সমূহের ন্যায় শুধু ফলের দ্বারাই অনুমেয় হইত। তিনি অত্রস্তভাবে আত্মরক্ষা করিতেন, অনাতুরভাবে ধর্মোপার্জন করিতেন, অগৃধ্ন হইয়া অর্থ গ্রহণ করিতেন, অনাসক্ত হইয়া সুখ ভোগ করিতেন। জ্ঞান সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মৌনী, শক্তিসত্ত্বে ছিলেন ক্ষমাশীল, ত্যাগে ছিলেন শ্লাঘাবিবর্জিত এইরূপ পরস্পর-বিরোধী গুণসমূহ তাঁহার শরীরে সহোদরের ন্যায়ই বাস করিত। প্রজাগণের শিক্ষা বিধানে—রক্ষণ এবং ভরণপোষণের হেতু তিনিই ছিলেন তাহাদের সকলের পিতা—তাহাদের নিজেদের পিতৃগণ শুধু ছিলেন জন্মের হেতু মাত্র।[১]—এমনি করিয়াই চলিয়াছে রাজার মহিমা বর্ণনা ; সে বর্ণনার ভিতরে অযথার্থতা যতই থাক না কেন—চমৎকৃতির কোন অসম্ভাব নাই।

রঘুবংশের দ্বিতীয়সর্গে রাজা দিলীপ কর্তৃক বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীর চারণের বর্ণনার ভিতরেও এই জাতীয় একটা গম্ভীর মহিমার ব্যঞ্জনা রহিয়াছে—সে মহিমা শুধু রাজার নহে, হোমধেনুরও।

(১) অবশ্য কালিদাস কর্তৃক রাজা দিলীপের এই বর্ণনাকে আমরা রামায়ণের রামের বর্ণনার সহিত বেশ মিলাইয়া লইতে পারিব।

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দ বর্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেন হিমবানিব ॥
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশো ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ।
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ইত্যাদি

(আদি—১।১৭-১৯)

তারপরে সকল অলৌকিকতা সত্ত্বেও একটা সজীবতা লাভ করিয়াছে মায়া-সিংহ এবং রাজা দিলীপের সুদীর্ঘ কথোপকথন; বর্ণনাগুণে এখানে এমন একটি ওজোগুণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাহা বাস্তবধর্মী না হইলেও চিত্ত-প্রসারী।

অনেকস্থলে দেখা যায়, কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের (বাল্মীকির রামায়ণের সহিত তুলনায় আলোচনা প্রসঙ্গে এই কাব্যখানিকেই আমরা বিশেষভাবে গ্রহণ করিতেছি) চমৎকৃতি বহুস্থানেই নির্ভর করিতেছে বর্ণনীয় বিষয়ের উপরে ততটা নহে যতটা বর্ণনার চমৎকৃতির উপরে। এই বর্ণনার ভিতরে কবি যে কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন তাহা যেমন মৌলিক তেমনই বলিষ্ঠ। একটি ছোট দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। রামচন্দ্রের তিরোভাবের পর জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ অযোধ্যা নগরী ত্যাগ করিয়া কুশাবতীতে রাজ্য স্থাপন করেন। একদিন অর্ধরাত্রে দীপশিখা স্তিমিত হইলে এবং নগরীর সকল লোক সুপ্ত হইলে কুশ সহসা প্রবুদ্ধ হইলেন এবং বিরহবেশধারিণী অদৃষ্টপূর্ব এক রমণীকে দর্শন করিলেন। এ রমণী পরিত্যক্ত অযোধ্যাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরিত্যক্ত নগরীর দুরবস্থা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই মহারাজ কুশের সম্মুখস্থ হইয়াছেন। কবি এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুখে ঐশ্বর্যশালিনী পুরাতন অযোধ্যা এবং পরিত্যক্তা শ্রীহীন অযোধ্যার ভিতরকার পার্থক্য বর্ণনার জন্য একটি অপূর্ব এবং বলিষ্ঠ কবি-কৌশল গ্রহণ করিলেন। বর্ণনায় প্রত্যেকটি শ্লোকের ভিতরে দৃশ্য এবং ঘটনার এমন কতকগুলি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে, সেই দ্বন্দ্বে প্রাচীন এবং বর্তমান অযোধ্যার ভিতরকার দ্বন্দ্বটাও একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। দেবী বলিতেছেন—

> নিশাসু ভাস্বৎকলনূপুরাণাং
> যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।
> নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ
> স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ॥ ১৬।১২

পূর্বে যামিনীযোগে সমুজ্জ্বল নূপুরের কলগুঞ্জনধ্বনি সহকারে অভিসারিকাগণ যে রাজপথ দিয়া নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিত, এখন সেই রাজপথে সশব্দ মুখ-নিঃসৃত উল্কাপ্রভার সাহায্যে মাংসের অনুসন্ধানকারী শিবাগণের আনাগোনা চলিতেছে।

> আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈর্মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
> বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্॥ (১৬-১৩)

যে নির্মল জল বিলাসিনী প্রমদাগণের করাগ্র দ্বারা আস্ফালিত হইয়া

মৃদঙ্গের ধীর গম্ভীর ধ্বনির অনুকরণ করিত, আজ সেই দীর্ঘিকার জল বন্য মহিষগণের শৃঙ্গদ্বারা আহত হইয়া যেন ক্রোশধ্বনির অনুকরণ করিতেছে।

সোপানমার্গেষু চ যেষু রামাঃ
নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যো হতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং
ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে॥ (১৬।১৫)

যে সমস্ত সোপান-পথে রমণীগণ অলক্তসিক্ত রক্তিম চরণ যুগল নিক্ষিপ্ত করিত, আমার সেই সোপানাবলীতে এখন সদ্যমৃগবধকারী ব্যাঘ্রগণ রুধিরলিপ্ত পদ স্থাপন করিতেছে।

চিত্রদ্বিপা পদ্মবনাবতীর্ণাঃ
করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নকুম্ভাঃ
সংরব্ধসিংহপ্রহৃতং বহন্তি॥ (১৬।১৬)

চিত্রপটে অঙ্কিত যে সকল করী পদ্মবন হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং করেণু কর্তৃক দত্ত মৃণাল খণ্ড গ্রহণ করিয়াছে, এখন সিংহগণের (যাহারা এই চিত্রদ্বিপগুলিকে জীবিত বলিয়া মনে করিয়াছে) নখাঙ্কুশের আঘাতে ভিন্নকুম্ভ হইয়া তাহারা কুপিত সিংহের প্রহার বহন করিতেছে।

স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানা-
মুৎক্রান্তবর্ণক্রমধূসরাণাম্।
স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গা-
ন্নির্মোকপট্যঃ ফণিভির্বিমুক্তাঃ॥ (১৬।১৭)

কালক্রমে বর্ণবিন্যাস বিলুপ্ত হওয়ায় ধূসরতা প্রাপ্ত, স্তম্ভোপরি বিন্যস্ত দারুময়ী স্ত্রী প্রতিকৃতি সমূহের উপর ভুজঙ্গনির্মুক্ত নির্মোক সকল পতিত হইয়া স্তনাবরণের কাজ করিতেছে।

আবর্জ্য শাখাঃ সদয়ঞ্চ যাসাং
পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ।
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ
ক্লিশ্যন্ত উদ্যানলতা মদীয়াঃ॥ (১৬।১৯)

বিলাসিনীগণ যে সকল বৃক্ষশাখা অতি সদয় ভাবে আনত করিয়া তাহাদের কুসুম চয়ন করিত এখন বন্য পুলিন্দগণের ন্যায় বানরেরা আমার সেই উপবন-লতা ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে।

রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ
কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়ন্তে ক্রমিতন্তুজালৈ-
র্বিচ্ছিন্নধূম-প্রসরা গবাক্ষাঃ॥ (১৬।২০)

রাত্রিতে এখন আর আমার গবাক্ষগুলিতে দীপভাস দেখা যায় না —দিবসেও রমণীমুখকান্তি শোভিত হয় না—এখন আর এই গবাক্ষদ্বার দিয়া সুগন্ধি ধূম নিঃসৃত হয় না—এখন শুধু সেখানে ক্রমিকুল তন্তুজাল বিস্তার করিতেছে।

এই বর্ণনার ভিতর দিয়া সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যা এবং হতশ্রী অযোধ্যার যে দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহার ভিতরে কবি-কল্পনার একটা অসামান্য বলিষ্ঠতার পরিচয় রহিয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে বোঝা যাইবে, কালিদাসের কাব্যে—বিশেষ করিয়া রঘুবংশে বলিষ্ঠতা এবং ওজোগুণের যে একান্ত অভাব রহিয়াছে তাহা নহে—কিন্তু বাল্মীকির কাব্যের বলিষ্ঠতা এবং কালিদাসের কাব্যের বলিষ্ঠতা ভিন্নধর্মী এবং এই ভিন্নধর্মের পশ্চাতে যে ভিন্ন যুগের পার্থক্য রহিয়াছে তাহাকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

বাল্মীকির যুগ আরণ্য কৃষিসভ্যতার যুগ। তখন পর্যন্তও মানুষ বন কাটিয়া চারিদিকে নগর পত্তন শেষ করে নাই,—বনের সহিত জনপদের মিলন নিবিড় ছিল। এই জনপদজীবন এবং আরণ্যজীবনের মিলনেই গড়িয়া উঠিয়াছে সকল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই মিলন এবং মিলনজাত বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ইতিহাসই রহিয়াছে বাল্মীকির কাব্যে। অরণ্যের বিরাট বিরাট শালবৃক্ষ কাটিয়া তখন জনপদের পত্তন করিতে হইত; গৈরিক ধাতুপূর্ণ পার্বত্য ভূমিতে জনবসতির ব্যবস্থা করিতে হইত। বাল্মীকির কাব্যের উপমাগুলির ভিতরেই এই অর্ধ-আরণ্য জীবনের পরিচয় রহিয়াছে। মৃত দশরথের বর্ণনা করিতে কবি বলিতেছেন,—

তমার্তং দেবসঙ্কাশং সমীক্ষ্য পতিতং ভুবি।
নিকৃত্তমিব সালস্য স্কন্ধং পরশুনা বনে॥ (অ ৭২।২২)

ভূমিতে পতিত আর্ত দেবসঙ্কাশ দশরথ যেন কুঠারচ্ছিন্ন বনের শালস্কন্ধ। এই কর্তিত ভূপাতিত বৃক্ষের উপমা, ঝঞ্ঝাবাতে উন্মূলিত বৃক্ষের উপমা বাল্মীকির একটি অতি বহুব্যবহৃত উপমা, রামায়ণে বহুপ্রসঙ্গেই এই উপমাটি দেখিতে পাই। বনে ভরতের মুখে পিতা দশরথের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া—

প্রগৃহ্য রামো বাহূ বৈ পুষ্পিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ।
বনে পরশুনা কৃত্তস্তথা ভুবি পপাত হ॥

বনে কুঠার দ্বারা কর্তিত পুষ্পিত শাখাবাহু বৃক্ষের ন্যায় রাম বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্বক ভূমিতে পতিত হইল। লঙ্কার বর্ণনা দিতে কবি বলিতেছেন—

মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং
শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুরত্নকীর্ণম্।
নানাতরূণাং কুসুমাবকীর্ণং
গিরেরিবাগ্রং রজসাবকীর্ণম্॥ (সু ৭।৬)

বহুরত্নকীর্ণা লঙ্কা যেন নানা তরুগণের কুসুমাবকীর্ণ ধূলিকীর্ণ গিরিশৃঙ্গ। এই বিবিধবর্ণের ধাতুময়ী গিরিভূমির উপমাও বাল্মীকির রামায়ণে বহুস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে। এই আরণ্য-জীবনে মানুষকে সর্বদা হিংস্র আরণ্য পশুগণেন সংস্পর্শে আসিতে হইত; বাল্মীকির উপমাগুলির ভিতরে তাই বনের সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ, সর্প প্রভৃতি চারিদিকে ভিড় করিয়া আছে। বাল্মীকির বর্ণনায় দেখিতে পাই, ক্রুদ্ধ বীরগণ অনেক স্থানেই 'নিশ্বসন্ ইব পন্নগঃ'। রাজগৃহ হইতে বহিরাগত রামচন্দ্র 'পর্বতাদিব নিষ্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ' (অ ১৬।২৬); রাজা দশরথ যে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন তাহাও 'সিংহো গিরিগুহামিব' (অযো ৫।২৫)। বিজন পার্বত্য বনে নির্ভয়ে শায়িত রামলক্ষ্মণ দুই ভাই—

ততস্তু তস্মিন্ বিজনে মহাবলৌ
মহাবনে রাঘব-বংশ-বর্ধনৌ।
ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেয়তু
র্যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ॥ (অ ৫৩।৩৫)

গিরিসানুগোচর দুইটি সিংহের ন্যায় মহাবল দুই ভাই নিঃশঙ্ক ভাবেই নিদ্রামগ্ন ছিল। বনমধ্যে বাষ্পশোকপরিপ্লুত রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণ যখন কথা বলিয়াছিল তখন—অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্॥

(আরণ্য ২।২২)

রুদ্ধ হস্তীর ন্যায় শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ তাহার কথা বলিয়াছিল।

মৃত দশরথকে দেখিয়া কৌশল্যা এবং সুমিত্রা যখন শোক করিতেছিল তখন তাহারা—করেণেব ইবারণ্যে স্থানপ্রচ্যুতযূথপাঃ। (অ ৬৫।২১)

যূথপতি মহাগজ স্থানভ্রষ্ট হইলে অরণ্যে অসহায়া করেণুগণের মত।[১]

১। তুলনীয়—

যূথভ্রষ্টামিবৈকাং মাং হরিণীং পৃথুলোচন।
মহাভারত, নলোপাখ্যান, বনপর্ব, ৫২।২৪
(পি. পি. এস্. শাস্ত্রীর সংস্করণ)

অশোকবনে সীতাকে রাবণ যখন কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেছিল না তখন সে দুরন্ত রাক্ষসীগণকে আদেশ দিয়া গিয়াছিল,—

তর্জনৈর্ঘোরৈঃ পুনঃ সান্ত্বৈশ্চ মৈথিলীম্।
আনয়ধ্বং বশং সর্বা বন্যাং গজবধূমিব ॥ (আর-৫৬।৩১)

'এই মৈথিলীকে কখনও ঘোর তর্জনের দ্বারা, পুনরায় সান্ত্ববাক্য দ্বারা বন্যা গজবধূর মত বশে আনয়ন কর।' তখন—

সা তু শোকপরীতাঙ্গী মৈথিলী জনকাত্মজা।
রাক্ষসীবশমাপন্না ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা ॥ (ঐ ৫৬।৩৪)

সেই শোকপরীতাঙ্গী জনক দুহিতা সীতা হরিণী যেরূপ ব্যাঘ্রিণীগণের বশ্যতা স্বীকার করে সেইরূপ রাক্ষসীগণের বশ্যতা স্বীকার করিল।

হনূমান্ প্রথম যখন লঙ্কাপুরীতে সীতাকে দেখিয়াছিল তখন সীতাকে দেখাইতেছিল—

গৃহীতাং লাড়িতাং স্তম্ভে যূথপেন বিনাকৃতাম্।
নিশ্বসন্তীং সুদুঃখার্তাং গজরাজবধূমিব ॥ (সু-১৯।১৮)

সীতা একটি গজরাজবধূর ন্যায়,—সে ধৃত হইয়াছে, উৎপীড়িত হইতেছে, যূথপতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—আর গভীর দুঃখে আর্ত হইয়া শুধু নিশ্বাস ফেলিতেছে। রাবণকর্তৃক অপহৃতা সীতার সন্ধান লাভে ব্যর্থকাম অবসাদগ্রস্ত রামের কথা বলিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,—

পঙ্কমাসাদ্য বিপুলং সীদন্তমিব কুঞ্জরম্। (আরণ্য—১।১৩)

কর্দমের মধ্যে যেন বিষণ্ণ একটি বিপুল হাতী।'

রাবণ একস্থানে সূর্পণখাকে বলিয়াছিল—

অযুক্তচারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্।
বর্জয়ন্তি নরা দূরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ ॥ (আরণ্য—৩৩।৫)

'অযুক্তচার দুর্দর্শ অস্বাধীন রাজাকে সকল লোকে সেইরূপই বর্জন করে, যেমন হস্তিগণ দূর হইতেই এড়াইয়া চলে নদীপঙ্ককে।'

এই সকল বর্ণনা এবং উপমাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হইবে, এগুলির ভিতরে কবির সমসাময়িক আরণ্য জীবনের ছাপ পড়িয়াছে।

(১) উবাচ রামং সংপ্রেক্ষ্য পঙ্কলগ্ন ইব দ্বিপঃ ॥ (কি-১৮।৫১)
গাঙ্গে মহতি তোয়ান্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্। (সু-১০।২৮)
তুলনীয়—ভর্তঃ সীদতি মে চেতো নদীপঙ্ক ইব দ্বিপঃ ॥ বুদ্ধচরিত—অশ্বঘোষ, ৬।২৬
তুলনীয়—ততঃ ক্ষিপ্তমিবাত্মনং দ্রৌপদ্যা স পরংতপঃ।
নামৃষ্যত মহাবাহুঃ প্রহারমিব সদ্গজঃ ॥ মহাভারত—বনপর্ব ১৩৩।৩২

বাল্মীকির যুগে কৃষিই ছিল প্রধান বৃত্তি। বৈদিকযুগে যে কৃষিযুগের পত্তন ঘটিয়াছিল তাহারই একটা ক্রমপরিণতি দেখিতে পাই বাল্মীকির যুগে। তাই মহাকবির বর্ণনায় কৃষিসম্বন্ধীয় বহু উপমা বর্তমান। যুবরাজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প লইয়া দশরথ বলিতেছেন,—

বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্॥ (অ-১।৩৮)

'সর্বভূতানুকম্পক, লোকের বৃদ্ধিকাম রাম বৃষ্টিমান্ মেঘের ন্যায় আমা হইতেও সকলের নিকট প্রিয়তর!' রাম ব্যতীত রাজ্য দশরথের নিকট 'শস্যং বা সলিলং বিনা' (অ-১২।১৩)। বনে আগত ভরতকে বনের ঋষিগণ অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন,—

'ত্বামেব হি প্রতীক্ষন্তে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ।' (অযো-১১২।১২)

'কৃষকেরা যেমন ভাবে মেঘের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে তোমার জন্যও জ্ঞাতিগণ, যোদ্ধবৃন্দ, মিত্রগণ ও সুহৃদ্‌গণ সেইভাবেই অপেক্ষা করিতেছে।' লঙ্কার অশোকবনে হনূমান্‌কে দেখিয়া সীতা বলিয়াছিল,—

ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রিয়বক্তারং সংপ্রহৃষ্যামি বানর।
অর্ধসঞ্জাতশস্যেব বৃষ্টিং প্রাপ্য বসুন্ধরা॥ (সু-৪০।২)

'হে বানর, প্রিয়বক্তা তোমাকে দেখিয়া আমি সেইভাবে প্রহৃষ্ট হইয়াছি, যেমন প্রহৃষ্ট হয় অর্ধসঞ্জাতশস্যা বসুন্ধরা বৃষ্টিকে পাইয়া।'
মারীচ যখন রাবণকে সদুপদেশ দান করিয়াছিল, তখন রাবণ বলিয়াছিল যে মারীচের—

বাক্যং নিষ্ফলমত্যর্থং বীজমুপ্তমিবোখরে॥ (আ-৪০।৩)

'অতিশয় অর্থযুক্ত হইলেও তপ্তপাত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় তাহার বাক্য একেবারেই নিষ্ফল।' বানরগণ লঙ্কার বনগিরি যখন ছাইয়া ফেলিয়াছিল তখন,— বভূব বসুধা তৈস্তু সম্পূর্ণা হরিপুঙ্গবৈঃ।
যথা কমলকেদারৈঃ পক্কৈরিব বসুন্ধরা॥ (লঙ্কা ৪।৯১)

'সেই বানরপুঙ্গবগণের দ্বারা বসুধা তেমনই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল যেমন পূর্ণ হয় বসুন্ধরা পক্ক কমলধান্যের ক্ষেত্রের দ্বারা।

এই কৃষিযুগে গোধনই ছিল শ্রেষ্ঠ ধন। রাবণ বিভীষণকে বলিয়াছিল—

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ॥ (যু-১৬।১)

গাভীতেই ছিল সম্পদ্—তাই গাভী এবং বৃষের উপমা বাল্মীকির সমগ্র রামায়ণে ছড়াইয়া আছে। দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন,—

যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্॥
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে। (অ-১৪।৫৪-৫৫)

যেমন পালহীন পশুগণ, যেমন নায়কহীন সেনা,—যেমন চন্দ্রবিনা রাত্রি, যেমন বৃষবিনা গাভী, সেইরূপই হয় রাষ্ট্রের অবস্থা—যেখানে কোন রাজা দেখা যায় না।[১]

লঙ্কাকাণ্ডে দেখিতে পাই, বানরযোদ্ধা নীল রাক্ষসগণ কর্তৃক সহসা নিক্ষিপ্ত বানরাশি নিবারণ করিতে না পারিয়া সেই ভাবেই নিমীলিত নেত্রে সহ্য করিতেছিল যেমন সহ্য করে একটি গোবৃষ ঘন বর্ষণ যখন তাহার পথে হঠাৎ বর্ষা আসিয়া যায়।

তস্য বাণগণানেব রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
অপারয়ন্ বারয়িতুং প্রত্যগৃহ্লান্নিমীলিতঃ।
যথৈব গোবৃষো বর্ষং শারদং শীঘ্রমাগতম্॥ (লঙ্কা-৫৮।৪১)

রামচন্দ্র যেদিন বনে গমন করিল তখন—

ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ। (অ-২০।৬)

রামহীন সকল মহিষী যেন বিবৎসা ধেনু।[২]

কৌশল্যা রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

কথং হি ধেনুঃ স্ববৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি॥ (অ-২৪।৯)

'বৎস যে দিকে যায় ধেনু যেমন তাহাকেই অনুগমন করে, আমিও সেইরূপ তুমি যেখানে যাইবে সেইখানেই তোমার অনুগমন করিব!'

(১) যথা হ্যনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্।
অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্॥ (অ-৬৭।২৯)

(২) ততঃ সবাষ্পা মহিষী মহীপতেঃ প্রণষ্টবৎসা মহিষীব বৎসলা।
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ৮।২৪

হনুমান্ যেদিন সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান মণি লইয়া রামের নিকট পৌঁছিয়াছিল সেদিন সেই মণি দর্শনে রামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট বলিয়াছিল—

যথৈব ধেনুঃ স্রবতি স্নেহাদ্বৎসস্য বৎসলা।
তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ॥ (সু-৬৬।৩)

'বৎসলা গাভী যেমন বৎস অবলম্বন করিয়া স্নেহবশতঃ দুগ্ধ স্রবণ করে, এই মণিশ্রেষ্ঠকে অবলম্বন করিয়া আমার হৃদয়ও তদ্রূপ হইতেছে।'

এই কৃষি-সভ্যতার নিদর্শন অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে রাণী কৌশল্যার একটি উক্তিতে। রামচন্দ্রের বনগমনের পর বিষণ্ণ দশরথকে লক্ষ্য করিয়া কৌশল্যা বলিতেছেন,—

কদাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং বীরঃ প্রবেক্ষ্যতি।
পুরস্কৃত্য রথে সীতাং বৃষভো গোবধূমিব॥ (অ-৪৩।১২)

'বৃষভ যেমন গোবধূকে সম্মুখে রাখিয়া আগমন করে, সেইরূপে মহাবাহু রাম কবে আবার রথে সীতাকে সম্মুখে রাখিয়া অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিবে!' একান্ত কৃষিসভ্যতার যুগ না হইলে মায়ের পক্ষে পুত্র এবং পুত্রবধূকে বৃষ এবং গোবধূর সহিত উপমিত করা সম্ভব হইত না, এ উপমা আমাদের যুগে একেবারেই অচল, কালিদাসের যুগেও চলিত না,— অন্ততঃ কোথাও চলে নাই; 'বৃষস্কন্ধঃ' পর্যন্ত চলিত—অধিক চলিত না; কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের সকল পারিপার্শ্বিকতার ভিতরে উপমাটি আশ্চর্যরূপে মানাইয়া গিয়াছে। গাভী সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ বর্ণনা কালিদাসের অনেক আছে। দিলীপ-রক্ষিত বশিষ্ঠের হোমধেনু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রাং
জুগোপ গোরূপধরামিবোর্বীম্॥ (রঘু-২।৩)

দিলীপ গোরূপধরা পৃথিবীকেই যেন রক্ষা করিয়াছিলেন, পৃথিবীর চারিটি সমুদ্র যেন হোমধেনুর চারিটি বাঁটযুক্ত পয়োধরে পরিণত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় এই হোমধেনু যখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিত তখন—

সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি
কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লবরাগতাম্রা
প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ॥ (রঘু-২।১৫)

এখানে মুনির হোমধেনুকে সূর্যপ্রভার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সূর্যপ্রভাও সারাদিন সকল দিগ্‌দিগন্তকে তাপ দ্বারা পূত করিয়াছে, ধেনুও তাহার প্রচরণের দ্বারা দিগন্তর পূত করিয়াছে; দিনান্তে সূর্যপ্রভাও পল্লবরাগ-তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ঋষির ধেনুটিও পল্লবরাগ-তাম্রা। সূর্যপ্রভা আপন নিলয়ে চলিল—ঋষির ধেনুটিও আশ্রমে চলিল। তার পরে মধ্যম লোকপাল দিলীপ যখন ধেনুর অনুগমন করিতে লাগিলেন তখন—

বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন
শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্‌ বিধিনোপপন্না ॥ (রঘু-২।১৬)

সাধুজনের বহুমান্য রাজা কর্তৃক অনুসৃত হইয়া গাভীটি বিধিযুক্তা মূর্তিমতী শ্রদ্ধার মত শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ দিলীপ ধেনুটির পশ্চাতে আসিতেছেন—আর পার্থিবধর্মপত্নী সুদক্ষিণা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন,—

তদন্তরে সা বিররাজ ধেনু
দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা ॥ (ঐ-২।২০)

উভয়ের মাঝখানে পাটলবর্ণা ধেনুটি দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তী সন্ধ্যার ন্যায় বিরাজমানা। কালিদাসের এই সকল বর্ণনার ভিতর দিয়া কালিদাসের বর্ণনার চমৎকৃতি এবং তৎসঙ্গে স্বর্গীয় কামধেনুসুতা ঋষির হোমধেনুরই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু এই সকল বর্ণনার সহিত বাল্মীকির পূর্বোক্ত উপমাটির তুলনা করিলেই কালিদাসের যুগ এবং কাব্যপ্রতিভা এবং বাল্মীকির যুগ এবং কাব্যপ্রতিভার পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

এই গাভী এবং বৃষভের কথা কবির মনে জাগিয়া উঠিয়াছে বহু বর্ণনায়। রামচন্দ্রের শরে বালী নিহত হইলে—

হতে তু বীরে প্লবগাধিপে তদা
বনেচরাস্তত্র ন শর্ম লেভিরে।
বনেচরাঃ সিংহযুতে মহাবনে
যথা হি গাবো নিহতে গবাম্পতৌ ॥ (কি-২২।৩১)

'বানবাধিপ বীর বালী হত হইলে বনেচর বানরগণ কিছুতেই সুখ বা স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না; তখন বনেচরদের অবস্থা গবাম্পতি নিহত

হইলে সিংহযুক্ত মহাবনে গাভীদের অবস্থার ন্যায়।'[1] কবি যেখানে বর্ষাত্যয়ে শরতের বর্ণনা দিতেছেন সেখানেও—

শরদ্‌গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ
প্রহর্ষিতাঃ পাংশুসমুত্থিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সম্প্রতি যুদ্ধলুব্ধা
বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি ॥ (কি-৩০।৩৮)

'শরৎগুণে বৃষগুলির রূপশোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বৃষগুলি অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সমস্ত দেহ ধূলিযুক্ত করিয়াছে, এবং সম্প্রতি মদোৎকট হইয়া যুদ্ধলুব্ধ বৃষগুলি গরুগুলির মধ্যে গিয়া নাদ করিতেছে।'[2]

লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া হনূমান্ আকাশে চন্দ্রকে দেখিতে পাইয়াছিল।—

ততঃ স মধ্যংগতমংশুমন্তং
জ্যোৎস্নাবিতানং মুহুরুদ্বমন্তম্।
দদর্শ ধীমান্ ভুবি ভানুমন্তং
গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্ ॥ (সু-৫।৩)

'তাহার পর হনূমান্ (মধ্যরাত্রে) তারকামধ্যগত অংশুমান্ চন্দ্রকে দেখিতে পাইল ; সে (চন্দ্র) প্রতিমুহূর্তে জ্যোৎস্নাবিতান বমন করিতেছিল, সূর্যসহযোগে প্রকাশবত্ত্ব লাভ করিয়া সে গোষ্ঠে মত্ত বৃষের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিল।'

এইরূপে দেখিতে পাই, সমুদ্রতিতীর্ষু হনূমান্ 'সমুদ্রগ্রশিরোগ্রীবো গবাংপতিরিবাবভৌ' (সু-১।২)। এইরূপে বীর্যবান্ গবাক্ষ রাক্ষস 'গবাং দৃপ্ত ইবর্ষভঃ' (যু-৪।১৫)। রামচন্দ্র যখন আবার চতুর্দশবর্ষ পরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল তখন ভরত বলিয়াছিল,—

ধুরমেকাকিনা ন্যস্তাং বৃষভেণ বলীয়সা।
কিশোরবদ্ গুরুং ভারং ন বোঢ়ুমহমুৎসহে ॥ (যু-১২৮।৩)

---

(১) তুঃ—অহং পুত্রসহায়া ত্বামুপাসে গতচেতনম্।
সিংহেন পাতিতং সদ্যো গোঃ সবৎসেবগোবৃষম্ ॥ (কি-২৩।২৬)
তুঃ—বিবর্ণবক্ত্রা রুরুদুর্বরাঙ্গনা
বনান্তরে গাব ইবর্ষভোজ্ঝিতাঃ ॥ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত—৮।২৩

(২) আরও :—বেণুস্বরব্যঞ্জিততূর্যমিশ্রঃ
প্রত্যূষকালেঽনিলসম্প্রবৃত্তঃ।
সংমূর্ছিতো গহ্বরগোবৃষাণা-
মন্যোঽন্যমাপূরয়তীব শব্দঃ ॥ (কি-৩০।৫০)

'বলবান বৃষভই যে জোয়াল বহন করিতে সমর্থ তাহাই আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে ; কিশোর বৃষের ন্যায় এই গুরুভারকে বহন করিতে আমার আর উৎসাহ নাই।'

বেদের বহু বর্ণনাও আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক ঋষিগণ গাভী ও বৃষের উপমায়ই বহু জিনিষকে বর্ণনা করিয়াছেন। ধন হিসাবে গাভী-বৃষের মূল্য তখন বাল্মীকির যুগের মূল্য অপেক্ষাও বেশী ছিল,—এই কারণেই বেদে গাভী-বৃষের উপমার এত ছড়াছড়ি।

বিশ্ব-প্রকৃতির বর্ণনায় বা স্তবে বহুস্থলেই গাভী এবং বৃষের কথা ঋষিগণের মনে ভিড় করিয়াছিল। ইন্দ্রের স্তব-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অংঞ্জঃ
সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥ (ঋক্ ১।৩২।২)

'বৎসগণ যেরূপ ধেনুর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ স্যন্দমান জলরাশি সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।' ইন্দ্রই মেঘরূপ কালো গাভীকে দোহন করিতেন, এ-কথা বহুস্থানে দেখিতে পাই। আবার দেখি,—

বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি। (ঋক্—১।৩৮।৮)

'শব্দযুক্ত প্রস্তুত স্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জন করিতেছে ; বৎসকে যেমন মাতা (গাভী) সেবা করে (সেইরূপ বিদ্যুৎ মরুদ্গণের সেবা করিতেছে)।

বিপাশা (বিপাশ্) ও শতদ্রু (শুতুদ্রী) নদীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে
বিপাট্ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে ॥ (ঋক্-৩।৩৩।১)

দুইটি নদী বৎসলেহনাভিলাষিণী শুভ্র দুইটি গাভীর ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। জলবতী নদীর সহিত স্তনবতী গাভীর উপমা বেদের বহুস্থলে পাওয়া যায়। মাতা পৃথিবীকে বহুস্থানে গাভীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। দাবাগ্নিকে নির্ঘোষকারী বৃষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আবার বায়ুপ্রেরিত শব্দায়মান মেঘগুলিকে গর্জনকারী মহাবৃষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (অথর্ব ৪।১৫।১)। এ-জাতীয় উপমা এবং বর্ণনা বেদে খুঁজিয়া বাহির

করিতে হয় না, অজস্র রহিয়াছে; সুতরাং আমরা আর বেশী উদ্ধৃতির সাহায্য গ্রহণ করিলাম না।

উপরি উক্ত আলোচনার ভিতর দিয়া বাল্মীকি ও কালিদাসের যুগ এবং উভয়ের কবিপ্রতিভার পার্থক্যের একটা আভাস পাওয়া যাইবে মনে হয়। 'রঘুবংশে'র প্রারম্ভে কালিদাস বাল্মীকি প্রভৃতি পূর্বসূরীর উল্লেখ করিয়া অবশ্য বলিয়াছেন—

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥ (১।৪)

কিন্তু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, বিষয়-বস্তুতে কালিদাস বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বাল্মীকি-রামায়ণে যেখানেই বিচিত্র চরিত্রের সমবায়ে এবং সংঘাতে জীবনের ভিড জমিয়া উঠিয়াছে কালিদাস তাহাকে দুই একটি শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া জনপদ এবং অরণ্যের সেই ভিড় এড়াইয়া চলিয়াছেন। তিনি শুধু প্রধান প্রধান কয়েকটি চরিত্র এবং বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ঘটনা বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই প্রধান চরিত্র এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিকল্পনা প্রকাশের সুযোগ খুঁজিয়াছেন। ঘটনাবহুল জীবনের ভিড় কবিকে একস্থানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে দেয় না, ঠেলিয়া লইয়া চলে; কিন্তু কালিদাস এইরূপ ভিড়ের ঠেলা খাইয়া হটিবার পাত্র নহেন, যেখানে যেটুকু কবিকল্পনা ঢালিবার ইচ্ছা তাহা নিঃশেষ হইবার পূর্বে কবির সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলিবার কোন লক্ষণ কোথাও প্রকাশ পায় নাই। বাল্মীকি-রামায়ণের বিষয়বস্তু কালিদাসে অতি সংক্ষিপ্ত,—তিনি আশেপাশেই রং ফলাইয়াছেন বেশী। বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্রের আরণ্য জীবন এবং সেই আরণ্য জীবনে আরণ্যক মুনি-ঋষি এবং পার্বত্য বন্য জাতিগুলির সহিত মিলন-সংঘাতই সর্বাপেক্ষা বেশী স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু কালিদাস বিদর্ভরাজদুহিতা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় সমাগত রাজপুত্রগণের রূপগুণ বর্ণনায় যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন, এই আরণ্য প্রাণিগণের বর্ণনায় কোথাও সে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। রামায়ণের গল্পাংশের ঠাসবুনানীর ভিতর দিয়া কালিদাস প্রায় দৌড়াইয়া

চলিয়াছেন ; কিন্তু তিনি থামিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এক জায়গায়—লঙ্কা হইতে রামসীতার বিমানযোগে প্রত্যাবর্তনের পথে সমুদ্র ও বনের উপরিভাগস্থ বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষলোকে কবি তাঁহার কবি-কল্পনাকে ঘোরফের করাইবার একটি সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন, সুতরাং রঘুবংশের সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ সর্গটিতে চলিয়াছে শুধু রামসীতার প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা। এ বর্ণনার মূল বাল্মীকি-রামায়ণে থাকিলেও (দ্রঃ—যুদ্ধকাণ্ড ১২৩ সর্গ) এবং স্থানে স্থানে কালিদাসের বর্ণনা বাল্মীকির বর্ণনাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও[১] এ বর্ণনার চমৎকারিত্ব কালিদাসের কবিকল্পনার দান।

কালিদাসের কাব্য পাঠ করিতে করিতে বহুস্থনে অস্পষ্টভাবে বাল্মীকির স্মরণ হয়। যেমন রঘুবংশের প্রথম সর্গে দিলীপের বর্ণনা ও তাঁহার রাজত্বের বর্ণনা পড়িলে বালকাণ্ডে বাল্মীকি-বর্ণিত দশরথের বর্ণনা ও তাঁহার রাজত্বকালীন অযোধ্যার বর্ণনার কথা মনে পড়িয়া যায়। 'কুমার-সম্ভবে'র

(১) তুঃ—এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবনার্ণবে ॥ রামায়ণ

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্ ॥ রঘু

পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম্ ॥
অপারমিব গর্জন্তং শঙ্খশুক্তিসমাকুলম্। (রামায়ণ)

ঊর্ধ্বাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ
ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযূথম্ ॥ (রঘু)

এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি-
পর্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ। (ঐ)

এষা সা দৃশ্যতে পম্পা নলিনী চিত্রকাননা ॥
ত্বয়া বিহীনো যত্রাহং বিললাপ সুদুঃখিতঃ। (রামায়ণ)

দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদা-
দমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ ॥
অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্না-
মন্যোন্যদত্তোৎপলকেসরাণি।
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে
ময়া প্রিয়ে সস্পৃহমীক্ষিতানি ॥ (রঘু)

আরও তুঃ—এতদ্গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদ্
আবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ
ত্বদ্বিপ্রযোগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্ ॥ (রঘু)

দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণের ব্রহ্মার নিকটে গমন এবং তারকাসুরের নিধন প্রার্থনার সহিত বাল্মীকি-বর্ণিত বালকাণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে রাবণ কর্তৃক উৎপীড়িত দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণের সমবেতভাবে ব্রহ্মার নিকট গমন ও রাবণের নিধন প্রার্থনার সহিত প্রায় পংক্তিতে পংক্তিতে মিল রহিয়াছে।[১] 'কুমার-সম্ভব' নামটিও বোধহয় কালিদাস বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] 'কুমার-সম্ভবে' বর্ণিত বসন্ত ও মদনসহায়ে উমার শিবের তপস্যাভঙ্গের চেষ্টা এবং ক্রুদ্ধ শিব কর্তৃক মদনভস্ম—ইহার সহিত রামায়ণ-বর্ণিত ইন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত রম্ভার বসন্ত ও মদন-সহায়ে কঠোর তপস্যানিরত বিশ্বামিত্র মুনির ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা ও ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র কর্তৃক রম্ভাকে শাপদানের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এখানেও ব্রীড়িতা এবং ভীতা রম্ভাকে উৎসাহিত করিয়া ইন্দ্র বলিতেছেন—

সুরকার্যমিদং রম্ভে কর্তব্যং সুমহত্ত্বয়া।
লোভনং কৌশিকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্ ॥

* * *

কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে।
অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ ॥

(১) কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' দ্বিতীয় সর্গের সহিত তুলনীয়—

তাঃ সমেত্য যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ।
অব্রুবন্ লোককর্তারং ব্রহ্মাণং বচনং ততঃ ॥
ভগবন্ ত্বৎপ্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
সর্বান্নো বাধতে বীর্যাচ্ছাসিতুন্তং ন শক্নুমঃ ॥
ত্বয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবংস্তদা।
মানয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং সর্বং তস্য ক্ষমামহে ॥
উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছ্রিতান দ্বেষ্টি দুর্মতিঃ।
শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥
ঋষীন্ যক্ষান্ সগন্ধর্বান্ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তথা।
অতিক্রামতি দুর্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ ॥
নৈনং সূর্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে ॥
তন্মহন্নো ভয়ন্তস্মাদ্রাক্ষসাৎ ঘোরদর্শনাৎ।
বধার্থন্তস্য ভগবন্ উপায়ং কর্তুমর্হসি ॥ (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১৫।৫-১১)

(২) দ্রঃ—এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমার-সম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ ॥ (বা-৩৭।৩১)

ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্।
তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্॥ (বাল-৬৪।১, ৬-৭)

'কুমার-সম্ভবে'র উমার জন্মদিনের বর্ণনা হয়ত রামায়ণের রামচন্দ্রের বিবাহ-দিনের বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।[১]

কিন্তু বিষয়বস্তু ও বর্ণনা উভয় দিক হইতে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের গভীর মিল লক্ষ্য করিয়াছেন কালিদাসের অনেক টীকাকার কালিদাসের রচিত 'মেঘদূত' কাব্যের টীকা রচনা করিতে গিয়া।[২] কেহ কেহ মনে করেন যে 'মেঘদূত' কাব্যের মূল প্রেরণা কবি কালিদাস বাল্মীকির রামায়ণ হইতেই পাইয়াছিলেন। রামগিরি পর্বতে অভিশপ্ত বিরহী যক্ষের ছবিটি কালিদাস লক্ষ্মণ-সহ নির্বাসিত পর্বতবাসী এবং সীতাবিরহী রামচন্দ্রের বর্ণনা হইতেই মূলতঃ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন; অলকাপুরীতে বিরহখিন্না যক্ষপ্রিয়া অশোকবনে বিরহখিন্না সীতারই অস্পষ্ট প্রতিমূর্তি এবং দৌত্যকার্যে নিযুক্ত আকাশগামী হনুমান্ই সম্ভবতঃ কালিদাসের মনে মেঘদূতের পরিকল্পনা জাগাইয়া দিয়াছিল। কালিদাসের কাব্যরসিকগণ সকলেই অবশ্য এ সব কথা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কথাটি সর্বাংশে গ্রহণীয় না হইলেও ইহার ভিতরে কিছু কিছু সত্য আছে এ কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। রামচন্দ্র বিজন পর্বতে বসিয়া যখন সম্মুখে বাষ্পময়ী পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া শোকসন্তপ্তা বাষ্পাবৃতাননা সীতার কথা স্মরণ করিতেছে, মানসবাসলুব্ধ প্রিয়ান্বিত চক্রবাক সমূহ দেখিয়া, জলভরা মেঘের মন্থরগতি দেখিয়া, মেঘগণের পটভূমিকায় শ্বেতপদ্মের মালার ন্যায় আবদ্ধ-মালা বলাকা দেখিয়া দূরস্থিতা প্রিয়ার কথা স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি

(১) তু— প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং
শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টি।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং
সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব॥ (কুমারসম্ভব, ১।২৩)

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত॥ (বা ৭৩।৩৭-৩৮)

(২) এ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, এম-এ, মহাশয় লিখিত 'কাব্য কৌতুক' গ্রন্থে বাল্মীকি ও কালিদাস (দ্বিতীয় প্রস্তাব) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

প্রকাশ করিতেছে তখন এই সকলের সহিত কালিদাস কর্তৃক বর্ণিত বিরহী যক্ষের গভীর সাদৃশ্য আমাদিগকে বাল্মীকির নিকট কালিদাসের ঋণ স্মরণ না করাইয়া দিয়া পারে না। অশোকবনে "রাক্ষসীগণ পরিবৃতা শোকসন্তাপকর্শিতা মেঘরেখাপরিবৃতা চন্দ্ররেখার ন্যায় নিষ্প্রভা" সীতার বর্ণনা এবং মেঘদূতের যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা—

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি ॥ (উ, ২৩)

এই উভয়বর্ণনার সাদৃশ্য অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে রামায়ণের আরও একটি শ্লোক স্মরণ করা যাইতে পারে :—

ততো মলিনসংবীতাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্।
উপবাসকৃশাং দীনাং নিশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥
দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্রলেখামিবামলাম্।
মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্ ॥ (সু-১৫।১৮-১৯)

'মেঘদূতের' উত্তরমেঘে যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়—

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥২২॥

ইহার সহিত টীকাকারগণ গভীর মিল লক্ষ্য করিয়াছেন রামায়ণের বিরহিণী সীতার বর্ণনার :—

হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা
ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী
জনকসুতা কৃপনাং দশাং প্রপন্না ॥

মেঘদূতের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক—

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ (উ, ৪৬)

ইহার সহিত রামায়ণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি বেশ মিলাইয়া লওয়া যায়ঃ—

বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ ॥

মেঘদূতের অনেক শ্লোকের সহিতই এইরূপ রামায়ণের বহু শ্লোকের ভাবে বা ভাষায় মিল দেখান যাইতে পারে।

আমরা উত্তরমেঘের প্রথম শ্লোকেই দেখিতে পাই, কবি অলকাপুরীর প্রাসাদগুলিকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছেন; মেঘে বিদ্যুৎ রহিয়াছে, প্রাসাদে বিদ্যুৎ-প্রতিমা ললিতবনিতারা রহিয়াছে; মেঘে ইন্দ্রধনু রহিয়াছে প্রাসাদে আছে বিবিধবর্ণের চিত্রাঙ্কন; মেঘে আছে স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষ আর প্রাসাদে গম্ভীর মুরজধ্বনি; মেঘের ভিতরে আছে জল—প্রাসাদের আছে স্বচ্ছ মণিময় প্রাঙ্গণ;—মেঘ থাকে উচ্চে—প্রাসাদগুলির চূড়াও অতি উচ্চে।

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈ স্তৈর্বিশেষৈঃ ॥

রামায়ণে দেখিতে পাই, হনুমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া যে গৃহগুলি দেখিয়াছিল, সেই গৃহগুলির গবাক্ষ ছিল সুবর্ণজালবেষ্টিত এবং বৈদূর্যমণি-খচিত; তাহাতে আবার বিহঙ্গজাল; দেখিয়া মনে হইত গৃহগুলি ছিল বিদ্যুজ্জড়িত বিহগমসমূহসুশোভিত বর্ষাকালীন বিস্তৃত মেঘমালা।

স বেশ্মজালং বলবান্ দদর্শ
ব্যসক্তবৈদূর্যসুবর্ণজালম্।
যথা মহৎ প্রাবৃষি মেঘজালং
বিদ্যুত্পিনদ্ধং সবিহঙ্গজালম্ ॥ (সু-৭।১)

কালিদাস মূলের উপরে অনেক কারুকার্য করিয়াছেন ; কিন্তু মূল যে বাল্মীকিতে তাহাতে সংশয় নাই। কালিদাস উপরিউক্ত শ্লোকটির 'বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ' উপমাটি হুবহু বাল্মীকির নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন—

নারীপ্রবেকৈরিব দীপ্যমানং
তরিদ্ভিরম্ভোধরমর্চ্যমানম্। ইত্যাদি সু-৭।৭)

আরও লক্ষ্য করিতে পারি কালিদাস এখানে নগরসৌধ ও মেঘ লইয়া মালোপমা দিয়াছেন ; এই জাতীয় মালোপমা রামায়ণে দেখিতে পাই সৌধমালা ও পর্বতমালা লইয়া। এ প্রসঙ্গে আমরা সুন্দরকাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক, আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের ১৫ ও ১৬ শ্লোক উল্লেখ করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, রামায়ণের—

চিত্রামষ্টপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥
দুন্দুভিভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতং ভৃশমত্যর্থং······

প্রভৃতির ভিতরে 'বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ' ব্যতীত 'সচিত্রাঃ,' 'মণিময়ভুবঃ' এবং 'সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ' প্রভৃতির আভাস বেশ পাইতেছি।

ইহার পরে কালিদাস অলকাপুরীর যে একটি বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাল্মীকির রামায়ণের ঠিক একস্থানে কোথাও না পাইলেও আমরা বিভিন্ন স্থানে ছড়ান দেখিতে পাই। রামায়ণে লঙ্কাপুরীর বিভিন্নস্থানে যে বর্ণনা পাই তাহার ভিতরে এই অলকাপুরীর আভাস আছে বলিয়া মনে করি। মেঘদূতে অলকার বর্ণনায় দেখি,—

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥ (উ-৩)

বাল্মীকির লঙ্কাবর্ণনায় দেখিতে পাই—

> শুশুভে পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ লতাপরিগতৈর্দ্রুমৈঃ।
> লঙ্কা বহুবিধৈর্দৃশৈ্য র্যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥
> বিচিত্রকুসুমোপেতৈ রক্তকোমলপল্লবৈঃ।
> শাদ্বলৈশ্চ তথা নীলৈশ্চিত্রাভির্বনরাজিভিঃ ॥
> গন্ধাঢ্যান্যভিরম্যাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
> ধারয়ন্ত্যগমাস্তত্র ভূষণানীব মানবাঃ ॥
> তচ্চৈত্ররথসঙ্কাশং মনোজ্ঞং নন্দনোপমম্।
> বনং সর্বর্তুকং রম্যং শুশুভে ষট্‌পদাযুতম্ ॥
> দাত্যূহকোষষ্টিভকৈর্নৃত্যমানৈশ্চ বর্হিণৈঃ।
> রুতং পরভৃতাণাং চ শুশুভে বননির্ঝরে ॥
> নিত্যমত্তবিহঙ্গানি ভ্রমরাচরিতানি চ।
> কোকিলাকুলষণ্ডানি বিহঙ্গাভিরুতানি চ ॥ (ল-৩৯।৫-১০)

সুন্দরকাণ্ডেও লঙ্কার এইজাতীয় বর্ণনা পাওয়া যায়।[১] কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে উত্তরকুরুর জনপদের যে একটি বর্ণনা রহিয়াছে তাহার সহিত অলকার বর্ণনার মিল আরও স্পষ্ট।

> ততঃ কাঞ্চনপদ্মাভিঃ পদ্মিনীভিঃ কৃতোদকাঃ।
> নীলবৈদূর্যপত্রাঢ্যা নদ্যস্তত্র সহস্রশঃ ॥
> রক্তোৎপলবনৈশ্চাত্র মণ্ডিতাশ্চ হিরন্ময়ৈঃ ॥
> তরুণাদিত্যসঙ্কাশা ভান্তি তত্র জলাশয়াঃ।
> মহার্হমণিরত্নৈশ্চ কাঞ্চনপ্রভকেশরৈ ॥
> ... ...
> জাতরূপময়ৈশ্চাপি হুতাশনসমপ্রভৈঃ।
> নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র নগাঃ পত্ররথাকুলাঃ ॥
> ... ...
> সর্বর্তুসুখসেব্যানি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।
> ইত্যাদি। (৪৩।৩৯-৪৭)

---

(১) ১৫।২-১৩

এই প্রসঙ্গে রামায়ণের এই স্থানে রতিপ্রবণ নরনারীর যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহাও অলকার তজ্জাতীয় বর্ণনার উৎস বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না।—

স্ত্রিয়শ্চ গুণসম্পন্না রূপযৌবনলক্ষিতাঃ ॥...
রমন্তে সহিতাস্তত্র নারীভির্ভাস্বরপ্রভাঃ ॥
সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে রতিপরায়ণাঃ।
সর্বে কামার্থসহিতা বসন্তি সহযোষিতঃ ॥
গীতবাদিত্র নির্ঘোষঃ সোৎকৃষ্টহসিতস্বরৈঃ।
শ্রূয়তে সততং তত্র সর্বভূতমনোরমঃ ॥
তত্র নামুদিতঃ কশ্চিন্নাত্র কশ্চিদসৎপ্রিয়ঃ।
অহন্যহনি বর্ধন্তে গুণাস্তত্র মনোরমাঃ ॥ (৪৩।৪৯-৫৩)

এই শেষের শ্লোকটিই কি অলকাবাসী সম্বন্ধে বর্ণনা-'আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ' প্রভৃতির প্রাক্-রূপ ?

এমন সংশয়কেও আমরা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না যে লঙ্কাপুরীর মধ্যে অশোকবনে স্থিতা সীতার বর্ণনা

পূর্ণচন্দ্রাননাং সুভ্রূং চারুবৃত্তপয়োধরাম্।
কুর্বন্তীং প্রভয়া দেবীং সর্বা বিতিমিরা দিশঃ ॥
তাং নীলকণ্ঠীং বিম্বোষ্ঠীং সুমধ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্।
সীতাং পদ্মপলাশাক্ষীং মন্মথস্য রতিং যথা ॥ (সু-১৫।২৮-২৯

প্রভৃতিই কালিদাসের অলকাস্থিতা যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

প্রভৃতির মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে।[১]

(১) শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

মহাকবি কালিদাসের উপরে কবিগুরু বাল্মীকির প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া এই সকল অস্পষ্ট বা স্পষ্ট স্মরণকেই অতিমাত্রায় বড় করিয়া দেখিয়া কালিদাসের উপরে বাল্মীকির প্রভাব আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না। সুতরাং এই জাতীয় আলোচনায় আর প্রবেশ না করিয়া উভয় কবির কাব্যপ্রতিভার মৌলিক লক্ষণের ভিতরে যে গভীর মিল আছে তাহা লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। উভয় কবির কবিধর্মের মৌলিক পার্থক্য যেখানে, আমরা পূর্বে তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় কবির কবিধর্মে যে মিল রহিয়াছে তাহাও অতি গভীর। যে ইতিহাস উভয় কবির ভিতরে যুগের ব্যবধান ঘটাইয়া কবিধর্মের পার্থক্য ঘটাইয়াছে সেই ইতিহাসই আবার সম-ঐতিহ্য ও সম-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়া উভয় কবির ভিতরে একটি যোগসূত্রও রক্ষা করিয়াছে।

৪ ॥

আমাদের বিচারে কালিদাসের কাব্যগুলি যে-সকল মহদ্‌গুণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাহার ভিতরে একটি প্রধান গুণ বহিঃপ্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের গভীর যোগ এবং কাব্যের ভিতরে এই গভীর যোগের অনন্যসাধারণ প্রকাশ। প্রথমে এই দিক্‌ হইতেই কালিদাস এবং বাল্মীকির সাধর্ম্যবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

কালিদাসের কাব্যে বিশ্ব-প্রকৃতির বর্ণনা সম্বন্ধে সর্বপ্রথমেই একটা কথা আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে; তাহা এই যে, কবি তাঁহার কাব্যে বিশ্ব-প্রকৃতির জড়-অংশটা এবং চেতন-অংশের ভিতরে স্পষ্ট কোন ভেদ-রেখা টানিতে পারেন নাই,—সমস্ত কাব্যের ভিতরে জড় ও চেতনের একটা আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। এই মিলটির পশ্চাতে কবির নিছক একটি ভাবদৃষ্টিই নাই, এ-মিল কবির কাব্যে সর্বত্রই এমন সহজ ভাবে দেখা দিয়াছে যে, কোথাও তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই জাগে না। কবি তাঁহার চিত্তের মধ্যে প্রকৃতির এমন একটি রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যাহার ভিতরে জড়সত্তা এবং চেতনসত্তা ওতপ্রোতভাবে অন্বিত হইয়া আছে। কবির কাব্যের ভিতরে এইরূপ নিরন্তর জড় হইতে চেতনে বা চেতন

হইতে জড়ে যাতায়াত করিতে আমাদের মনের কোনরূপ ক্লেশ নাই, এই যাতায়াত সম্বন্ধে আমরা কোথাও সচেতনও নহি। কালিদাসের 'রঘুবংশে' বর্ণিত সীতা যে ধরণী-দুহিতা ইহা একটা পূর্বলব্ধ সংস্কার মাত্র নহে; সীতাকে কবি নিজেও ধরণী-দুহিতা রূপেই দেখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা যেদিন নির্বাসিত হইয়াছিল, জননী বসুন্ধরার সহিত সীতার নাড়ীর যোগ সেদিন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। কালিদাস বর্ণিত এই যোগ নিছক কবিকল্পনা না হইয়া বহু স্থানে জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার একটি সান্ত্বনা বাক্যের ভিতরে মাটির সহিত সীতার যোগ সহজ হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রম ঋষি সীতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন,—

পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্
সংবর্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাকৃতনয়োপপত্তেঃ
স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্॥ (রঘু, ১৪।৭৮)

'নিজের সামর্থ্যানুসারে পয়োঘটের দ্বারা আশ্রম বালবৃক্ষদিগকে সংবর্ধিত করিয়া তুমি অসংশয়ে পুত্রজন্মের পূর্বেই স্তনন্ধয়শিশু পালনের প্রীতি লাভ করিবে।'

কালিদাসের কাব্যে বালবৃক্ষ সর্বদাই এইরূপ স্তন্যপায়ী শিশু। তাই মায়াসিংহ রাজা দিলীপকে বলিয়াছিল,—

অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং
পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
যো হেমকুম্ভস্তননিঃস্থতানাং
স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ॥
কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিৎ
বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য।
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ
সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ॥ (রঘু, ২।৩৬-৩৭)

"সম্মুখে ঐ দেবদারু দেখিতেছ কি? বৃষভধ্বজ শিব উহাকে নিজের পুত্র করিয়া লইয়াছেন। এই দেবদারু গাছ কুমার স্কন্দের মাতা পার্বতীর হেমকুম্ভরূপ স্তন হইতে নিঃসৃত দুগ্ধধারার আস্বাদ লাভ করিতে পারিয়াছে। একদিন

একটি বন্যহস্তী গাত্র ঘর্ষণ করিয়া এই দেবদারুর ত্বক্ উন্মথিত করিয়া দিয়াছিল,—তাহাতে গিরিদুহিতা পার্বতী ইহার জন্য ঠিক তেমন করিয়াই শোক করিয়াছিলেন, যেমন শোক করিয়াছিলেন তিনি অসুরাস্ত্রে ক্ষত কার্তিকের জন্য।" আবার অন্যত্র দেখি,—

অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্
ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং
ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি॥ (কুমার-সম্ভব, ৫।১৪)

"অতন্দ্রিতা সে (উমা) নিজেই শিশু-বৃক্ষগুলিকে ঘটস্তন প্রস্রবণের দ্বারা বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল; এই পূর্বজাত পুত্রগুলির প্রতি (উমার) পুত্র-বাৎসল্য স্বয়ং কুমার কার্তিকও হ্রাস করিতে পারিবে না।"[১]

'কুমার-সম্ভবে'র প্রথমেই দেখিতে পাই, উত্তর দিকে অবস্থিত দেবতাত্মা নগাধিপ হিমালয়-পর্বতের বর্ণনা। এই হিমালয়ের পরিচয়ের ভিতরে পর্বত হিমালয়েরই কতগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃশ্য এবং ঘটনার বর্ণনা দেখিতে পাই। অনন্তরত্নপ্রভব হিমালয়ের কঠোর হিমের বর্ণনা আছে, ইহার শিখরস্থ গৈরিক ধাতুর রক্তিম আভা মেঘমালায় সংক্রমিত হইয়া অকালসন্ধ্যার ন্যায় অপ্সরাগণকে বিলাসভূষণ সম্পাদনে প্ররোচিত করে, এখানে তুষার পতনে রক্তবিন্দু ধৌত হইলেও কিরাতগণ নখরন্ধ্রমুক্ত গজমুক্তাফল দর্শনে গজহন্তা কেশরীদের পথ জানিতে পারে; এখানকার গুহামুখোত্থিত বায়ু কীচকরন্ধ্র পরিপূরিত করিয়া কিন্নরগণের সঙ্গীতে তান প্রদান করে, এখানে কপোলকণ্ডূয়ন নিবারণার্থ হস্তিগণ দেবদারু বৃক্ষ ঘর্ষণ করে, সেই ঘর্ষণ-নিঃসৃত নির্যাসের সুরভিতে সমস্ত সানুদেশ পরিপূর্ণ। এই হিমালয় দিবাভীত অন্ধকারকে তাহার গুহার ভিতরে দিবাকরের হাত হইতে রক্ষা করে; চমরীমৃগগণ চন্দ্রকিরণগৌর লাঙ্গুল বিশেষের দ্বারা নগাধিরাজকে ব্যজন করে, মৃগান্বেষী কিরাতগণ এখানে ভাগীরথীর নির্ঝরকণাবাহী সমীরণের দ্বারা সেবিত হয়। এই হিমালয়েরই আদরিণী কন্যা উমা। পাষাণে-গড়া

(১) তুলনীয়—
ভগবতো মহামুনেরগস্ত্যস্য ভার্যয়া লোপমুদ্রয়া স্বয়মুপরচিতালবালকৈঃ করপুট-সলিলসংবর্ধিতৈঃ সুতনিবিশেষৈরুপশোভিতং পাদপৈঃ—ইত্যাদি। কাদম্বরী।

হিমালয়ের দিগন্তব্যাপী বিরাট কর্কশ দেহ, তবু পিতৃস্নেহেরকোনও অভাব নাই। রুদ্রতেজে মদন ভস্মীভূত হইলে উমা যখন শোচনীয় পরাজয় লাভ করিল, তখন পিতা আগাইয়া গিয়া রুদ্রকোপভয়হেতু মুকুলিতাক্ষী দুহিতাকে দুই বাহু বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, এবং সুরগজ ঐরাবত যেমন করিয়া আদরে দন্তলগ্না পদ্মিনীকে বহন করে তেমন করিয়াই তাঁহার কর্কশ বুকে উমাকে লইয়া বেগে দীর্ঘীকৃতাঙ্গ হইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন।

সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা
দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিমাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
প্রতিপথগতিরাসীদ্ বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ॥ (কুমারসম্ভব, ৩।৭৬)

উমাকে যেখানে চিরন্তন সামাজিক বিধানে বিবাহ দিবার সময় আসিল সেখানে পিতা হিমালয়কেও সামাজিক জীব হইতে হইল। কালিদাস হিমালয়কে অতি কৌশলে পর্বত হিমালয়ও রাখিয়াছেন আবার তৎসঙ্গে সামাজিক জীবও করিয়া তুলিয়াছেন। যোগীশ্বর মহাদেবের বিবাহের ঘটক হইলেন সপ্তর্ষিগণ; তাঁহারা সম্বন্ধের বার্তা লইয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন হিমালয়ের পুরী 'ওষধিপ্রস্থে'। এই 'ওষধিপ্রস্থ' নামটিও লক্ষণীয়। এই 'ওষধিপ্রস্থ'—

গঙ্গাস্রোতঃপরিক্ষিপ্তং বপ্রান্তর্জ্বলিতৌষধি।
বৃহন্মণিশিলাসালং গুপ্তাবপি মনোহরম্॥
জিতসিংহভয়া নাগা যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ।
যক্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ পৌরা যোষিতো বনদেবতাঃ॥ (৬।৩৮,৩৯)

এই পুরী গঙ্গাস্রোতদ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রাচীরের অভ্যন্তরে ওষধিগুলি প্রজ্বলিত হইয়াই দীপের কাজ করিতেছে; বৃহৎ মণিশিলা খচিত ইহার প্রাচীর—গুপ্ত হইলেও মনোহর। এখানে হাতীগুলির আর সিংহের ভয় নাই, বিল হইতে অশ্ব জাত হয়; যক্ষ এবং কিন্নর ইহার পৌরজন, বনদেবতারাই পুরকামিনী।—এমনি করিয়া কালিদাস 'ওষধিপ্রস্থে'র যে বর্ণনা করিলেন তাহা একটি পার্বত্য অঞ্চলও বটে—আবার পুরীও বটে! এই 'ওষধিপ্রস্থে'র নাগরিক হিমালয় সপ্তর্ষির অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন—

নময়ন্ সারগুরুভিঃ পাদন্যাসৈর্বসুন্ধরাম্। (৬।৫০)

তাঁহার গুরুভার পাদন্যাসে বসুন্ধরাকে নমিত করিয়া আসিতেছিলেন! এই হিমবান্—

> ধাতুতাম্রাধরঃ প্রাংশুর্দেবদারুবৃহদ্ভুজঃ।
> প্রকৃত্যৈব শিলোরস্কঃ সুব্যক্তো হিমবানিতি॥ (৬।৫১)

তাঁহার ধাতুতাম্র অধর, উন্নত দেহ, দেবদারুর বিশালভুজ, প্রকৃতিতেই প্রস্তরের বক্ষ—তিনিই যে হিমবান্ ইহা সুব্যক্ত। হিমালয় মহর্ষিগণকে পাদ্য-অর্ঘ্যে অভ্যর্থিত করিয়া বলিলেন—

> ভবৎসম্ভাবনোত্থায় পরিতোষায় মূর্চ্ছতে।
> অপি ব্যাপ্তদিগন্তানি নাঙ্গানি প্রভবন্তি মে॥
> ন কেবলং দরীসংস্থং ভাস্বতাং দর্শনেন বঃ।
> অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোঽপি পরং তমঃ॥ (৬।৫৯-৬০)

আপনাদের অনুগ্রহজন্য আনন্দ এত অপর্যাপ্ত হইয়াছে যে, আমার দিগন্তব্যাপী অঙ্গেও তাহার স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। জ্যোতির্ময় আপনাদের দর্শনের দ্বারা কেবল আমার গুহাস্থিত তমঃই দূরীভূত হইল না, আমার আভ্যন্তরীণ রজঃ (ধূলি এবং রজোগুণ) এবং তমঃও (অন্ধকার এবং তমোগুণ) দূরীভূত হইল।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এই হিমালয় পর্বতও বটে, সামাজিক জীবও বটে। কবি বলিয়াছেন যে, হিমালয়ের স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দুইটি রূপ আছে; এবং এই দুই রূপকে একত্রে মিলাইয়াই এখানে তিনি হিমালয়ের সকল বর্ণনা করিয়াছেন। আসলে বিশ্ব-প্রকৃতিরই একটা স্থাবর রূপ এবং একটা জঙ্গম রূপ রহিয়াছে, এবং এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রকৃতি উভয় রূপকে এক করিয়া কবির দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল; কবিও তাই প্রকৃতির ভিতরে স্থাবর-জঙ্গমকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেখিতে চাহেন নাই। এইজন্যই দেখিতে পাই, কন্দর্পের সহিত যে অকাল-বসন্তকে সহায় করিয়া গিরিরাজ-দুহিতা উমা কৃত্তিবাসের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিল, সে বসন্ত কন্দর্প এবং উমার মতই বিগ্রহবান্ এবং প্রাণবান্। দিকে দিকে প্রাণলীলার প্রাচুর্যে এবং চাঞ্চল্যে সে জীবতনুর ন্যায়ই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। সহসা অশোকের স্কন্ধদেশ পর্যন্ত নবকিশলয়-রঞ্জিত রাশি রাশি কুসুম-গুচ্ছে ভরিয়া গেল, আম্রশাখা কিশলয় অঙ্কুর এবং আম্রমুকুল স্পন্দিত হইয়া

উঠিল, নির্গন্ধ কর্ণিকারের বর্ণদ্যুতি বিচ্ছুরিত হইল, বসন্ত-সঙ্গতা শ্যামল বনভূমির গাত্রে বালেন্দুবক্র অশোকরূপ নখক্ষত দেখা দিল, মধুশ্রীর মুখে ভ্রমরের তিলক এবং বালারুণকোমল চূতপ্রবালোষ্ঠ শোভা পাইল, পিয়ালতরুমঞ্জরীর রেণুকণায় দৃষ্টিপাত বিঘ্নিত হইলেও মদোদ্ধত মৃগগণ যেখানে বনস্থলীর মর্মর পত্রধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার উপর দিয়া সমীরণাভিমুখে ধাবিত হইল, চূতাঙ্কুরাস্বাদে কষায়কণ্ঠ কোকিলের রব জাগিয়া উঠিল—দিকে দিকে লীলাচঞ্চল প্রাণের সাড়া পড়িয়া গেল; কুসুমের একটি পাত্রে ভ্রমর-ভ্রমরী মধুপানে মত্ত হইল, স্পর্শনিমীলিতাক্ষী মৃগীকে কৃষ্ণসার মৃগ কণ্ডূয়নের দ্বারা সোহাগ করিতে লাগিল, রসের আবেশে করেণু গণ্ডূষপূর্ণ পদ্মরেণুগন্ধি জল হাতীকে দিল, অর্ধোপভুক্ত মৃণালখণ্ডের দ্বারা চক্রবাক নিজের প্রিয়াকে সাদর সম্ভাষণ জানাইল, বনের তরুগণও পর্যাপ্তপুষ্পস্তবক-স্তনবতী প্রদীপ্ত-পল্লবোষ্ঠযুক্ত মনোহরা লতাবধূগণের নিকট হইতে বিনম্রশাখা-ভুজ-বন্ধন লাভ করিয়াছিল। এখানে প্রকৃতি জড়-চেতন স্থাবর-জঙ্গমের অভেদরূপে মূর্ত। এক দিকে যেমন কবি এমনি ভাবে প্রাণ-লীলায় জীবন্ত করিয়া প্রকৃতিকে মানুষের অনেকখানি সজাতীয় করিয়া মানুষের কাছে টানিয়া আনিয়াছেন,—অন্য দিকে আবার তিনি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে-সরিয়া-যাওয়া চেতন-বিলক্ষণ মানুষকে টানিয়া আনিয়া প্রকৃতির সহিত সহজভাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই পূর্বোক্ত বসন্তোজ্জীবিত বনস্থলীর পটভূমিতে যে উমার আবির্ভাব ঘটাইলেন তাহার—

> অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগ-
> মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
> মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং
> বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥
> আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
> বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
> পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
> সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥ (৩।৫৩-৫৪)

উমার অঙ্গে অশোকগুচ্ছ পদ্মরাগমণিকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল—কর্ণিকার ফুল স্বর্ণের দ্যুতি কাড়িয়া লইয়াছিল, সিন্ধুবারপুষ্পই মুক্তাকলাপের স্থান ধিঅকার করিয়াছিল; অঙ্গে অঙ্গে নবযৌবনা উমা বপুসন্তপ্পাতরণ বহন্ন

করিতেছিল। উমা স্তনভারে যেন আনম্রা—তরুণার্করাগ বসন পরিহিতা—যেন পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকের ভারে অবনম্র সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

এখানে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, যেমন করিয়া বসন্তের বনস্থলীতে তরুলতা নব প্রাণরসে পুষ্পে-পল্লবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে—যেমন করিয়া সহকারতরু নবযৌবনা লতাবধূর ভুজবন্ধন লাভ করিয়াছে, যেমন করিয়া ভ্রমর-ভ্রমরী, হরিণ-হরিণী, চক্রবাক-চক্রবাকী, গজ এবং গজবধূ প্রেমলীলায় চঞ্চল—উমার যৌবনশ্রী এবং প্রেমচাঞ্চল্য ঠিক সেই একই ছন্দে গাঁথা। কবি এমন একটি মোহের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার ভিতরে কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় না, এখানে বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের ন্যায় চেতন ধর্মে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, না উমা তাহার সকল মনুষ্যধর্ম লইয়াই বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে! এমনি করিয়াই সর্বত্র স্থাপন করিয়াছেন কালিদাস মানুষ এবং বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে গভীর আত্মীয়তা।

এই গভীর আত্মীয়তাই মূর্তি লাভ করিয়াছে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' এবং 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকেও। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র চতুর্থ অঙ্কে আশ্রম-প্রকৃতি যে একান্ত সজীব হইয়া একটি নাট্যবর্ণিত চরিত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার ভিতরেও দেখিতে পাই কালিদাসের সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি এক দিকে আশ্রম-প্রকৃতিকে যেমন জঙ্গম-চেতনধর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই শকুন্তলাকে যতখানি পারেন প্রকৃতি-দুহিতা করিয়া তুলিয়াছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে যেখানে আশ্রম-তরুলতার আলবালে জল-সেচননিরতা শকুন্তলা বলিতেছে—'ণ কেবলং তাদণিওও এব্ব, অত্থি মে সোদরসিণেহোবি এদেসু'—তাত কাশ্যপের নিয়োগের জন্যই নহে, এই আশ্রম-তরুগণের প্রতি আমারও একটা সোদর স্নেহ রহিয়াছে—সেইখানেই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের আভাস ধ্বনিত হইয়াছে। প্রকৃতির কোলে পরিবর্ধিত তরুলতা পশু-পাখী সকলের সহিতই বল্কলপরিহিতা শকুন্তলার প্রথমাবধি একটা সজাতীয়ত্ব—একটা সোদরত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে! শকুন্তলার বর্ণনায়ও কালিদাস যতটা পারেন তাহাকে প্রকৃতির কাছে টানিয়া রাখিয়াছেন। সে 'ণোমালিআকুসুমপেলবা' সে শৈবালমণ্ডিত সরোজ অপেক্ষাও অধিক মনোজ্ঞা, তাহার—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

এবং এইরূপে সহোদরা বলিয়াই 'বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরেদি বিঅ মং

কেসররুক্খও'—বায়ুচালিত পল্লবাঙ্গুলি দ্বারা বকুল গাছ তাহাকে কাছে ডাকে ; সে পতিগৃহে যাত্রা করিলে আশ্রম-প্রকৃতি মাঙ্গল্য উচ্চারণ করে, তাহাকে ক্ষৌমবসন, অলক্তক এবং বিবিধ উপহার দান করে, আশ্রম পরিত্যাগ কালে তাহার বসনাঞ্চল টানিয়া ধরে, বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া গভীর বিষাদে অশ্রুমোচন করে।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ যোগের আর একটি অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাই 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে। রাজা পুরূরবার প্রিয়তমা উর্বশী পার্বত্যবন-প্রদেশে লতারূপে পরিণত হইয়াছে, পুরূরবা বিরহে উন্মত্ত হইয়া সেই পাবত্য বনদেশে তাহার প্রিয়ার সন্ধান করিতেছে। অঙ্কটির আরম্ভেই দেখিতে পাই, উর্বশী-সখী চিত্রলেখা সহচরী উর্বশীর বিরহে কাতর হইয়া দ্বিপদিকা তাললয়ে গান ধরিয়াছে—

সহঅরিদুক্খালিদ্ধঅং সরবরঅম্মি সিণিদ্ধঅম্।
বাহোবগ্গিঅণঅণঅং তম্মই হংসীজুঅলঅম্॥

'সহচরী-দুঃখে কাতর বাষ্পাচ্ছাদিতনয়ন স্নিগ্ধ হংসীযুগল আজ সরোবরে তাপ ভোগ করিতেছে।' এখানে চিত্রলেখা এবং সহজন্যাই সরোবরের স্নিগ্ধ হংসীযুগল, সহচরী উর্বশীর বিরহে তাহারা কাতরা। আর তাহার পরে দেখিতে পাই, তাহারা যখন পুনরায় উর্বশীর সহিত দর্শনের আশা পাইল তখন—

চিন্তাদুম্মিঅমাণসিআ সহঅরিদংসণলালসিআ।
বিঅসিঅকমল-মণোহরএ বিহরই হংসী সরবরএ॥

'সতত চিন্তায় ব্যাকুলমানসা হংসী সহচরীর দর্শন-লালসায় বিকসিতকমল-মনোহর সরোবরে বিহার করিতেছে।' তাহার পর যখন আকাশে বদ্ধদৃষ্টি বিরহোন্মত্ত রাজা পুরূরবা প্রবেশ করিল তখন—

হিঅআহিঅপিঅদুক্খও সরবরএ ধুঅপক্খও।
বাহো-বগ্গিঅ-ণঅণও তম্মই হংসজুআণও॥

'হৃদয়ভরা প্রিয়াদুঃখ, বাষ্পাকুলনয়নে হংসযুবা সরোবরে ডানা ঝাপ্টায় আর ক্লেশ ভোগ করে!' এই প্রিয়াদুঃখকাতর বাষ্পাকুলনয়ন হংসযুবা পুরূরবা। এই গানগুলিকে কবি এমন ভাবে সমস্ত অঙ্কটির মাঝে মাঝে ভরিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা একটি নেপথ্য-সঙ্গীতের সুরের জালে যেন

অতি সূক্ষ্ম এবং মোহময় একটি যবনিকার সৃষ্টি করিয়াছে; সে যবনিকার একদিকে রহিয়াছে মানুষের জীবনলীলা; বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত নদ-নদী তরু-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতির প্রাণ-লীলার বিরাট্ পটভূমিতেই কবি দেখিতে চাহিয়াছেন মানুষের জীবনের সকল সুখ-দুঃখকে। তাই দেখিতে পাই, কবি পুরূরবার বিরহ-দশার আর একটু বর্ণনা দিয়াই আবার নেপথ্য-সঙ্গীতের সুর তুলিযাছেন,—

দইআরহিও অহিঅং দুহিও বিরহাণুগও পরিমন্থরও।
গিরিকাণণএ কুসুমুজ্জলএ গঅজূহবঈ উঅ ঝীণগঈ॥

‘দয়িতারহিত অধিক দুঃখিত বিরহানুগত এবং একান্ত মন্থর গজযূথপতি কুসুমোজ্জ্বল কাননে আজ অতীব হীনগতি।’ কবি মানুষের প্রণয়কাতর জীবনকে একটু একটু করিয়া রঙ্গমঞ্চে আনিয়াছেন আর ক্ষণে ক্ষণে এই গানগুলি দ্বারা মানব-জীবনের চারিদিকে বিরাট পটভূমির মত বিশ্ব-জীবনের দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই পটভূমিকা রচনার ফলে বিরহী রাজার বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যে যোগ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা একটা কবিকল্পনামাত্র না হইয়া গভীর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বর্ষার জলস্পর্শে মলিনগর্ভ আরক্ত নবকন্দলী কুসুমগুলি কোপহেতু অন্তর্বাষ্প-আরক্তিম প্রিয়ানয়ন দু’টির কথাই বিরহী রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ইন্দ্রগোপ তৃণের সহিত অচিরোদ্গত ঘাসগুলি দেখিয়া মনে হইয়াছে, প্রিয়া রোষ-বশে চলিয়া যাওয়ায় তাহার শুকোদরশ্যাম স্তনাংশুক পড়িয়া আছে, চোখের জল অধররাগের সহিত মিলিত হইয়া সেই স্তনাংশুকে লাল লাল বিন্দু ধারণ করিয়াছে। নৃত্যতৎপর ময়ূরকে দেখিয়া রাজা প্রশ্ন করিয়াছিল—

বরহিণপবৃভ! পই অব্ভত্থেমি, আঅক্‌খু হি মে তা।
এত্থ অরণ্ণে ভমন্তে জই পই দিট্ঠা সা মহু কন্তা॥

‘হে ময়ূররাজ, তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি; এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি যদি আমার কান্তাকে দেখিয়া থাক তবে আমাকে তাহা বল।’ কাননের পরভৃতিকাকে ডাকিয়াও রাজা জিজ্ঞাসা করিল—

পরহুঅ! মহুরপলাবিণি কন্তী ণন্দণবণ-সচ্ছন্দ-ভমন্তী।
জই পই পিঅঅম সা মহ দিট্ঠা তা আঅক্‌খহি মহু পরপুট্ঠা॥

‘হে মধুরপ্রলাপিনি কান্তা পরভৃতবধু, নন্দনবনে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি আমার সেই প্রিয়তমাকে তুমি দেখিয়া থাক তবে আমাকে

তাহা বল।' এমনি করিয়া মানসগামী রাজহংসদিগকে ডাকিয়া রাজা প্রিয়ার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছে, গোরোচনা-কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাকের নিকট, করিণীসহায় নগাধিরাজের নিকট, স্ফটিকশিলাতল নির্মলনির্ঝরশালী পর্বতের নিকট প্রিয়ার বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। প্রিয়া-বিরহের গভীরতা তাহার চোখের সম্মুখ হইতে জড় ও চেতনের ভেদের পর্দাখানি সরাইয়া দিয়াছে। তাহার পরে বেগে ধাবমানা নদীকে দেখিয়া মনে হইয়াছে—

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরশনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা॥

রাজার মনে হইল, নিশ্চয়ই সেই অসহিষ্ণু প্রিয়া আজ এই নদীভাবে পরিণতা ; তরঙ্গ তাহার ভ্রূভঙ্গ, ক্ষুভিত বিহগশ্রেণী তাহার মেখলা, ফেনপুঞ্জ তাহার রোষশিথিল বসন—স্খলিত বসন যেন বার বার টানিয়া চলিতেছে ; আর রোষাবেগে যেন বার বার হোঁচট্ খাইয়া বক্রগতিতে চলিয়াছে !—কিন্তু ইহার কোথায়ও প্রিয়ার সন্ধান না পাইয়া সর্বশেষে একটি বনলতাকে দেখিয়া রাজার মনে হইল, তাহার অভিমানিনী প্রিয়া নিশ্চয়ই ঐ পার্বত্য বনলতায় পরিণত হইয়াছে।

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ
শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্ বিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্‌গমা।
চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে
চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকুপ্যেব সা॥

মেঘজলসম্পাতে ধৌতপল্লবা তন্বী এই লতা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অধরপল্লব বিধৌত করিয়াছে ; অকালে পুষ্পোদ্‌গম বন্ধ হওয়ায় যেন আভরণশূন্যা, ভ্রমরের শব্দহীন বলিয়া সে যেন চিন্তামৌন হইয়া আছে, মনে হয় পাদপতিত আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই সততকোপনা প্রিয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে।— এই বলিয়া বিরহী রাজা বনলতাকে আলিঙ্গন করাতে সেই বনলতাই উর্বশী মূর্তিতে রাজার বাহুডোরে ধরা দিল। উর্বশীর এই লতারূপে পরিণতি এবং বনলতার পুনরায় উর্বশী মূর্তিতে পরিণতির ভিতরে কবি কিছু অলৌকিকতার আমদানী করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অলৌকিকতার বাচ্যার্থ

হইতে এখানে কাব্যধ্বনিই প্রধান এবং অধিক মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত গভীর আত্মীয়তায় চেতন-অচেতনের অদ্বয়ত্বই এখানে কাব্যধ্বনি—উহাই কালিদাসের অন্তর্লক্ষ বাণী।

কালিদাসের মেঘদূতের ভিতরে—বিশেষ করিয়া 'পূর্বমেঘে' এই কবিদৃষ্টির একটি বিচিত্র পরিণতি দেখিতে পাই। কবি এখানে 'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা' বিরহী যক্ষের ভূমিকায় আষাঢ়ের প্রথম দিনে পর্বতের সানুদেশে বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজ মেঘকে দেখিয়া অন্তর্বাষ্প হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য দ্বারা তাহাকে প্রিয়-সম্ভাষণ জানাইয়া রামগিরি পর্বত হইতে অলকাপুরীতে তাঁহার কল্পিত প্রিয়ার নিকট দূত পাঠাইবার প্রস্তাব জানাইলেন। আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দর্শনে এই অন্তর্বাষ্পত্ব সম্বন্ধে কবি অবশ্য একটা কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥

এবং 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতে'র সন্নিপাতে গঠিত মেঘকে কেন দূত করিয়া পাঠাইতেছেন তাহার জবাব দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥

বিরহী ব্যক্তির চেতন এবং অচেতনে কোন ভেদ থাকে না। আসলে কবির এই সকল জবাবদিহি অ-সহৃদয় এবং অরসিক পাঠকের জন্য। কালিদাসের বাসনা-লোকে বিশ্বজীবনের এক ছন্দে চেতন এবং অচেতন পরস্পরে মেশামিশি করিয়া এক হইয়া আছে—সমস্ত পূর্বমেঘের ভিতরেই রহিয়াছে এই চেতন-অচেতনের যৌথলীলা। রামগিরি হইতে কৈলাস শিখরের অঙ্কে অবস্থিত অলকাপুরী পর্যন্ত পল্লী-নগরী, নদ-নদী, বন-উপবন সমতলক্ষেত্র এবং পর্বতরাজি-সমন্বিত যে একটা বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ রহিয়াছে, আষাঢ়ের গতিশীল মেঘকে বাহন করিয়া সেই বিচিত্র ভূমিভাগের উপর দিয়া কবি তাঁহার সজাগ মনটিকে একবার ঘুরাইয়া আনিয়াছেন। মেঘাশ্রয়ে কবিমন দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ পৃথিবী হইতে একটু ঊর্ধ্বে উঠিয়া আশেপাশে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছে—সে চোখে বিরহের বাষ্পাবরণ কম—মিলন-বিচ্ছেদে বিচিত্র প্রেমের সুনিপুণ অঞ্জনরেখাই স্পষ্ট। এই বিস্তীর্ণ ভূমিভাগের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কবি যাহা কিছু দেখিয়াছেন তাহার সকল দৃশ্য ও ঘটনা মিলিয়া মিশিয়া একটি অখণ্ড প্রেম-লীলার

ঐক্যতানে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই প্রেম-লীলার ভিতরে প্রকৃতির কোন অংশটাই স্থাবর নয়, আবার একান্তভাবে স্থাবর-বিলক্ষণ জঙ্গমও নয়; কোন অংশই যেমন সম্পূর্ণভাবে অচেতন নয়, ঠিক তেমনই আবার মনে হয়, চেতন অংশটাও যেন অতি উগ্রভাবে অচেতন-বিলক্ষণ চেতন নয়!

আষাঢ়ের নবীন মেঘকে দেখিয়া প্রিয়াগমনের প্রত্যয়বশতঃ যে পথিক-বনিতাগণ উদ্‌গৃহীতালকান্তা হইয়া উর্ধ্বে তাকাইবে, অনুকূল বাতাসে মন্দ আন্দোলিত মেঘের বামে থাকিয়া যে চাতকগুলি মধুর রব করিবে, গর্ভাধান ক্ষণপরিচয় বশতঃ যে আবদ্ধমালা বলাকাশ্রেণী নয়নসুভগ মেঘের সেবা করিবে, মেঘের শ্রবণ-সুভগ যে রবে ধরণী শস্যশ্যামল হইয়া ওঠে সেই রব শুনিয়া মানসসরোবর গমনোৎসুক যে রাজহংসগুলি খণ্ড খণ্ড মৃণালের পাথেয় লইয়া কৈলাসপর্বত পর্যন্ত মেঘের সঙ্গী হইবে, চিরসুহৃদের ন্যায় দীর্ঘবিরহান্তে যে চিত্রকূটপর্বত উষ্ণবাষ্প মোচন করিয়া মেঘের প্রতি স্নেহ ব্যক্ত করিবে, পবন গিরিশৃঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে না কি, এই কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া যে সিদ্ধাঙ্গনাগণ মেঘের দিকে ভীত নয়নে তাকাইবে, ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ যে জনপদবধূগণ তাহাদের প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দ্বারা মেঘকে পান করিবে, তাহাদের ভিতরে বিজাতীয়ত্বের স্পষ্ট ভেদরেখা কোথায়? মেঘবর্ষণে প্রশমিতদাবাগ্নি সেই সানুমান আম্রকূট, কর্কশ হস্তীর গাত্রে শোভিত রেখা-বিন্যাসের ন্যায় বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা উপলবিষমা বিশীর্ণা রেবানদী, সেই অর্ধসমুৎপন্ন কেশরসমূহে হরিৎ ও কপিশবর্ণ কদম্বপুষ্পের দর্শনে উৎফুল্ল এবং ভূমিকদলীর প্রথমোৎপন্ন মুকুল ভক্ষণ করিয়া বনভূমির মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছে যে হরিণগুলি, স্বাগতরবকারী শুক্লাপাঙ্গ সজলনয়ন কেকাগুলি, সেই দশার্ণদেশ—যেখানে কেতকীপুষ্পে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে উপবনের বেড়াগুলি—যেখানে গৃহবলিভুক্ পাখিগণের নীড়নির্মাণ-কোলাহলে আকুল হইয়া উঠিয়াছে গ্রামপথের বৃক্ষগুলি—যে দেশে বর্ষাগমে পরিণত-ফল শ্যামজম্বুতে বনান্ত ভরিয়া গিয়াছে—সেই বেত্রবতী নদীর চলোর্মি-সভ্রূভঙ্গ মুখ—সেই নবজলকণায় বননদীতীরে জাত যূথিকা-কলিকা—সেই যূথিকালাবী নারীগণ—কপোলের ঘাম মুছিতে গিয়া যাহাদের কর্ণোৎপল মলিন হইয়া গিয়াছে—আর সেই উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতচকিত লোলাপাঙ্গ নয়নের দৃষ্টি—সকল মিলিয়া যেন একটা অদ্ভুত 'সঙ্গতে'র সৃষ্টি করিয়াছে। এখানেও কবি বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দিকে দেখিয়াছেন যে বিরহ-মিলন-মধুর প্রেমলীলা তাহাই যেন মানুষের সকল সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের একটা

বিরাট পটভূমিকা বা নেপথ্যসঙ্গীতের মত দাঁড়াইয়া আছে; এই নেপথ্য-সঙ্গীতের সহিত মানুষের জীবন-সঙ্গীত মিশিয়া গিয়া একটা অখণ্ড আস্বাদনের সৃষ্টি করিয়াছে।

কালিদাসের এই কবিমানসের পশ্চাতে কবিগুরু বাল্মীকির দানকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারিনা। কালিদাসের কাব্যসাধনা এখানে বাল্মীকির কাব্যসাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়; তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা উচিত, বাল্মীকির সাধন-ফল পরবর্তী কালের জন্য আপনার ভিতরে যে বীজ গড়িয়া তুলিয়াছিল কালিদাস সেই বীজে অনেক নূতন ফুল এবং ফল ধরাইয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের গভীর যোগ আবিষ্কৃত হইলেও কালিদাসের প্রতিভা-বৈশিষ্ট্য সেই কারণেই অম্লান থাকে। বাল্মীকিতে যে কথার আভাস রহিয়াছে—কালিদাস তাঁহার কাব্য-সৃষ্টিতে তাহাকে স্থানে স্থানে আরও নিবিড় করিয়া তুলিয়াছেন।

বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে স্থাবর-জঙ্গম, চেতন-অচেতনের ভিতরে যে মিলন দেখিতে পাই আমরা কালিদাসের কাব্যে, সেই সত্যটিকে পাঠকের নিকটে একটি রসস্বরূপ কাব্যসত্য করিয়া তুলিতে হইয়াছে কবিকে তাঁহার নিপুণ সৃষ্টি-কৌশলের দ্বারা। প্রতিভাবলে কবি এমন একটি স্বতন্ত্র মোহময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, সেখানে একবার প্রবেশ করিলে পাঠক কবির বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু বাল্মীকির সমস্ত কাব্যে ছড়াইয়া আছে এই সত্যটি একটি আদিম বিশ্বাসের রূপে। সে বিশ্বাসকে কবি এমন সহজভাবে আনিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন যে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের আদিম বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ হইয়া সকল সংশয় নিরসন করে।

কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব'কাব্যে আমরা দেখিয়াছি, উমা হিমালয় পর্বতের দুহিতা। রামায়ণের ভিতরও দেখিতে পাই, ধাতুসকলের আকর শৈলেন্দ্র হিমালয়ের স্ত্রী মেরুদুহিতা মেনা: তাহাদের দুইটি কন্যা—জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা উমা। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে হিমালয় দেবতাগণের অনুরোধে ত্রিলোকের হিতের জন্য ত্রিপথগা করিয়া পাঠাইয়াছেন; আর কনিষ্ঠা উমা উগ্রব্রত অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন; সেই তপস্বিনী কন্যাকে হিমালয় রুদ্র মহেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।—

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি॥

যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া॥
তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব॥
অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্॥
দদৌ ধর্মেণ হিমবান্ তনয়াং লোকপাবনীম্॥
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া॥

... ...

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্॥
(বাল—৩৫।১৩-১৭, ১৯-২০)

কবিগুরু এখানে গঙ্গাকে উমার সহোদরা করিয়া হিমালয়ের সহিত উমার দুহিতৃসম্বন্ধকে আরও সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। গঙ্গার শিবের মস্তকে পতন সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে,—

হিমবৎ-প্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে। (বা—৪৩।৮)

ধরণীর বুক হইতে সীতার উৎপত্তিকে কবিগুরু অতি বাস্তব রূপ দিয়াছেন একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়।—

উত্থিতা মেদিনীং ভিত্ত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ॥
(সুন্দর—১৬।১৬)

হলক্ষতমুখে শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া মাটির পৃথিবীর যে কন্যার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার সমস্ত অঙ্গে কীর্ণ রহিয়াছিল ক্ষেত্রের ধূলিকণা; মাটির মেয়ের অঙ্গে সেই ধূলিকণা দেখা দিয়াছিল শিশুঅঙ্গে বিচ্ছুরিত পদ্মরেণুর মত; আর এই ধূলি-ভূষণের ভিতরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল একটা মঙ্গলের দীপ্তি, তাই 'শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ'। বাল্মীকির পূর্বে এবং পরে

ক্ষেত্রের ধূলিকে এমনতর 'পদ্মরেণুনিভ' করিয়া আর কেহ কোথায়ও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; এক দিকে এই পদ্মরেণুনিভ শুভ কেদারপাংশু যেমন সীতার দেহশ্রীকে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে ইহার ভিতর দিয়া মাটির ধরণীর সহিত সীতার যোগও অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। বনে ঋষিপত্নীর নিকট আত্মপরিচয় দিতে গিয়াও সীতা বলিয়াছিল—

তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমণ্ডলম্।
অহং কিলোত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা॥
স মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টিবিক্ষেপতৎপরঃ।
পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিস্মিতো জনকোঽভবৎ।

(অ—১১৮।২৮-২৯)

সীতা যখন প্রথম ক্ষেত্র হইতে আবির্ভূতা হয় তখন সে ছিল পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী —তাহাকে দেখিয়া জাগিয়াছিল লাঙ্গলহস্ত জনকরাজার পরম বিস্ময়।

রামায়ণের আরম্ভে দেখিতেই পাই, পতিবিয়োগে ক্রৌঞ্চী 'রুরাব করুণং গিরম্'; এইখান হইতেই রামায়ণ-কাব্যের অনুপ্রেরণা। ক্রৌঞ্চীর এই করুণ ক্রন্দন যে রামায়ণ-কাব্যের প্রেরণা যোগাইল তাহার কারণ এই, পতিবিরহিত সীতাকেও বাল্মীকি অসহায়া কুররীর মত করুণ-ক্রন্দনরতা দেখিয়াছিলেন। এক কুররীর ক্রন্দন অপর কুররীর ক্রন্দনের জন্য কবিচিত্তকে আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছিল। বাল্মীকি বিগ্না সীতাকে বহু স্থানেই 'কুররীব দীনা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (অরণ্য—৬৩, ১১, কি—১।২৮)।[১] কালিদাসও সীতাকে বিগ্না কুররী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন (রঘু ১৪।৬৮) এবং কালিদাসের বর্ণনায় দেখি, এই বিগ্না কুররীর সঙ্গে ভাগীরথীতীরবর্তী বিজন বনে দেখা হইয়াছিল সেই করুণহৃদয় মহাপ্রাণ কবির

নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ
শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ॥ (রঘু—১৪।৭০)

নিষাদের শরবিদ্ধ বন্যবিহঙ্গকে অবলম্বন করিয়া যাহার শোক এক দিন শ্লোকত্ব লাভ করিয়াছিল।

১। তুঃ— সা চক্রবাকীব ভৃশং চুকুজ—সৌন্দরনন্দ—৬।৩০
বিষাদপারিপ্লবলোচনা ততঃ
প্রণষ্টপোতা কুররীব দুঃখিতা।
বিহায় ধৈর্যং বিরুরাব গৌতমী
ততাম চৈবাশ্রুমুখী জগাদ চ॥
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ৮।৫১

কালিদাসের রঘুবংশে দেখিতে পাই, লক্ষ্মণের মুখে সীতা যখন তাহার নির্বাসনের কথা শুনিয়াছিল তখন ধরণীদুহিতা সীতা একটি বনলতার ন্যায়ই ধরণীমায়ের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।—

ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা
প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম॥ (রঘু,—১৪।৫৫)

হঠাৎ প্রবল বাত্যার আঘাতে লতা যেমন তাহার ফুলগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া পৃথিবীর বুকে লুটাইয়া পড়ে, সীতাও সেইরূপ বিপদ্-ও অপমান-বাত্যায় আহত হইয়া আভরণের কুসুমগুলি ছড়াইয়া দিয়া নিজের জন্মদাত্রী ধরণীর বক্ষেই লুটাইয়া পড়িল।[১] বাল্মীকিও বিপদ্ ও অপমানে আহতা সীতাকে 'গজেন্দ্রহস্তাবহতা বল্লরী' বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন (যুদ্ধ—১১৫।২৪)।[২]

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ যখন সীতাকে নির্বাসিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে তখন—

তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং
রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারা-
চ্চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ॥ (রঘু,—১৪।৬৮)

আর বিগ্না কুররী সীতার আর্তক্রন্দন শুনিয়া মাতা ধরণীর বন-বক্ষও বেদনায় বিমথিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই—

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবম্
অত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি॥ (রঘু—১৪।৬৯)

১। তু:— নির্ভূষণা সা পতিতা চকাশে
বিশীর্ণপুষ্পস্তবকা লতেব॥

২। আরও তুলনীয়—
নষ্টেব সীতাং পরমাভিজাতাং
পথি স্থিতে রাজকুলে প্রজাতাম্।
লতাং প্রফুল্লামিব সাধুজাতাং
দদর্শ তন্বীং মনসাভিজাতাম্॥ (সুন্দর—৫।২৫)

ময়ূর তাহার নৃত্য পরিত্যাগ করিল—বৃক্ষগুলি ফুল ঝরাইয়া দিতে লাগিল, হরিণগুলি কবলিত কুশগুচ্ছ পরিত্যাগ করিল; এইরূপে সমস্ত বনস্থলী সীতার দুঃখে সমদুঃখভাব প্রাপ্ত হইলে সেই বনে অত্যন্ত রোদনধ্বনি জাগিয়াছিল। শকুন্তলা যেদিন আশ্রম-পরিত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছিল সেদিন শকুন্তলাও যেমন আশ্রম-বিরহে ব্যথাতুর হইয়া উঠিয়াছিল, সমগ্র বন-আশ্রমও তেমনি শকুন্তলা-বিরহে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল; প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলিয়াছিল,—

ণ কেবলং তবোবণবিরহকাদরা সহী এব্ব। তুএ উবট্‌ঠিদবিওঅস্‌স তবোবণস্‌স বি অবত্থং পেক্‌খ দাব।—

উগ্‌গলিঅদব্‌ভকবলা মিঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও॥

সখীই যে কেবল তপোবন-বিরহকাতরা তাহা নহে, তোমার বিয়োগকাল উপস্থিত বলিয়া তপোবনের অবস্থাও দেখ;—মৃগী তাহার কবলিত কুশগুচ্ছ মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়াছে, ময়ূরী তাহার নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, পাণ্ডুপত্র ঝরাইয়া দিয়া লতা যেন অশ্রু মোচন করিতেছে।

মানুষের সহিত আরণ্য প্রকৃতির এই সমবেদনা যেমন কালিদাসের কাব্যের সর্বত্র লক্ষিত হয়, বাল্মীকির রামায়ণের সর্বত্রও আমরা এই সমবেদনা লক্ষ্য করিতে পারি। রাম কর্তৃক নির্বাসিতা সীতার বর্ণনায় বাল্মীকি বলিয়াছেন—

দূরস্থং রথমালোক্য লক্ষ্মণং চ মুহুর্মুহুঃ।
নিরীক্ষমাণং তূদ্বিগ্নাং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ॥

তখন—
সা দুঃখভারাবনতা যশস্বিনী
যশোধরা নাথমপশ্যতী সতী।
রুরোদ সা বর্হিণনাদিতে বনে
মহাস্বনং দুঃখপরায়ণা সতী॥ (উত্তর—৫৮।২৫-২৬)

এখানেও দেখিতে পাই, দুঃখভারাবনতা সতী যখন একান্ত অসহায়ভাবে বনে মহাস্বন তুলিয়া রোদন করিয়াছিল, তখন বনস্থলীও বর্হিনাদের দ্বারা সীতার সহিত সমভাবে রোদন করিয়াছিল।

শুধু এইখানেই নহে, রামায়ণের বহু স্থানে রাম ও সীতার সহিত আরণ্য প্রকৃতির যোগ অতি অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই,

রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণ ও সীতাসহ অযোধ্যাপুরী ত্যাগ করিয়া বনে রওনা হইল, তখন সমস্ত প্রজাবর্গ তাহাদের অনুসরণ করিয়া সাশ্রুনয়নে তাহাদিগকে বনে গমনে বাধা দিতে লাগিল। তাহাদের ভিতরে—

তে দ্বিজাস্ত্রিবিধং বৃদ্ধা জ্ঞানেন বয়সৌজসা।
বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদূচুরিদং বচঃ॥
বহন্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমাঃ।
নিবর্তধ্বং ন গন্তব্যং হিতা ভবত ভর্তরি॥ (অযো—৪৫।১৩-১৪)

জ্ঞান, বয়স এবং তপোবল এই ত্রিবিধভাবে বৃদ্ধ দ্বিজগণ—বয়সের জন্য যাঁহাদের শির কম্পিত হইতেছে—তাঁহারা দূর হইতে রথের অশ্বগুলিকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন—'তোমরা বনগমনে নিবৃত্ত হও—বনে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই—তোমরা তোমাদের প্রভুর হিত কর।' রামচন্দ্র এইরূপ দ্বিজবৃদ্ধগণকে প্রলাপ করিতে দেখিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক পায়ে হাঁটিয়াই বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে দ্বিজবৃদ্ধগণ তখনও ডাকিয়া বলিতেছেন—

যাচিতো নো নিবর্তস্ব হংসশুক্লশিরোরুহৈঃ।
শিরোভির্নিভৃতাচার মহীপতনপাংশুলৈঃ॥ (অযো—৪৬।২৭)

'হে নিশ্চলধর্মাচারী রাম, আমরা আমাদের হংসশুক্লকেশপূর্ণ মস্তককে ভূমিপতন দ্বারা ধূলিপূর্ণ করিয়া তোমার নিবর্তন যাচ্ঞা করিয়াছি,—তুমি ফেরো।

দ্বিজবৃদ্ধগণ কাতর স্বরে আরও বলিতে লাগিলেন,—'শুধু আমরাই যে তোমাকে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছি তাহা নহে ; ঐ দেখ—

অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধতবেগিনঃ।
উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ॥
নিশ্চেষ্টাহারসঞ্চারা বৃক্ষৈকস্থাননিশ্চিতাঃ।
পক্ষিণোঽপি প্রযাচন্তে সর্বভূতানুকম্পনম্॥ (ঐ ৪৫।৩০-৩১)

'ঐ দেখ মূলের দ্বারা উদ্ধতবেগ উন্নত পাদপগুলি তোমার অনুগমনে অশক্ত হইয়া বায়ুবেগে তাহাদের বিক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। পক্ষীগুলি আহারান্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া গতিরহিতভাবে বৃক্ষের এক স্থানে নিশ্চল হইয়া তোমার

নিকট সর্বভূতের প্রতি অনুকম্পা প্রার্থনা করিতেছেন।' দ্বিজগণ যখন রামের নিবর্তনের জন্য এইরূপে আর্তস্বরে চিৎকার করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তমসা নদীও তাহার জলপ্রবাহ দ্বারা রামচন্দ্রকে বনগমনে বারণ করিয়া পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।—

এবং বিক্রোশতাং তেষাং দ্বিজাতীনাং নিবর্তনে।
দদৃশে তমসা তত্র বারয়ন্তীব রাঘবম্॥ (ঐ ৪৫।৩২)

রাম বনে চলিয়া গেলে বিষণ্ণ অযোধ্যাবাসী এই বলিয়া মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল—

শোভয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ।
আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্বতাঃ॥
কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোঽনুগমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যন্ত্যনর্চিতুম্॥
বিচিত্রকুসুমাপীড়া বহুমঞ্জরিধারিণঃ।
রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ॥
অকালে চাপি মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্‌গিরয়ো রামমাগতম্॥
প্রস্রবিষ্যন্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ।
বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভূয়শ্চিত্রাংশ্চ নির্ঝরান্॥
পাদপাঃ পর্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্।
(ঐ—৪৮।১০-১৬)

'রম্যকাননে অটবী সমূহ, গভীর স্রোতস্বিনী এবং সানুমন্ত পর্বত রামচন্দ্রের শোভাসম্পাদন করিবে। কানন বা শৈল যেখানেই রাম গমন করিবে সেইখানেই প্রিয় অতিথিকে পাইলে যেরূপ অর্চনা না করিয়া পারা যায় না, সেইরূপ তাহারা রামকে অর্চনা না করিয়া পারিবে না। বহুমঞ্জরীধারী ভ্রমরশালী বৃক্ষগুলি রামচন্দ্রকে বিচিত্র কুসুমের শিরোভূষণ দেখাইবে। পর্বতগুলি সহানুভূতির আতিশয্যে অতিথি রামকে অকালেই মুখ্য মুখ্য ফুল এবং ফল দেখাইবে, বহু-বিচিত্র বিবিধ নির্ঝরগুলি দেখাইতে দেখাইতে পর্বতগুলি বিমল সলিল প্রস্রবণ করিতে থাকিবে; পর্বতের অগ্রস্থিত বৃক্ষগুলি রামকে আনন্দ দিতে থাকিবে।'

প্রকৃতপক্ষেই আমরা দেখিতে পাই, পার্বত্য বনদেশে বাস করিয়া রাম-সীতা কখনই নির্বাসন-ক্লেশ ভোগ করে নাই,—বনে তাহারা সর্বপ্রকার রাজ্যসুখই ভোগ করিতেছিল। চিত্রকূট পর্বতে আসিয়া রামচন্দ্র সীতাকে যেখানে চিত্রকূটের শোভা দেখাইতেছিল সেখানে রামের পার্শ্বে সীতা যেন নন্দনবনে ক্রীড়ারত ইন্দ্রের পার্শ্বে শচী।

ভার্যামমরসঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ॥ (অযো—৯৪।২)

এই চিত্রকূটের চারিদিকে চাহিয়া রাম সীতাকে বলিয়াছিল—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্॥
* * *
যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্ধমনিন্দিতে।
লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধক্ষ্যতি॥ (ঐ ৯৪।৩,১৫)

'ভদ্রে সীতা, রাজ্য হইতে যে ভ্রষ্ট হইযাছি, বা সুহৃদ্‌গণের সহিত যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ইহার কিছুই আজ আর এই রমণীয় চিত্রকূট পর্বত দর্শনে আমার মনকে ক্লিষ্ট করিতেছে না। হে অনিন্দিতে, এখানে তোমার এবং লক্ষ্মণের সহিত যদি অনেক বৎসরও বাস করি তাহাতেও শোক আমাকে দগ্ধ করিবে না।' এই চিত্রকূট পর্বতের অদূরে স্বচ্ছসলিলে প্রবহমানা মন্দাকিনী নদীকে দেখিয়াও রাম বলিযাছিল,—

দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে।
অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ॥
* * *
সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্।
কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি॥
ত্বং পৌরজনবৎ ব্যালানযোধ্যামিব পর্বতম্।
মন্যস্ব বনিতে নিত্যং সরযূবদিমাং নদীম্॥
(অযো—৯৫।১২, ১৪—১৫)

'চিত্রকূট পর্বত এবং মন্দাকিনীর দর্শন এবং তাহার সহিত তোমার দর্শনের দ্বারা এখানে আমি পুরীতে বাস অপেক্ষা অধিক মনে করিতেছি।...হে

সীতা, সখী যেমন সখীর ভিতরে আত্মনিমজ্জন করে তুমি তেমন করিয়া এই মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন কর ; এই নদী রক্তকমল এবং শ্বেতকমলগুলিকে বিক্ষোভের দ্বারা নিমজ্জিত করিতেছে। এই পার্বত্যদেশের সকল জীবজন্তুকে তুমি পৌরজনগণের ন্যায় মনে করিও, এই পর্বতকে অযোধ্যা বলিয়া মনে করিও, আর এই নদীকেই সরযূ নদী বলিয়া মনে করিও।'

রাবণ যে দিন ছদ্ম পরিব্রাজকবেশে সীতাহরণ মানসে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়াছিল সে দিন ক্রূরকর্মা রাবণকে দেখিয়া সমস্ত বনই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বনের বৃক্ষগুলি ভয়ে আর শাখাবাহু কম্পিত করিল না, সমীরণ প্রবাহিত হইল না ;—সেই রক্তলোচন রাক্ষসকে দেখিয়া শীঘ্রস্রোতা গোদাবরী নদীও ভয়ে স্তিমিতভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল।—

তমুগ্রং পাপকর্মাণং জনস্থানগতা দ্রুমাঃ।
সন্দৃশ্য ন প্রকম্পন্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ॥
শীঘ্রস্রোতাশ্চ তং দৃষ্ট্বা বীক্ষন্তং রক্তলোচনম্॥
স্তিমিতং গন্তুমারেভে ভয়াদ্‌গোদাববী নদী॥ (আর ৪৬।৭-৮)

রাম স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে—লক্ষ্মণ তাহারই অনুগমন করিয়াছে ; সুতরাং সীতাকে একাকিনী অসহায়া দেখিয়া সমস্ত বন ভয়-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ কর্তৃক যখন হৃতা হয় তখন সীতাও এই অরণ্যপ্রকৃতিকেই তাহার একমাত্র সহায় বলিয়া জানিয়াছিল, তাই সে করজোড়ে বনের প্রতিটি বৃক্ষলতা, গোদাবরী নদী, সকল বনদেবতা, পশুপক্ষীর নিকট তাহার করুণ নিবেদন জানাইতে জানাইতে যাইতেছিল।—

আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
হংসসারসসংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
দৈবতানি চ যান্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্॥
যানি কানিচিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
সর্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ॥
ভ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি সংশত॥ (আরণ্য—৪৯।৩০-৩৪)

'হে জনস্থান, হে পুষ্পিত কর্ণিকার সমূহ, তোমাদের সকলকে ডাকিয়া জানাইতেছি, তোমরা ক্ষিপ্রগতি রামকে সংবাদ দাও যে সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হংস-সারস-সমাকুল গোদাবরী নদীকে বন্দনা করিতেছি, শীঘ্র তুমি রামকে সংবাদ দাও, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ এই বনস্থলীতে যত বনদেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করিতেছি, অপহৃতা আমার কথা তাঁহারা যেন আমার ভর্তাকে জানান। এখানে বিবিধ যত জীবজন্তু রহিয়াছে সেই মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই আমি শরণ লইতেছি; তাহারা সকলেই যেন আমার ভর্তার নিকট তাঁহার প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী হ্রিয়মাণা প্রিয়ার সংবাদ জানায়, আরও যেন জানায় যে, রাবণ বিবশা সীতাকেই হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

আরণ্য প্রকৃতি সীতার এই আর্ত-আবেদনে যে সাড়া দিয়াছিল না, তাহা নহে। যখন সীতার অগ্নিবর্ণ আভরণগুলি গগনচ্যুত ক্ষীণ-তারকার মতন ভূতলে সশব্দে ছড়াইয়া পড়িতেছিল,—যখন সীতার স্তনভ্রষ্ট হার গঙ্গার ধারার ন্যায় আকাশ হইতে বহিয়া পড়িতেছিল, তখন—

উৎপাতবাতাভিহতা নানাদ্বিজগণাযুতাঃ।
মাভৈরিতি বিধুতাগ্রা ব্যাজহ্রুরিব পাদপাঃ।
নলিন্যো ধ্বস্তকমলাস্ত্রস্তমীনজলেচরাঃ।
সখীমিব গতোৎসাহাং শোচন্তীব স্ম মৈথিলীম্॥
সমন্তাদভিসম্পত্য সিংহব্যাঘ্রমৃগদ্বিজাঃ।
অন্বধাবংস্তদা রোষাৎ সীতাচ্ছায়ানুগামিনঃ॥
জলপ্রপাতাস্রমুখাঃ শৃঙ্গৈরুচ্ছ্রিতবাহুভিঃ।
সীতায়াং হ্রিয়মাণায়াং বিক্রোশন্তীব পর্বতাঃ॥
হ্রিয়মাণাস্তু বৈদেহীং দৃষ্ট্বা দীনো দিবাকরঃ।
প্রবিধ্বস্তপ্রভঃ শ্রীমানাসীৎ পাণ্ডুরমণ্ডলঃ॥
নাস্তি ধর্মঃ কুতঃ সত্যং নার্জবং নানৃশংসতা।
যত্র রামস্য বৈদেহীং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
ইতি ভূতানি সর্বাণি গণশঃ পর্যদেবয়ন্।
বিত্রস্তকা দীনমুখা রুরুদুর্মৃগপোতকাঃ॥ (ঐ-৫২।৩৪-৪০)

নানাপক্ষিসমাকুল আরণ্য বৃক্ষগুলি উর্ধ্বগামী বাতাসের দ্বারা অভিহিত হইয়া অগ্রভাগ বিকম্পিত করিয়া যেন বলিতেছিল—সীতা, আমরা এখানে

রহিয়াছি, তোমার কোন ভয় নাই; ধ্বস্তকমল সরোবরের মীন প্রভৃতি জলচরগুলি ত্রস্ত হইয়া উঠিল,—সরোবরগুলি যেন গতোৎসাহা সখী সীতার জন্যই শোক করিতেছিল। সিংহব্যাঘ্র মৃগ প্রভৃতি পশুগুলি এবং বনের পাখীগুলি চারিদিক্‌ হইতে রাবণকে অভিসম্পাত করিতে করিতে রোষে সীতার ছায়া অনুসরণ করিয়া পিছনে পিছনে ধাবিত হইতে লাগিল; জলপ্রপাতে অশ্রুমুখ হইয়া শৃঙ্গবাহুগুলি ঊর্ধ্বে তুলিয়া পর্বতগুলি সীতা অপহৃত হইতেছে দেখিয়া আক্রোশে আস্ফালন করিতেছিল; ধ্বস্তপ্রভ সূর্য পাণ্ডুরমণ্ডলে দীন হইয়া রহিল; যেখানে রামের সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যায় সেখানে ধর্ম বলিয়া কিছু নাই,—কোথায় সত্য? চরিত্রের ঋজুতা বা অনৃশংসতা বলিয়াও কোন জিনিষ নাই,—এই কথা বলিয়া বনের সকল প্রাণীকে ব্যথিত করিয়া বিত্রস্ত বালমৃগগুলি দীনমুখে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র যখন মারীচ বধ করিয়া লক্ষ্মণসহ তাহাদের পর্ণশালায় ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল—

দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতাং তদা।
শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব।
রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ ম্লানপুষ্পমৃগদ্বিজম্‌।
শ্রিয়া বিহীনং বিধ্বস্তং সন্ত্যক্তং বনদৈবতৈঃ॥

(আরণ্য—৬০।৫-৬)

সীতা-বিরহিতা পর্ণশালা হেমন্তের শ্রীহীন ধ্বস্ত সরোবরের মত পড়িয়া আছে; চারিদিকে বৃক্ষগুলি রোদন করিতেছে, বনের পুষ্প, পশু, পাখী সকলেই ম্লান হইয়াছে; সকলেই যেন শ্রীহীন—বিধ্বস্ত,—বনদেবতাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত। রামচন্দ্র শোকে উন্মত্ত হইয়া পর্বত হইতে পর্বতে—বন হইতে বনে—নদী হইতে নদীতে ধাবিত হইয়া সীতার উদ্দেশ করিতে লাগিল। পাশের কদম্ববৃক্ষকে ডাকিয়া রাম-সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিল—কদম্ব যদি কদম্বপ্রিয়া শুভাননা সীতাকে দেখিয়া থাকে; বিল্বকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে স্নিগ্ধ-পল্লবসঙ্কাশা পীতকৌষেয়বাসিনী বিল্বোপমস্তনী সীতাকে দেখিয়াছে কি না; অর্জুনবৃক্ষকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অর্জুনপ্রিয়া তন্বী সীতা বাঁচিয়া আছে কি না; এইরূপে কুরুবক, বকুল, অশোক, তাল, জম্বু

প্রভৃতি সকল বৃক্ষের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়াই রাম সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কর্ণিকারকে ডাকিয়াও খোঁজ লইল—যদি সে কর্ণিকারপ্রিয়া সীতাকে দেখিয়া থাকে।

অস্তি কচ্চিৎ ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্ববনপ্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্॥
স্নিগ্ধপল্লবসঙ্কাশাং পীতকৌষেয়বাসিনীম্।
শংসস্ব যদি সা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী॥
অথবার্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জুনপ্রিয়াম্।
জনকস্য সুতা তন্বী যদি জীবতি বা ন বা॥
ককুভঃ ককুভোরুং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্।
লতাপল্লবপুষ্পাঢ্যো ভাতি হ্যেষ বনস্পতিঃ॥
ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা দ্রুমবরো হ্যসি।
এষ ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলকপ্রিয়াম্॥
অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম্।
ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্॥
যদি তাল ত্বয়া দৃষ্টা পক্বতালোপমস্তনী।
কথয়স্ব বরারোহাং কারুণ্যং যদি তে ময়ি॥
যদি দৃষ্টা ত্বয়া জম্বে জাম্বুনদসমপ্রভা।
প্রিয়াং যদি বিজানাসি নিঃশঙ্কং কথয়স্ব মে॥
অহো ত্বং কর্ণিকারাদ্য পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম্।
কর্ণিকারপ্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া॥

(আরণ্য—৬০।১২-২০)

বৃক্ষলতাগুল্মের নিকট পৃথক্-পৃথক্‌ভাবে সন্ধান লইবার পর রামচন্দ্র বনের পশুগণের নিকটেও একে একে সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। হরিণকে রাম জিজ্ঞাসা করিল, যদি হরিণনয়নী সীতাকে সে হরিণীর সহিত দেখিয়া থাকে; বনের করীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যদি সে করিণীর সহিত সীতাকে দেখিয়া থাকে; বনের শার্দুলও এ সময়ে রামচন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধুর স্থান অধিকার করিয়াছিল।

অথবা মৃগশাবাক্ষীং মৃগ জানাসি মৈথিলীম্।
মৃগবিপ্রেক্ষণী কান্তা মৃগীভিঃ সহিতা ভবেৎ॥

গজ সা গজনাসোরুর্যদি দৃষ্টা ত্বয়া ভবেৎ।
তাং মন্যে বিদিতাং তুভ্যমাখ্যাহি বরবারণ ॥
শার্দুল যদি সা দৃষ্টা প্রিয়া চন্দ্রনিভাননা।
মৈথিলী মম বিস্রব্ধঃ কথয়স্ব ন তে ভয়ম্ ॥
(ঐ ৬০।২৩-২৫)

শুধু বনের তরুলতা পশুপক্ষীর নিকটেই নহে, আকাশের সূর্য, সর্বলোকভ্রমণকারী বায়ুর নিকটেও রামচন্দ্র সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

আদিত্য ভো লোককৃতাকৃতজ্ঞ
লোকস্য সত্যানৃতকর্মসাক্ষিন্।
মম প্রিয়া সা ক গতা হৃতা বা
শংসস্ব মে শোকহতস্য সর্বম্ ॥
লোকেষু সর্বেষু ন বাস্তি কিঞ্চিৎ
যৎ তেন নিত্যং বিদিতং ভবেৎ তৎ।
শংসস্ব বায়ো কুলপালিনীং তাং
মৃতা হৃতা বা পথি বর্ততে বা ॥ (ঐ ৬৩।১৬-১৭)

'হে আদিত্য, তুমি বিশ্বলোকে যাহা কিছু কৃত এবং যাহা কিছু অকৃত সকলই অবগত আছ; বিশ্বলোকের সকল সত্যকর্ম এবং অসত্যকর্মের তুমিই সাক্ষী; আমার সেই প্রিয়া কোথায় গিয়াছে—অথবা হৃত হইয়াছে, শোকাহত আমাকে সকল খুলিয়া বল। হে বায়ু, সর্বলোকে এমন কিছু নাই যাহা তোমা কর্তৃক নিত্য জ্ঞাত হইতেছে না; তুমি সেই কুলপালিনীর সন্ধান আমাকে বল,—সে মরিয়াছে—অথবা হৃত হইয়াছে—অথবা পথে অবস্থান করিতেছে।'

মূক প্রকৃতি রামচন্দ্রের এই আর্তিতে গভীর সমবেদনার সহিত সাড়া দিয়াছিল। রাম-লক্ষ্মণ যখন কোথায়ও সীতার কোন সন্ধান না পাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতেছিল তখন হঠাৎ বনের মৃগগুলির দিকে চোখ পড়াতে রাম লক্ষ্মণকে বলিল;—

এতে মহামৃগা বীর মামীক্ষন্তে পুনঃ পুনঃ ॥
বক্তুকামা ইব হি মে ইঙ্গিতান্যুপলক্ষয়ে। (ঐ-৬৪।১৫-১৬)

'হে বীর, এই মহামৃগগুলি আমাকে বার বার চাহিয়া দেখিতেছে, ইহাদের ইঙ্গিতে আমার মনে হইতেছে, ইহারা আমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছে।' তখন—

তাংস্তু দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রো রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
ক্ব সীতেতি নিরীক্ষন্ বৈ বাষ্পসংরুদ্ধয়া গিরা॥ (ঐ ১৬-১৭)

'তাহাদিগকে দেখিয়া নরব্যাঘ্র রাম তাহাদের ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তর দিল; তাহাদের দিকে তাকাইয়া বাষ্পসংরুদ্ধ বাক্যে সে জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় সীতা?' রামের সেই প্রশ্নের উত্তর মৃগগণ বাক্যে দিল না বটে কিন্তু—

এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ তে মৃগাঃ সহসোত্থিতাঃ॥
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে দর্শয়ন্তো নভঃস্থলম্।
মৈথিলী হ্রিয়মাণা সা দিশং যামভ্যপদ্যত॥ (ঐ ১৭-১৮)

'নরেন্দ্র রাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মৃগগণ সহসা উঠিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া আকাশের দিকে দেখাইতে লাগিল,—যে দিকে হ্রিয়মাণা সেই সীতা গমন করিয়াছিল।' রাম সক্রোশে যখন পর্বতের নিকট সীতার বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তখন সেই পর্বতও তাহার উন্নত শির তুলিয়া দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া যেন সীতাকেই দেখিতে লাগিল; এইরূপে পর্বত আভাসে-ইঙ্গিতে চক্ষু-ইসারায় সীতার সন্ধান বলিল, সাক্ষাতে সীতাকে দেখাইতে পারিল না।

দর্শয়ন্নিব তাং সীতাং নাদর্শয়ত রাঘবে।[১] (ঐ ৩২)

---

(১) মহাভারতের নলোপাখ্যানের ভিতরে দেখি নল-পরিত্যক্তা একাকিনী বিরহিণী দময়ন্তীও এইরূপ বন্য পশু, নদী, পর্বত সকলের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া নলের অন্বেষণ করিয়াছে।—

অরণ্যরাড়য়ং শ্রীমাংশ্চতুর্দংষ্ট্রো মহাহনুঃ।
শার্দুলোহভিমুখঃ প্রৈতি পৃচ্ছাম্যেনমশঙ্কিতা॥
ভবান্ মৃগাণামধিপ ত্বমস্মিন্ কাননে প্রভুঃ।
বিদর্ভরাজতনয়াং দময়ন্তীতি বিদ্ধি মাম্॥
... ...
আশ্বাসয় মৃগেন্দ্রেহ যদি দৃষ্টস্ত্বয়া নলঃ।
সিংহস্কন্ধো মহাবাহুঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ॥

কবিগুরু বাল্মীকির এই সকল বর্ণনা মনে রাখিয়াই বোধ হয় কালিদাস "রঘুবংশে' রামের মুখে বলাইয়াছেন,—

ত্বং রক্ষসা ভীরু যতোঽপনীতা
তং মার্গমেতাঃ কৃপয়া লতা মে।
অদর্শয়ন্ বক্তুমশক্নুবত্যঃ
শাখাভিরাবর্জিতপল্লবাভিঃ ॥
মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুরনির্ব্যপেক্ষা-
স্তবাগতিজ্ঞং সমবোধয়ন্মাম্।
ব্যাপারয়ন্ত্যো দিশি দক্ষিণস্যা-
মুৎপক্ষ্মরাজীনি বিলোচনানি। (১৩।২৪-২৫)

'হে ভীরু, তোমাকে রাক্ষস যে পথ দিয়া হরণ করিয়াছে সেই পথের কথা বলিতে অশক্ত হইলেও এই লতাগুলি কৃপা করিয়া আনম্রপল্লব শাখাদ্বারা (ইঙ্গিতে) আমাকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। মৃগগণও কুশাঙ্কুরের প্রতি স্পৃহাহীন হইয়া পক্ষ্মপংক্তি উন্মোচন পূর্বক নয়নের দ্বারা বার বার দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া তোমার গমনপথের সংবাদে অজ্ঞ আমাকে সম্বোধিত করিতেছিল।'

গিরিরাজমিমং তাবৎ পৃচ্ছামি নৃপতিং পতিম্ ॥
ভগবন্নচলশ্রেষ্ঠ দিব্যদর্শন বিশ্রুত।
শরণ্য বহুকল্যাণ নমস্তেঽস্তু মহীধর ॥
প্রণমে ত্বাঽভিগম্যাহং রাজপুত্রীং নিবোধ মাম্।
রাজস্নুষাং রাজভার্যাং দময়ন্তীতি বিশ্রুতাম্ ॥
... ...
সমুল্লিখদ্ভিরেতৈর্হি ত্বয়া শৃঙ্গশতৈর্নৃপঃ।
কচ্চিদ্দৃষ্টোঽচলশ্রেষ্ঠ বনেঽস্মিন্ দারুণে নলঃ ॥
... ...
কিং মাং বিলপতীমেকাং পর্বতশ্রেষ্ঠ দুঃখিতাম্।
গিরা নাশ্বাসয়স্যদ্য স্বাং সুতামিব মানদ ॥
।। আরণ্য পর্ব, ৬২ ।। (পি, পি, এস্, শাস্ত্রীর সংস্করণ)

ভবভূতির 'মালতী-মাধব' নাটকেও (৯ম অঙ্ক) দেখিতে পাই, নায়ক মাধব বিরহোন্মত্ত হইয়া সকল পার্বত্য এবং বন্য প্রাণিগণকে সম্বোধন করিতেছে; কিন্তু সে দৃশ্য বাল্মীকির এই সব দৃশ্যের ন্যায় চিত্তাকর্ষক নহে।

কালিদাসের শকুন্তলা-নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দেখিতে পাই, প্রিয়ংবদা যখন দুঃখ করিতেছিল যে, শকুন্তলার আভরণীয় রূপকে অলঙ্কৃত করা যাইতেছিল না তখন সহসা ঋষিকুমারদ্বয় প্রবেশ করিয়া শকুন্তলাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য নানাপ্রকার আভরণ দান করিল। আর্যা গৌতমী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা কি তাত কাশ্যপের মানসী সিদ্ধি? দ্বিতীয় ঋষিপুত্র উত্তর করিল,—'তাহা নয়; তাত কাশ্যপ আমাদিগকে শকুন্তলার জন্য বনস্পতিগুলি হইতে কুসুম আহরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন; তারপরে—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতম্
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
র্দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥

'কোন তরু ইন্দুপাণ্ডু মাঙ্গল্য ক্ষৌমবসন বাহির করিয়া দিল, কোন তরু চরণোপরাগসুভগ লাক্ষারস ক্ষরিত করিল, অন্যান্য তরুগণ আপর্বভাগোত্থিত বনদেবতা-করতলের দ্বারা কিশলয়োদ্ভেদের প্রতিযোগিতায় নানা প্রকারের অন্যান্য আভরণ দান করিয়াছে।'

বাল্মীকির রামায়ণেও দেখিতে পাই, ভরত যখন রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গিয়াছিল তখন ভরদ্বাজমুনি ভরতকে আতিথ্য দান করিয়াছিলেন। এইরূপ মান্য অতিথির সৎকারের জন্য ভরদ্বাজ মুনি সকল নদী এবং বনের নিকটেই আহার্য, পেয় এবং ভূষণ যাচঞা করিয়াছিল।

প্রাক্‌স্রোতসশ্চ যা নদ্যস্তির্যক্‌স্রোতস এব চ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ সমায়ান্ত্বদ্য সর্বশঃ॥
অন্যাঃ স্রবন্তু মৈরেয়ং সুরামন্যাঃ সুনিষ্ঠিতাম্।
অপরাশ্চোদকং শীতমিক্ষুকাণ্ডরসোপমম্॥
... ...
বনং কুরুষু যদ্দিব্যং বাসোভূষণপত্রবৎ।
দিব্যনারীফলং শশ্বৎ তৎ কৌবেরমিহৈব তু।
... ...
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপপ্রচ্যুতানি চ।

(অযো—৯১।১৪-১৫, ১৯, ২১)

আরণ্য প্রকৃতির সহিত বাল্মীকি ও কালিদাস এই উভয় কবির নিবিড় যোগের একটা কারণ এই মনে হয়, বাল্মীকি ও কালিদাসের যুগে আমাদের গার্হস্থ্য আশ্রমই একমাত্র আশ্রম ছিল না, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বান-প্রস্থ এবং যতি-আশ্রম তখন জীবনের অধিক অংশ অধিকার করিয়াছিল; এই আশ্রম ত্রয়ের ভিতর দিয়া—বিশেষ করিয়া বান-প্রস্থ এবং যতি-আশ্রমের ভিতর দিয়া আরণ্য-প্রকৃতির সহিত সে যুগের লোকের একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা আরণ্য তপোবনের সভ্যতা। অরণ্যগুলির ভিতরেই আমাদের প্রথম জাগিয়াছিল 'একে'র বাণী। নগরবাসী নৃপতিগণও পঞ্চাশোর্ধ্বে আরণ্য জীবন যাপন করিতেন; তাই পার্বত্য অরণ্যও সেদিন মানুষের নিকটে জনপদের ন্যায় মর্যাদা এবং প্রীতি-সম্বন্ধ লাভ করিযাছিল।

তা ছাড়া বাল্মীকি-রামায়ণের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত সকল বর্ণনা পাঠ করিলে একটা জিনিস স্বতঃই মনে হইবে, ইহা নিছক কবি-জনোচিত আলঙ্কারিক বর্ণনা নহে; ইহার পশ্চাতে কবি-চিত্তের একটা দৃঢবদ্ধ বিশ্বাস রহিয়াছে। কালিদাসের ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণনা স্থানে স্থানে আলঙ্কারিক বর্ণনা বলিযা মনে হইলেও বাল্মীকি-রামায়ণেব সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাব সঙ্গে মিলাইয়া এই বর্ণনাগুলি পডিলে মনে হইবে, সমগ্র কাব্যে যে-যুগের জীবনকে প্রতিফলিত করা হইয়াছে এই প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলির পশ্চাতেও সেই যুগের একটা আদিম সহজ সরল বিশ্বাস দাঁডাইয়া আছে। সে বিশ্বাসটি এই যে, চারিদিকের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটার কোন অংশই যেন একেবারে জড অচেতন নহে, সকলের ভিতরে একটা সূক্ষ্ম অলৌকিক প্রাণস্পন্দন এবং চেতনা রহিয়াছে। ঊর্ধ্বের আকাশ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারকা—অন্তরীক্ষের বায়ু—নিম্নে পৃথিবীর বুকে বৎসর-মাস-দিবসের সুনিয়ত আবর্তন—ষড্ঋতুর আসা-যাওয়া—সকল পর্বত-অরণ্য, নদ-নদী, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী—ইহাদের সকলের ভিতরে যে চেতনা-সত্তা রহিয়াছে, মানুষের সহিত তাহার মঙ্গলময় গভীর আত্মীয়তা আছে। এই সরল বিশ্বাসটি স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে বনে গমনোদ্যত রাম সম্বন্ধে জননী কৌশল্যার প্রার্থনা-বাণীতে। কৌশল্যা একদিকে যেমন বলিতেছেন,—

যং পালযসি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥
যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেষ্বায়তনেষু চ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ॥

যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সমুদিতং সদা॥
পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ॥ (অযো—২৫।৩-৬)

প্রীতি দ্বারা এবং নিয়মের দ্বারা তুমি যে ধর্মকে পালন করিতেছ, হে রাঘব-শার্দুল, সেই ধর্মই তোমাকে বনে রক্ষা করুক। দেবায়তনে যাঁহাদিগকে প্রণাম কর, হে পুত্র, তাঁহারা মহর্ষিগণের সহিত বনে তোমাকে রক্ষা করুন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র তোমাকে যে-সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, গুণসমুদিত তোমাকে তাহারা রক্ষা করুক। পিতৃশুশ্রূষা, মাতৃশুশ্রূষা এবং সত্যের দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া, হে মহাবাহো, তুমি চিরজীবী হইয়া থাক!' কৌশল্যার এই সকল প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাই,—

সমিৎকুশপবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাঃ ক্ষুপা হ্রদাঃ॥
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম।
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ॥

... ...

ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্তু তে সদা॥

... ...

স্মৃতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ।
শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ॥
দ্যৌরন্তরিক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ॥

(ঐ ৭-৮, ১০, ১৩-১৪)

'সমিৎকুশ-পবিত্র আয়তনগুলি, যজ্ঞের বেদী এবং বিপ্রগণের স্থণ্ডিলভূমি,—শৈল, বনস্পতি, হ্রস্বশাখাযুক্ত তরুগুলি, হ্রদ—সকলে তোমাকে রক্ষা করুক; পতঙ্গ, সর্প, সিংহ প্রভৃতি, হে নরোত্তম, তোমাকে রক্ষা করুক। সাধ্যগণ ও মরুদ্‌গণ বনের মহর্ষিগণের সহিত তোমার স্বস্তিবিধান করুন। ছয় ঋতু, সকল মাস, সংবৎসর, রজনী, দিন—এমন কি প্রতিটি মুহূর্তও তোমার স্বস্তি-বিধান করুক। পর্বতসমূহ, সকল সমুদ্র—সমুদ্রাধিপতি বরুণ, দ্যৌ, অন্তরিক্ষ,

পৃথিবী, বায়ু, সমস্ত চরাচর, সকল নক্ষত্র এবং গ্রহগুলি সকল দৈবশক্তির সহিত আমাকর্তৃক স্তুত হইয়া বনে সর্বদার জন্য তোমাকে রক্ষা করুক।[১]

॥ ৫ ॥

বাল্মীকি-কালিদাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টির ভিতর দিয়া আমরা ভারতীয় মনের একটি বিশেষ পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি। ভারতীয় মনের সাধারণ বিশ্বাসে বহিঃপ্রকৃতি কোনদিনই সম্পূর্ণ জড় বলিয়া গৃহীত হয় নাই। আমরা হয় জড় প্রকৃতির পশ্চাতে চৈতন্যের খেলা আবিষ্কার করিয়াছি, নতুবা প্রত্যেকটি জড়মূর্তির পশ্চাতেই অভিমানী দেবতার পরিকল্পনা করিয়াছি। গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে, ইহাকে ভারতীয় অদ্বয়বাদেরই একটা বিশেষ প্রকাশ বলিযা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অদ্বয়বাদ ভারতবর্ষে শুধু দার্শনিক রূপেই আত্মপ্রকাশ করে নাই, কবি-অনুভূতির ভিতরেও ইহার একটা গভীর প্রকাশ রহিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের ভিতরেও তাই এই অদ্বয়বাদের একটা ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের সূত্রপাত বৈদিক সাহিত্যে—প্রথম বিবর্তন 'আরণ্যক' এবং উপনিষদে,— তারপরে তাহার রূপান্তর পাই রামায়ণ-মহাভারতে, কালিদাস প্রমুখ মধ্যযুগের কবিগণের কাব্যের ভিতরে এই অদ্বযবাদ দেখা দিয়াছে আলঙ্কারিক কারুকার্যের শ্রীমণ্ডিতরূপে—সেই ধারাই চলিযা আসিয়াছে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। ঋষিকবি বাল্মীকির যে প্রকৃতি-বর্ণনা আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিলাম তাহার পটভূমিতে এই অদ্বয়বাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলে তাহার

(১) মহাভারতেও দেখিতে পাই, সীতার চরিত্রের পবিত্রতা প্রমাণ করিবার জন্য বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি রামচন্দ্রের নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।—

বায়ুঃ—ভো ভো রাঘব সত্যং বৈ বাযুরস্মি সদাগতিঃ।
অপাপা মৈথিলী রাজন্ সঙ্গচ্ছ সহসীতয়া॥
অগ্নিঃ—অহমন্তঃশরীরস্থো ভূতানাং রঘুনন্দন।
সুসূক্ষ্মমপি কাকুৎস্থ মৈথিলী নাপরাধ্যতি॥
বরুণঃ—সর্বমস্তশ্চরো বেদ্মি ভূতদেহেষু রাঘব।
অহং বৈ ত্বাং প্রবীম্যেতদ্ মৈথিলী প্রতিগৃহ্যতাম্॥ (বনপর্ব ২৩৬।২৫-২৭)

কবিমানসটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়। রামায়ণের প্রকৃতি-বর্ণনার অনুরূপ কিছু কিছু বর্ণনা আমরা মহাভারত হইতেও পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, তাহা হইতেই মহাভারতকারের কবিদৃষ্টিরও পরিচয় মিলিবে। মহাভারতের শান্তিপর্বের ভিতরে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবগণের ন্যায় বৃক্ষ-লতারও প্রাণ আছে—তাহাদের ভিতরেও নিরন্তর পঞ্চভূতের খেলা চলিতেছে।—

সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণাম্ অচৈতন্যং ন বিদ্যতে॥
উষ্মতো ম্লায়তে বর্ণং ত্বক্ফলং পুষ্পমেব বা।
ম্লায়তে চৈব শীতেন স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে॥
বায়্বগ্ন্যশনিনিষ্পেষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্যতে।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দ স্তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ॥
বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
নাপাদৃষ্টেশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ॥
পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈ ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি।
ভবন্ত্যবোগাঃ পুষ্পাঢ্যা স্তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ॥
পাদৈস্‌সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাং চাপিদর্শনাৎ।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে॥
ব ক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোঽধ্বং জলমাদদেৎ।
থা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ॥
ন তজ্জলমাদত্তং জবয়েদগ্নিমারুতৌ।
কবিংহারপরিণামাচ্চ স্নেহো বৃদ্ধিশ্চ জায়তে॥
ং প্রেনাম্যপি বৃক্ষাণাম্ আকাশোঽস্তি ন সংশয়ঃ।
ক এবং পুষ্পফলৈর্ব্যক্তি নিত্যং সমুপলভ্যতে॥
র্থনাং (শাস্ত্রীব সংস্করণ, শান্তিপর্ব ১৭২।১০-১৮)

"সুখদুঃখের ।, সূর্য প্রা হতু, ছিন্ন অংশের পুনরুদ্গমহেতু আমি বৃক্ষ সকলের জীব (প্রাণ) দেখি ন্য, অচৈতন্য কিছুই দেখিতেছি না। তাপের দ্বারা বর্ণ, ত্বক্ এবং ফল-পু ংহিতা হইয়া যায়, আবার শীতের দ্বারাও ম্লান হয়, অতএব বৃক্ষে স্পর্শ আছে , অগ্নি এবং অশনি নিষ্পেষের দ্বারা ফল পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া যায়, শ্রো রাই শব্দ গৃহীত হয়, অতএব বৃক্ষগণ শ্রবণ করে।

অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ
সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥ (১।২৩।১৮)

‘জলরূপ দেবীকে আহ্বান করিতেছি—যেখানে আমাদের গরুগুলি পান করে ; এই সিন্ধুদিগের জন্য আমাদের হবি বিধান করা কর্তব্য।’

অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।
দেবা ভবত বাজিনঃ।
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে॥
ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম॥ (১।২৩।১৯-২২)

‘জলের মধ্যে অমৃত, জলের মধ্যে ওষধ, অতএব জলের প্রশস্তির জন্য হে দেবস্বরূপ ঋত্বিকৃগণ, আপনারা সত্বর হউন। জলের মধ্যে সকল ওষধ আছে, জলের মধ্যে বিশ্বের সুখকর অগ্নি আছে, ইহা আমাকে সোমদেব বলিয়াছেন, সুতরাং জলই ‘বিশ্বভেষজ’—অর্থাৎ সকল ভেষজের আধার। হে জলসমূহ, আপনারা আমার শরীরের নিমিত্ত রোগনাশক ওষধকে পূরণ (অর্থাৎ বর্ধন) করুন, এবং আমরা যেন নীরোগ হইয়া চিরকাল সূর্যকে দেখি। হে জলসমূহ, আমাতে যাহা কিছু পাপ আছে, অথবা আমি বুদ্ধি-পূর্বক সর্বতোভাবে যে দ্রোহ করিয়াছি, অথবা যে শাপ দিয়াছি, যাহা কিছু অসত্য বলিয়াছি তাহা সকল আপনাদের প্রবাহের দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যান।’

ঋগ্বেদের ভিতরে বহু স্থানে দেখিতে পাই, ঋষি নদীর নিকট স্তবের দ্বারা প্রার্থনা জানাইতেছেন।—

উত ত্যা নঃ পর্বতাসঃ সুশস্তয়ঃ সুদীতয়ো নদ্যস্ত্রামণে ভুবন্। (৫।৪৬।৬)

‘উৎকৃষ্ট স্তবার্হ পর্বতসকল এবং দানশীল নদীগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।’

সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্মিভি-
র্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।
দেবীরাপো মাতরঃ সূদয়িত্ন্বো
ঘৃতবৎপয়ো মধুমন্নো অর্চত॥ (১০।৬৪।৯)

‘সরস্বতী, সরযু, সিন্ধু—এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী নদী

(আমাদিগকে) রক্ষা করিতে আসুন। জলপ্রেরণকারিণী জননীস্বরূপা এই সকল দেবী আমাদিগকে ঘৃতবৎ এবং মধুমৎ জল অর্পণ করুন।' (রঃ দঃ)

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তটি সম্পূর্ণই নদীর স্তব; সেখানেও বলা হইয়াছে,—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি
শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া-
র্জীকীয়ে শৃণু হ্যা সুষোময়া॥ (১০।৭৫।৫)

'হে গঙ্গা! হে যমুনা, সরস্বতি, শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সংগত মরুৎবৃধা নদি! হে বিতস্তা ও সুষোমা-সংগত আর্জীকীয়া নদি! তোমরা শ্রবণ কর।' (রঃ দঃ)

মাতৃস্থানীয়া নদীদের সহিত মানুষের আত্মীয়তা মধুর হইয়া উঠিয়াছে বিপাশা (বিপাশ) ও শতদ্রু (শুতদ্রু) নদীদ্বয়ের সহিত বিশ্বামিত্র ঋষির কথোপকথনে। এই জলবতী বিপাশা ও শতদ্রু নদীদ্বয় শৈলের উৎসঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া সাগরসঙ্গমে গমনাভিলাষিণী হইয়া অশ্বশালা হইতে বিমুক্ত অশ্বদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর স্পর্ধা করত—শুভ্র দুইটি গাভীর ন্যায়—বৎস-লেহনাভিলাষিণী (গাভীদ্বয়ের) ন্যায—বেগে প্রবাহিত হইতেছিল (৩।৩৩।১)। বিশ্বামিত্র ঋষি পিজবনের পুত্র সুদাস রাজার যজ্ঞ করাইয়া ধন-গবাদিসহ ফিরিতেছিলেন: জলভারে স্ফীত নদীদ্বয়কে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে
অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।
সমারাণে ঊর্মিভিঃ পিন্বমানে
অন্যা বামন্যামপ্যেতি শুভ্রে॥
অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাময়াসং
বিপাশমুর্বীং সুভগামগন্ম।
বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে
সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তী॥ (৩।৩৩।২-৩)

'ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার (ইন্দ্রের) প্রার্থনা রক্ষা করিবার জন্য তোমরা রথিদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছ। তোমরা একযোগ প্রবাহিত হইয়া, তরঙ্গদ্বারা (পরিসর প্রদেশে) বর্ধিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকটে গমন করিয়া শোভা পাইতেছ। আমি মাতৃসমা সিন্ধুর (শতদ্রুর)

নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, মহতী সৌভাগ্যবতী বিপাশা নদীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মাতৃদ্বয় বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় একই স্থান (সমুদ্র) লক্ষ্য করিয়া সঞ্চরমাণা।'

বিশ্বামিত্রের এই সকল স্তবস্তুতি শুনিয়া নদীদ্বয় বুঝিতে পারিল, ঋষির নিশ্চয়ই বিশেষ কোন প্রার্থনা রহিয়াছে; তাহারা বলিয়া উঠিল,—

এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা
অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ।
ন বর্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ
কিংযুর্বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি॥ (৩৷৩৩৷৪)

'আমরা এই জলদ্বারা বর্ধিত হইয়া দেবকৃত স্থানের অভিমুখে গমন করিতেছি। গমনে প্রবৃত্ত আমাদের এই উদ্যোগ নিবৃত্ত হইবার নহে; কি ইচ্ছা করিয়া এই বিপ্র বার বার নদীদিগকে আহ্বান করিতেছে?'

তখন বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন,—

রমধ্বং মে বচসে সোম্যায
ঋতাবরীরুপ মুহূর্তমেবৈঃ।
প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষা-
বস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ॥ (৩৷৩৩৷৫)

'হে জলবতী নদীদ্বয়, আমার সোমসম্পাদক বাক্যের জন্য মুহূর্তের জন্য গমন হইতে বিরত হও। আমি কুশিকের পুত্র, আমি প্রসাদাভিলাষে মহতী স্তুতি দ্বারা নদীকে আমার উদ্দেশে আহ্বান করিতেছি।'

নদীদ্বয় বলিল,—'নদীগণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করিয়া বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে খনন করিয়াছেন—জগৎপ্রেরক সুহস্ত দ্যুতিমান্ ইন্দ্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন,—তাঁহার আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হইয়া গমন করিতেছি।' (৩৷৩৩৷৬)।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—'ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বীরকর্ম সর্বদা কীর্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দিকে আসীন (অবরোধ-কারীদিগকে) বজ্র দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। গমনাভিলাষে জলসমূহ আগমন করিয়াছিল।' (৩৷৩৩৷৭)

নদীদ্বয় বলিল,—'হে স্তোতা, তুমি এই যে বাক্য ঘোষণা করিতেছ, তাহা বিস্মৃত হইও না; ভবিষ্যৎ যজ্ঞদিবসে তুমি উক্থ রচনা করিয়া আমাদিগকে

সেবা করিও। আমরা তোমাকে সেবা করিতেছি, আমাদিগকে পুরুষের ন্যায় (প্রগল্‌ভ) করিও না।' (৩।৩৩।৮)

নদীদ্বয়কে কিঞ্চিৎ প্রসন্নমনা দেখিয়া বিশ্বামিত্র মুনি তখন তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন,—

ও যু স্বসারঃ কারবে শৃণোত
যযৌ বো দূরাদনসা রথেন।
নি যু নমধ্বং ভবতা সুপারা
অধো অক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ॥ (৩।৩৩।৯)

'হে ভগিনীদ্বয় স্তবকারী আমার কথা শোন,—আমি অতি দূর হইতে অশ্ব ও রথ লইয়া তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি; তোমরা সু-অবনত হও সুপারা হও (অর্থাৎ আমি যেন অনায়াসে অশ্ব-রথাদি লইয়া ওপারে যাইতে পারি),—হে নদীদ্বয়, তোমরা স্রোতের জল লইয়া রথচক্রের অক্ষের অধোদেশে গমন কর।'

তখন নদীদ্বয় বলিল,—

আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি
যযাথ দূরাদনসা রথেন।
নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা।
মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে॥ (৩।৩৩।১০)

'হে স্তোতা, আমরা তোমার কথা শুনিব, অশ্ব এবং রথের সহিত গমন কর; তুমি দূর হইতে আসিয়াছ,—সুতরাং আমরা তোমার জন্য অবনত হইতেছি; স্তন্য পান করাইবার জন্য মায়ের মতন অবনত হইতেছি,—যুবতি যেরূপ মনুষ্যদিগকে আলিঙ্গন করায় সেইরূপ অবনত হইতেছি।' এখানকার 'পীপ্যানেব যোষা' এই একটি উপমার ভিতর দিয়া বৈদিক কবির ভাবদৃষ্টি একটি অপূর্ব প্রকাশ লাভ করিয়াছে। মা যেমন শিশুকে স্তন্য পান করাইবার জন্য অবনত হয়,—সে অবনতির ভিতরে যেমন কোন অপমান নাই, রহিয়াছে মাতৃত্বের অসীম গৌরব, নদীদ্বয়ও স্তবকারী বিশ্বামিত্রের নিকটে ঠিক তেমন করিয়াই অবনত হইবে।

বেদ পড়িলে অনেক স্থানে মনে হয়, কুলুকুলনাদিনী নদীদিগের সত্যাই একটা ভাষা রহিয়াছে—তাহাদের একটা বলিবার কথা রহিয়াছে; বেদের

কবি যেন নদীর এই ভাষা কিছু কিছু জানিতেন। এক স্থানে দেখিতে পাই, কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

এতা অর্ষংত্যললাভবন্তী-
ঋ্তাবরীরিব সংক্রোশমানাঃ।
এতা বি পৃচ্ছ কিমিদং ভনন্তি
কমাপো অদ্রিং পরিধিং রুজন্তি॥ (৪।১৮।৬)

"অ-ল-লা" এইরূপ শব্দ করিতে করিতে এই জলবতী (নদীগণ) হর্ষসূচক শব্দ-করত গমন করিতেছে। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহারা কি বলিতেছে। জল সমূহ আবরক কোন্ মেঘকে ভেদ করে?'

ঋষি-কবিগণ রাত্রির নিকটেও আহ্বান জানাইয়াছেন,—'হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেসিনীং'—জগতের উপবেশনস্থল বাত্রিকে আহ্বান করিতেছি। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তে অতি চমৎকার রাত্রির স্তব দেখিতে পাই,—রাত্রি আসিয়া চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, নক্ষত্র সমূহের দ্বারা অশেষ শোভা সম্পাদন করিয়াছে,—যাহারা নিম্নে থাকে এবং যাহারা উর্ধ্বে থাকে, রাত্রি তাহাদের সকলকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; গ্রাম সমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে,—পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ—সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে। এই রাত্রির নিকট ঋষিকবি প্রার্থনা করিতেছেন,—

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষে ন বসতিং বযঃ॥

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব॥

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥ (১০।১২৭।৪, ৬, ৮)

'পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আ[illegible] শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভঙ্করী হউন।...হে রাত্রি, বৃ[illegible] ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও; চোরকে দূরে ল[illegible] যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভঙ্করী হও।...হে আকাশের কন্যা রা[illegible]

তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর।' (রঃ দঃ)[১]

বেদের ভিতরে বহু স্থানেই দ্যাবা-পৃথিবী—অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবীর নিকট স্তব এবং প্রার্থনা দেখিতে পাই। প্রায় সর্বত্রই এই দ্যাবা-পৃথিবী প্রাণিগণের পিতামাতারূপে বর্ণিত হইয়াছে। এক স্থানে বলা হইয়াছে—

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং
পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥
... ...
ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা
অভিশ্রাবায প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে
পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ॥ (১।১৮৫।২,১০)

'পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবা-পৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণিসমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। হে দ্যাবা-পৃথিবি! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।...আমি প্রজ্ঞাবান্, আমি দ্যাবা-পৃথিবীর উদ্দেশে চারিদিকে প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্র করিয়াছি, পিতামাতা নিন্দনীয় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সর্বদা নিকটেই রাখিয়া তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করুন।' (রঃ দঃ)

দশম মণ্ডলের ১৪৬ সূক্তে যে অরণ্যানীর বর্ণনা ও স্তব রহিয়াছে সে বর্ণনার সহিত কবির অন্তরঙ্গতা লক্ষণীয়। প্রথমেই কবি বলিতেছেন,—

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী।

'হে অরণ্যানি! হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধান হইয়া যাও (অর্থাৎ কত দূর চলিয়াছে, স্থির করা যায় না)। তুমি গ্রামে

---

(১) যাং দেবাঃ প্রতিনন্দন্তি রাত্রিং ধেনুমুপায়তীং।
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী।
(অথর্ববেদ-সংহিতা, ৩।১০।২)
আরও দ্রঃ—অথর্ববেদ-সংহিতা, (১৯।৪৭।১-২, ১৯।৪৯।১, ৪, ৮)

যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না? তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় করে না?' (রঃ দঃ) এই অরণ্যানীর ভিতরে মাঝে মাঝে যে দাবাগ্নি জলিয়া উঠিত সে যুগের কবির তাহার সহিত পরিচয় রহিয়াছে। ভয়বিহ্বল কবির মনের প্রকৃতিব এই রুদ্র রূপের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহ দেখা যায়।

যদযুক্থা অরুষা রোহিতা রথে
বাতজুতা বৃষভস্যেব তে রবঃ।
আদিন্বসি বনিনো ধূমকেতু-
নাগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব॥
অধ স্বনাদুত বিভ্যুঃ পতত্রিণো
দ্রপ্সা যত্তে যবসাদো ব্যস্থিরন্।
সুগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যো-
হ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব॥ (১।৯৪।১০-১১)

'হে অগ্নি, যখন তোমার বোচমান লোহিত এবং বাযুগতি অশ্বদ্বয রথে সংযোজিত কর, তখন তোমার রব বৃষভেব ন্যায় হয; তাহাব পর বনভূমির বৃক্ষ সকলকে ধূমরূপে কেতুর দ্বাবা আচ্ছন্ন কর। তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হই না। হে অগ্নি, অনন্তর দগ্ধ কবিতে করিতে বনে প্রবেশানন্তর তোমাব গম্ভীর শব্দ শুনিয়া পক্ষিগণ ভীত হয়, তোমার জ্বালাব এক দেশ অরণ্যেব তৃণগুলির ভক্ষক হইয়া তখন বিবিধ প্রকারে অবস্থিতি কবে, তখন তোমার এবং তোমার রথের পথ সুগম হয। তুমি বন্ধু থাকিলে আমবা হিংসিত হই না।'

চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে 'ক্ষেত্রপতি' দেবতাব স্তব দেখিতে পাই। ইনি শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ইহাব কাছে প্রার্থনা কবিয়া কবি বলিতেছেন,—

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো
মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ব-
রিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম॥
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ
শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং
শুনমষ্ট্রামুদিংগয়।

শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ
শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্॥ (৪।৫৭।৩-৪,৮)

'ওষধি সমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব। বলীবর্দ সমূহ সুখে (বহন করুক), মনুষ্যগণ সুখে (কার্য করুক), লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক, এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।... ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জন্য মধুর জল দ্বারা (পৃথিবী সিক্ত করুন)। হে শুনাসীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।' (রঃ দঃ)

এই সকল প্রার্থনারই পূর্ণতম রূপ দেখিতে পাই নিম্নোক্ত প্রার্থনায়—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসঃ।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

'বাতাস সকল ঋতুতেই মধু বহন করে, নদীসকল মধুক্ষরণ করে, আমাদের ওষধিগুলি মধুময় হউক; রাত্রি মধুময় হউক, ঊষা মধুময় হউক। পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক, আমাদের পিতা ও দ্যুলোক মধুময় হউক; আমাদের বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য মধুমান্ হউক, আমাদের গরুগুলি মধুময় হউক।'

বিশ্বসৃষ্টির পানে তাকাইয়া বেদের ঋষি সকলের নিকটেই প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ
সূর্যো নক্ষত্রৈরুর্বন্তরিক্ষং॥
শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো
ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতি শৃণোতু
যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রং॥ (৩।৫৪।১৯-২০)

'পৃথিবী, দ্যুলোক, জলসমূহ, সূর্য ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরিক্ষ আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ করুন। অভীষ্টবর্ষী (মরুৎগণ) এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্য দ্বারা হৃষ্ট হইয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন, মরুদ্‌গণ আমাদিগকে কল্যাণকর সুখ দান করুন।' (রঃ দঃ)

> প্রৈষ স্তোমঃ পৃথিবীমন্তরিক্ষং
> বনস্পতীঁরোষধী রায়ে অশ্যাঃ।
> দেবোদেবঃ সুহবো ভূতু মহ্যং
> মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ ॥ (৫।৪২।১৬)

'ধনের নিমিত্ত মৎকৃত এই স্তোত্র পৃথিবী, স্বর্গ, বৃক্ষ, ওষধিবর্গের নিকট উপস্থিত হউক; আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হই; মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহ বুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন।' (রঃ দঃ)

> অবন্তু মামুষসো জায়মানা
> অবন্তু মা সিন্ধবঃ পিন্বমানাঃ।
> অবন্তু মা পর্বতাসো ধ্রুবাসো-
> ঽবন্তু মা পিতরো দেবহূতৌ ॥

> পর্জন্যো ন ওষধীভির্ময়োভু-
> রগ্নিঃ সুশংসঃ সুহবঃ পিতেব ॥ (৬।৫২।৪,৬)

'জায়মানা উষা আমাদিগকে রক্ষা করুন, স্ফীত সিন্ধুগুলি আমাকে রক্ষা করুক, নিশ্চল পর্বতগণ আমাকে রক্ষা করুক।...ওষধিগণের সহিত পর্জন্য যেন আমাদিগের সুখদাতা হন, অগ্নি যেন পিতার ন্যায় অনায়াসে স্তুত্য ও আহ্বানযোগ্য হন।' বেদের কতগুলি সূক্ত এই সমগ্র বিশ্বেদেবতাগণের স্তুতিতে মুখরিত।

ক্রিয়াকাণ্ড-প্রধান যজুর্বেদেও দেখিতে পাই, অশ্বমেধ যজ্ঞে একদিকে যেরূপ সমস্ত দেবতার আহ্বান এবং বন্দনা রহিয়াছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনই সমস্ত দিক্, সব রকমের জল (প্লাবনের জল, স্থির স্রোতোহীন জল, স্রবণশীল জল, স্যন্দমান জল, কূপের জল, ঝরণার জল, সমুদ্রের জল প্রভৃতি), বায়ু, ধূম, অভ্র, মেঘ, (বিদ্যুতের মেঘ, গর্জনকারী মেঘ, স্ফূর্জৎ মেঘ, বর্ষণশীল মেঘ, ধারাসার বর্ষণশীল মেঘ, উগ্র বর্ষণশীল মেঘ, শীঘ্র বর্ষণশীল মেঘ, গুড়ি

গুড়ি বর্ষণশীল মেঘ প্রভৃতি) নক্ষত্র, নক্ষত্রিয়, অহোরাত্র, অর্ধমাস, মাস, ঋতু, সংবৎসর, দ্যাবা-পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, রশ্মি, বনস্পতি, পুষ্প, ফল, শাখা, ওষধি প্রভৃতির আহ্বান ও বন্দনা রহিয়াছে। (শুক্ল যজুর্বেদ ২২।২৪-২৮; আরও তুলনীয়, ৩৭।২)। যজ্ঞে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, প্রাচ্যাদি দিক্‌সমূহ, বৎসর, দিন রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর প্রভৃতিকে আহুতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। (কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ৭।৭।১।১৫) অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে বিশ্বসৃষ্টির সহিত মিলাইয়া লইবার চেষ্টা রহিয়াছে। উষা এই অশ্বের শির, সূর্য, চক্ষু, বায়ু প্রাণ, চন্দ্র কর্ণ, দিক্‌গুলি পদ, অহোরাত্র চক্ষুর উন্মেষ-নিমেষ, পক্ষগুলি হস্তপদের পর্ব, ঋতুগুলি অঙ্গ-সকল, সংবৎসর আত্মা, রশ্মি সমূহ কেশ, নক্ষত্র রূপ, ওষধিসমূহ এই অশ্বের লোম, অগ্নি মুখ, সমুদ্র ইহার উদর। কৃষ্ণ (যজুর্বেদ ৭।৭।৫।২৫)। পরবর্তী কালের বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই, এই যে বিশ্বসৃষ্টির বিরাট অশ্ব ইহাকে ধ্যান করিলেই ইহার ভিতর দিয়া বিশ্বদেবতার মহিমা উপলব্ধি করা যায়।

অথর্ববেদের বহু স্থান দেখিতে পাই, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্রমা, ভূমি, আপ, দ্যৌ, অন্তরীক্ষ, দিক্‌, ঋতু, বাক, পর্জন্য, অহোরাত্র, বনস্পতি, ওষধি ও বীরুধ সমূহের নিকট প্রার্থনা রহিয়াছে।[১] চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চদশ সূক্তে একটি চমৎকার বর্ষার আহ্বান রহিয়াছে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা রহিয়াছে। কবি বলিতেছেন—বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত মেঘাবৃত দিক্‌গুলি ছুটিয়া আসুক; বায়ুর সহিত জলপূর্ণ মেঘগুলি এক হইয়া আসুক; মহাবৃষের ন্যায় গর্জনকারী বায়ু-প্রেরিত মেঘগুলির শব্দায়মান জলধারা পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক, শোভনদান যুক্ত মহৎ মরুৎ সমূহ এই বৃষ্টিকে দেখুক অর্থাৎ বৃষ্টির সহিত মরুদ্‌গণ আমাদিগকে মহাদানে অনুগৃহীত করুক; বৃষ্টির-জলের রস সমূহ ওষধির ভিতর দিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করুক, এই বর্ষাধারা নিম্নভূমিকে পূজা করুক, নানাবিধ ওষধি সমূহ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে জাত হইয়া পৃথিবীকে ভূষিত এবং সমৃদ্ধ করুক। স্তবগানকারী আমাদিগকে অভ্রগুলি দেখাও; বেগযুক্ত বর্ষাধারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে চলিতে থাকুক, বৃষ্টিধারা ভূমিভাগকে মহনীয় করুক,—নানা প্রকারের আবণ্য তরুলতা জাত হউক। হে পর্জন্যদেব, গর্জনকারী মরুদ্‌গণ তোমার সমীপে আসিয়া গান করুক, বর্ষার পৃথক্‌ পৃথক্‌

---

(১) অথর্ববেদ-সংহিতা, ৫।২৮।২, ৮।২।২২, ১১।৬(৮)।১, ১১।৬(৮)।৫, ১১।৬ (৮)। ৬-৭, ১০, ১৭ প্রভৃতি।

ধারাগুলি নিম্নে মিলিত হইয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করুক। হে পর্জন্য, তুমি গর্জন কর, মেঘগুলিকে শব্দযুক্ত কর, জলধিকে পীড়িত কর, ভূমিকে দুগ্ধসম জল দ্বারা সংসিক্ত কর। তোমার প্রেরিত বহুল বর্ষণ-সমর্থ অভ্রগুলি ছুটিয়া আসুক, ধারাসম্পাতকামী সূর্য কৃশ গরুর ন্যায় অস্ত গমন করুক। শোভনদানশীল মরুদ্গণ তোমাদের মঙ্গল দান করুন, অজগরের ন্যায় স্থূল বারিধারা নামিয়া আসুক; মরুদ্গণ দ্বারা প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীর উপর বর্ষণ করুক। দিকে দিকে বিদ্যুৎ দ্যোতিত হইয়া উঠুক, দিকে দিকে বাতাস প্রবাহিত হউক, মরুদ্গণ কর্তৃক প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীর সঙ্গে নামিয়া আসুক। জাতবেদা অগ্নি আকাশ হইতে প্রজাগণের জন্য অমৃত ক্ষরণ করুন। সৎ ব্রতচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় যে দার্দুরীকুল সমস্ত বৎসর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, প্রচুর জলধারা বর্ষণে সেই দার্দুরীকুল এখন মুখর হইয়া পর্জন্যপ্রীতিকর রবে ভরিয়া দিক।[১]

---

(১) সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ
সমভ্রাণি বাতজূতানি যন্তু।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো
বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু॥
সমীক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবো-
ঽপাং রসা ওষধীভিঃ সচন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ॥
সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং
বেগাসঃ পৃথগুদ্ বিজন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ॥
গণাস্ত্বোপ গায়ন্তু মারুতাঃ পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্।
সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষন্তু পৃথিবীমনু॥
... ...
অভি ক্রন্দ স্তনয়ার্দয়োদধিং
ভূমিং পর্জন্য পয়সা সমঙ্ধি।
ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষ-
মাশারৈষী কৃশগুরেত্বস্তম্।
সং বোঽবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু॥
আশামাশাং বি দ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সং যন্তু পৃথিবীমনু॥ ইত্যাদি (৪।১৫।১-৪, ৬-৮)

অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ডের প্রথম সূক্তে যে পৃথিবীর বন্দনা রহিয়াছে তাহা একদিকে যেমন সহজ কবিত্বময়, অন্যদিকে সেই বন্দনার ভিতর দিয়া মাতা বসুন্ধরার সহিত মানুষের নাড়ীবন্ধন অতি দৃঢ় হইয়া দেখা দিয়াছে।[1] নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, অরণ্য-পর্বত, বৃক্ষলতা, ওষধি—সকলের ভিতর দিয়া সেই জননীর স্নেহ শতরূপে আমাদের উপরে বর্ষিত হোক, ইহাই কবির প্রার্থনা।

উপরে আলোচিত বৈদিক গাথাগুলি হইতে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় মনের আদিম ধারাটির সন্ধান মিলিবে। এই ধারাটিই প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে পরবর্তী যুগে। এই গুলির সহিত বাল্মীকির ও কালিদাসের কাব্য মিলাইয়া পড়িলে মনে হইবে, বাল্মীকির কাব্য যেমন দাঁড়াইয়া আছে কালিদাসের কাব্যের পটভূমিরূপে, বৈদিক সাহিত্য তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া আছে বাল্মীকির কাব্যের পটভূমি-রূপে। বৈদিক যুগে যাহা দেখা গিয়াছিল মানুষের একটা সহজ সরল বিশ্বাসরূপে, বাল্মীকির যুগে তাহারই সহিত এখানে-সেখানে কিছু কিছু কবিকল্পনাব মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কালিদাসের যুগে আসিয়া দেখিতে পাই, সেই আদিম বিশ্বাস কবিমানসের অবচেতনে মগ্ন হইয়াছে ; তাহার উপরে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবিকল্পনা এবং কবিকল্পনাশ্রিত বিবিধ মণ্ডনশ্রী। ইহাই অতি স্বাভাবিক হইয়াছে,—একদিকে যেমন যুগের সহিত যুগের যোগ অব্যাহত রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি যুগের সহিত যুগের ব্যবধানও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব কি করিয়া কবি মানসের এই বৈশিষ্ট্য উনবিংশ শতক—এমন কি বিংশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে অব্যাহত ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

আমাদের শুধু কবি মানসের-ক্ষেত্রে নয়—বৃহৎ সমাজ-মানসের ক্ষেত্রেও আমরা এই মানস-বৈশিষ্ট্য আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করিতে পারি। আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করি, ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ নদীগুলি শুধুমাত্র নদী নয়—গঙ্গা যমুনা, সরযু, গোদাবরী, কাবেরী ইহারা নদীও বটে—প্রাণধর্মে উজ্জীবিতা দেবীও বটেন ; অন্তরে অন্তরে সমগ্র জাতির ইহাদের সঙ্গে কেমন একটা মন-প্রাণের সহজ যোগ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে শুধু গঙ্গাকেই দেবীরূপে কল্পনা করিয়া পূজা করি তাহা নয়,—আজও আমরা প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় যমুনা, সরযু, গোদাবরী নদীর আরতি করিয়া থাকি। 'দেশ' আজও আমাদের মাতা—

(১) এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্ধের শেষাংশে সূক্তটি দ্রষ্টব্য।

'বন্দে মাতরম্' তাই আমাদের জাতীয় মন্ত্র। আমরা আমাদের বাস্তুভূমিকে এখনও সাংবাৎসরিক পূজা করিয়া থাকি, এখনও বৎসরের কোনও বিশেষ সময়ে মাতা পৃথিবীর গায়ে আঘাত করাকে আমরা পাপ বলিয়া মনে করি। এখনও আমাদের জনসমাজে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবীতে অটুট বিশ্বাস—এখনও আমরা গৃহে ব্যবহৃত কোনও যন্ত্র বা পাত্রে পা লাগিলে সহজাত সংস্কার-বশতঃই তাহাকে প্রণাম করিয়া থাকি। রান্নার পূর্বে এখনও শুধু গৃহবধূগণকে নয়—রসুই-ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত অগ্নিকে প্রণাম—এবং অনেক সময় অগ্নিতে আহুতি দিয়া লইতে দেখি। ছোটখাট এইসব আচারের মধ্য দিয়া আমাদের সমাজ-মানসের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। যাহারা মোটেই তত্ত্ববিদ্ নয় এমন জনসাধারণের মনের কোণে এখনও কোথায় সেই বিশ্বাস যেন লুকাইয়া আছে—কোনও জড়বস্তুই শুধুমাত্র জড় নয—একটি অদৃশ্য সত্যের প্রকাশ—সেই অদৃশ্য সত্যকেই আমরা বহুরূপে দেবতা কল্পনা করিয়া লইযাছি।

॥ ৬ ॥

কালিদাস ও বাল্মীকির কাব্যে বর্ণিত প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আর একটি জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—উহা উভয় কবির ঋতু-বর্ণনা। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যে ষড়্-ঋতুর বর্ণনা রহিযাছে, অন্যান্য কাব্যের ভিতরেও বিশেষ করিয়া বসন্ত, বর্ষা এবং শরৎ ঋতুর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা পাই। বাল্মীকির রামাযণের তিনটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা পাইতেছি।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' যে অকাল বসন্তের প্রসিদ্ধ বর্ণনা রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করিযাছি যে, এই বসন্ত ঐ নাটকীয় সর্গটির ভিতরে একটা জীবন্ত চরিত্র হইযা উঠিয়াই চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত 'রঘুবংশের' নবম সর্গে রাজা দশরথের শিকারে ভ্রমণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বসন্তের বর্ণনা রহিয়াছে এবং 'ঋতুসংহার' কাব্যে যে বসন্তের বর্ণনা রহিয়াছে, ইহার কোন বর্ণনার ভিতর দিয়াই কবির কোন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে নাই। এই বসন্ত ঋতুকে কালিদাস নিছক সম্ভোগ-বিলাসী রসিকের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন; এই শৃঙ্গারের বিভাব স্থানীয় বসন্তের সহিত মানুষের যোগও ভোগ-তরল; বসন্তের অপর্যাপ্ত মণ্ডনকলাতেই এখানকার

যেটুকু চমৎকারিত্ব। 'ঋতুসংহারে' শুধু বসন্ত ঋতু নহে, সব ঋতুই শুধু মানুষের শৃঙ্গার-উদ্দীপক ; এই এক দৃষ্টিতেই কবি সকল ঋতুর দিকে তাকাইয়াছেন। ঋতুগুলির এই শৃঙ্গার উদ্দীপনার ভিতরে আমরা কবিমনের বিশেষ কোন রং লক্ষ্য করিতে পারি না। কিন্তু বাল্মীকির বসন্ত-বর্ণনায় মানুষের মনের রং লাগিয়াছে। বর্ষাকালে যেমন বারিবর্ষণ হয় ঠিক তেমনই ভাবে বনভূমির পুষ্পবর্ষণ লইয়া এই বসন্তঋতু সমাগত। রম্যশিলাতলবর্তী বিবিধ কানন-ক্রমগুলি বায়ুবেগে প্রচলিত হইয়া পৃথিবীকে ফুলে ফুলে ভরিয়া দিতেছে; যে ফুলগুলি ভূমিতে পড়িয়াছে—যেগুলি পড়িতেছে—যেগুলি এখনও গাছে—সবগুলি লইয়া যেন বাতাস খেলায় মত্ত ; অলি গুঞ্জন—কোকিল-কূজন—বায়ুবশে বৃক্ষ-সঞ্চলন—সমস্তের ভিতর দিয়া যেন নৃত্যগীতের উৎসব—

প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননক্রমাঃ।
বায়ুবেগ-প্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্ ॥
পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ।
কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ ॥
বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুসুমোৎকটাঃ।
মারুশ্চলিতস্থানৈঃ ষট্‌পদৈরনুগীয়তে ॥
মত্তকোকিলসন্নাদৈর্নর্তয়ন্নিব পাদপান্।
শৈলকন্দরনিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব চানিলঃ ॥ (কি—১।১২-১৫)

কিন্তু বিরহী রামচন্দ্রের নিকট পম্পাসরোবরের চারিদিকে এই যে বসন্ত আসিয়া দেখা দিয়াছিল, সে রামচন্দ্রের মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল।

অশোকস্তবকাঙ্গারঃ ষট্‌পদস্বননিস্বনঃ।
মাং হি পল্লবতাম্রার্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি ॥ (কি-১।২৯)

'অশোকস্তবকগুলিই অঙ্গার, ভ্রমরগুঞ্জনই অগ্নিনিস্বন ; পল্লবের তাম্র-অর্চি লইয়া বসন্তের আগুন আমাকে প্রদগ্ধ করিতেছে[১]।'

(১) কিন্তু কালিদাস বলিয়াছেন,—

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ
সর্বত্র কিংশুক-বনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্ত-সময়ে হি সমাচিতেয়ং
রক্তাংশুকা নব-বধূরিব ভাতি ভূমিঃ ।। (ঋতুসংহার, ষষ্ঠ-১৯)

'বসন্ত সময়ে সদ্য আদীপ্ত বহ্নিসদৃশ সমীরণ-কম্পিত কুসুম-ভারাবনত পলাশবনের দ্বারা সমাচ্ছাদিত এই ভূমি রক্তাংশুক পরিহিতা নববধূর ন্যায় শোভা পাইতেছে।'

মাং হি সা মৃগশাবাক্ষী চিন্তাশোকবলাৎকৃতম্।
সন্তাপয়তি সৌমিত্রে ক্রূরশ্চৈত্রবনানিলঃ॥ (ঐ-১।৩৫

এই বসন্তের মধ্যে চিন্তায় এবং শোকে আক্রান্ত আমাকে সেই মৃগশাবাক্ষী সীতা এবং ক্রূর চৈত্রানিল—উভয়ের (সমভাবে) সন্তাপিত করিতেছে।
এই অবস্থাতে—

পদ্মকোশপলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টির্হি মন্যতে।
সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ॥
পদ্মকেসরসংসৃষ্টো বৃক্ষান্তরবিনিঃসৃতঃ।
নিশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ॥ (ঐ-১।৭০-৭১)

পদ্মকোশ-দলগুলি দেখিতে সীতার দুইটি নেত্রকোশের মত বলিয়াই মনে হয়; আর পদ্মকেসরের সংসৃষ্ট বৃক্ষান্তর হইতে বিনিঃসৃত বায়ু সীতার মনোহর নিশ্বাসের ন্যায়ই বহিতেছে। বসন্তে বনের বাতাসের ভিতরে যে মত্ততা আসিয়াছে কবিগুরুর সে বর্ণনার ভিতরে স্বকীয়তা রহিয়াছে।

পাদপাৎ পাদপং গচ্ছন্ শৈলাৎ শৈলং বনাদ্বনম্।
বাতি নৈকরসাস্বাদসম্মোদিত ইবানিলঃ॥ (ঐ ১।৮৫)

বনের চারিদিকে নানা রকমের নানা স্বাদের মধু বুকে করিয়া ফুল ফুটিয়াছে, আর বাতাসও অনেক রসাস্বাদে বর্ধিততৃষ্ণ হইয়াই যেন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে, পর্বত হইতে পর্বতে, বন হইতে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হিমান্তে বনতরু-গুলিতে এমনভাবে ফুল ফুটিয়াছে, যেন মনে হয় তাহারা একে অন্যের সঙ্গে স্পর্ধা করিয়া ভ্রমর-গুঞ্জনের দ্বারা একে অপরকে ডাকিয়া প্রতিযোগিতায় ফুল ফুটাইতেছে।

আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং নগাঃ ষট্পদনাদিতাঃ।
কুসুমোত্তংসবিটপাঃ শোভন্তে বহু লক্ষ্মণ॥ (১।৯২)

এই বসন্ত সমাগমে পর্বতের সানুদেশে যে মৃগটি মৃগীর সহিত ভ্রমণ করিতেছে, পম্পা-সলিলে যে কারণ্ডব পক্ষীটি তাহার কান্তার সহিত অবগাহন করিয়া প্রণয় সম্ভাবণ জানাইতেছে তাহাদের সকলের সহিতই রামচন্দ্রের একটা কোমল সহানুভূতি ব্যঞ্জিত হইতেছে।

কালিদাস 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে অকাল বসন্তের আগমনে তির্যক্প্রাণিগণের মধ্যেও চিত্তের অবস্থান্তর এবং তজ্জনিত বিবিধ প্রণয়-লীলার বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মীকির বসন্ত বর্ণনায়ও ইহার আভাস ছিল—রামচন্দ্রও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিল

'পশ্য লক্ষ্মণ সংরাগস্তির্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি' (কি-১।৪১)! বাল্মীকির মধ্যে যে বর্ণনার বিক্ষিপ্তভাবে আভাস দেখিতে পাই—কালিদাসের মধ্যে দেখিতে পাই তাহারই সংহত রসঘন বর্ণনা।

ঘন বর্ষার রূপ বর্ণনায় বাল্মীকি অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূতের ভিতরে ঘন বর্ষার তেমন কোন রূপ নাই। তবে মেঘদূতের বর্ষার সহিত এবং সেই বর্ষাকালীন সমগ্র প্রকৃতির সহিত মানুষের যে গভীর যোগ ব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহার আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। 'ঋতুসংহারে'র বর্ষার তেমন কোন অভিনব চমৎকারিত্ব নাই, সে মানুষের শৃঙ্গাররসের আলম্বন এবং উদ্দীপন রূপেই দেখা দিয়াছে, এবং সেই শৃঙ্গারের ভিতরে বিপ্রলম্ভের রেশ অতি ক্ষীণ—সম্ভোগের সুরই প্রধান।

বাল্মীকির বর্ষার গায়ে বিরহের রং লাগিয়াছে।[১] বর্ষার আকাশেব দেহে যেন কোন দুষ্টব্রণেব বেদনা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে; তাম্রবর্ণের সন্ধ্যারাগ, তাহার ভিতরে পাণ্ডুচ্ছাযা এবং চারিদিকে স্নিগ্ধ মেঘের পটচ্ছেদ যেন সেই বেদনাবই আভাস দিতেছে।

সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তেষ্বপি চ পাণ্ডুভিঃ।
স্নিগ্ধৈরভ্রপটচ্ছেদৈর্বদ্ধব্রণমিবাম্বরম্॥ (কি-২৮।৫)

বিরহাতুর রামচন্দ্রের চোখে আকাশের একটা আর্তি জাগিযা উঠিয়াছে; মন্দমারুতের নিশ্বাস বহিতেছে, সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিত মেঘের ঈষৎ পাণ্ডুরতায় যেন এই বেদনা রূপ পাইযাছে।

মন্দমারুতনিশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিতম্।
আপাণ্ডুজলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্॥ (ঐ ২৮।৬)

শুধু তাহাই নহে,—

এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥

* * *

কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাডিতম্।
অন্তস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্॥
নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী॥ (ঐ ২৮।৭, ১২-১৩)

---

(১) ভট্টিকাব্যের সপ্তম সর্গে (৭।১-১৩) কবি বর্ষাগমে রামচন্দ্রের বিরহবর্ণনায় বাল্মীকিরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু দুই বর্ণনা পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে বাল্মীকির বর্ণনাই যে শ্রেষ্ঠ এ কথা সহজেই অনুভব করা যাইবে।

'এই ঘর্মপরিক্লিষ্টা এবং নববারিপরিপ্লুতা পৃথিবী শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায়ই বাষ্প ত্যাগ করিতেছে। হৈম কশার ন্যায় বিদ্যুৎ কর্তৃক অভিতাড়িত হইয়া অন্তস্তনিতনির্ঘোষ আকাশ যেন সবেদন হইয়া উঠিয়াছে। নীলরেখাশ্রিতা বিদ্যুৎ বার বার স্ফুরিত হওয়ায় মনে হইতেছে রাবণের অঙ্কে তপস্বিনী সীতা যেন আমার নিকট বার বার আত্মপ্রকাশ করিতেছে।'

বাল্মীকির এই বর্ষা-বর্ণনার ভিতর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাব ভিতরে ঘন বর্ষার একটা মত্ত আবেগ আছে এবং তাহার ধারা-পতনের ধ্বনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দ এবং পদবিন্যাসের ভিতরেই এই বেগ এবং ধ্বনি নিহিত রহিয়াছে। প্রতি চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাসের সমাবেশ করিয়া অথবা প্রত্যেক চরণে একই পদের পুনরুক্তি দ্বারা বর্ষার একটানা ধারা-পতন-ধ্বনিটির আভাস দিবার চেষ্টা হইয়াছে, আর দ্রুত ক্রিয়াপদেব ব্যবহাবে একটা আবেগ সঞ্চারিত করা হইয়াছে।

বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি
প্রবৃত্তনৃত্যোৎসববর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
পশ্যাপরাহ্ণেষ্বধিকং বিভান্তি॥
... ...
নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি
দ্রুতং নদী সাগবমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি
কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি॥
জাতা বনান্তাঃ শিখিসুপ্রনৃত্যা
জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্বশাখাঃ।
জাতা বৃষা গোষু সমানকামা
জাতা মহী শস্যবনাভিরামা॥
বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি
ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ
প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গাঃ॥ (ঐ ২৮।২১, ২৫-২৭)

কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনা বহু স্থানে আমাদিগকে বাল্মীকির বর্ষা-বর্ণনা স্মরণ কবাইযা দেয়, যেমন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় এ যুগের কবি রবীন্দ্রনাথের

বর্ষা-বর্ণনা কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনাকে। আমরা এই সব সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে পংক্তিতে পংক্তিতে ভাবে ভাষায় হুবহু মিল আশা করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', 'নববর্ষা' প্রভৃতি পাঠ করিলে যেমন মনে হয়, বাল্মীকির অনেক ভাবের টুকরা, অনেক দৃশ্য, উপমা, ভাষা যেন কীর্ণ হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে, তেমনি কালিদাসের কাব্যে বর্ষা-বর্ণনা পাঠ করিলে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে স্মরণ হইতে থাকে—এখানে সেখানে যেন বাল্মীকির চিত্র, সুর এবং কথা ভাসিয়া আসিতেছে; বাল্মীকির বর্ণনাতেও যে পূর্ববর্তীদের স্মরণ ঘটে না তাহা নহে; তিনি যেমন বলিয়াছেন,—

গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥[১] (ঐ ২৮।২০)

'দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ মত্ত গজেন্দ্র সমূহের ন্যায় সমুদীর্ণনাদ মেঘগুলি গর্জন করিতেছে'; আমরা কিছু পূর্বেই দেখিয়াছি, অথর্ববেদে মেঘ সমূহকে গর্জনকারী মহাবৃষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—'মহঋষভস্য নদতো নভস্বতঃ'।

বাল্মীকি এই যে মেঘকে মত্তগজেব সহিত উপমিত করিলেন, এই গজেন্দ্র—

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ। (২৮।২০)

এই মেঘ গজেন্দ্র, সুতরাং তাহার রাজজনোচিত ভূষণ চাই। বিদ্যুতে তাহার পতাকা, বলাকায় তাহাব মালা, আর শৈলেন্দ্রশিখরের ন্যায় তাহার আকৃতি। কালিদাস বলিয়াছেন,—

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর-
স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনি-
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে॥ (ঋঃ সঃ-২।১)

এই বর্ষাগম একেবারে 'সমাগতো বাজবদুন্নতধ্বনির্'। জলকণাবর্ষী মেঘ ইহার মত্ত মাতঙ্গ, তড়িৎ ইহার পতাকা আর বজ্রধ্বনি ইহার মাদলধ্বনি।[২]

---

(১) তুলনীয়—নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শ্যামীকৃত্বা দিশো দশ।
বিমদা ইব মাতঙ্গাঃ শান্তবেগাঃ পয়োধরাঃ॥ (কি-৩০।২৪)

(২) আরও তুলনীয়—
তড়িৎপতাকাভিরলঙ্কৃতানা-
মুদীর্ণগম্ভীরমহারবাণাম্।
বিভান্তি রূপাণি বলাহকানাং
রণোৎসুকানামিব বারণানাম্॥ (রামায়ণ, কি—২৮।৩১)

তুলনীয়—তড়িৎপতাকা ইব তোয়দেভ্যঃ। অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ, ১০।৩৯

অবশ্য কালিদাস এখানে যে ঐশ্বর্যময় বীর্যময় রাজসমাগমের দৃশ্যটি অঙ্কিত করিয়াছেন বাল্মীকির মধ্যে সে দৃশ্যটি দেখিতে পাইতেছি অন্য প্রসঙ্গে। রাবণের রথারূঢ় আগমনের বর্ণনায় দেখি—

তড়িৎ-পতাকাগহনং দর্শিতেন্দ্রায়ুধপ্রভম্।
শরধারা বিমুঞ্চন্তং ধারাসারমিবাম্বুদম্॥ (ল—১০৭।৬)

বাল্মীকিতে দেখিতে পাই,—

বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ
নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন॥ (কি-২৮।২৪)

নববর্ষায় ভূমিতে নবশাদ্বল জাগিয়া উঠিয়াছে, এই নবশাদ্বলের হরিত-কান্তি মাঝে মাঝে বাল ইন্দ্রগোপের দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে; এই ভূমিকে দেখিলে মনে হয়, শুকপাখীর বর্ণসম বর্ণের একখানি কম্বল লাক্ষারসের দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে এবং একটি নারী এই কম্বলে আবৃতা হইয়া বসিয়া আছে। কালিদাসে দেখিতে পাই,—

প্রভিন্নবৈদূর্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ
সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলী-দলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা
বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ॥ (ঋঃ সঃ—২।৫)

'দলিতবৈদূর্যমণির ন্যায় তৃণাঙ্কুরে, নবোদ্গত কন্দলী-দলে, এবং ইন্দ্রগোপে সমাবৃতা হইয়া ক্ষিতি নীলাদিরত্নভূষিতা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে।' বাল্মীকি বলিয়াছেন,—

সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং
বলাকিনো বারিধারা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥ (কি ২৮।২২)

'সলিলের অতিভার বহন করিতে করিতে এবং গর্জন করিতে করিতে বারিধর মেঘগুলি পর্বত সকলের বড় বড় শৃঙ্গে বিশ্রাম করিয়া করিয়া পুনরায়

প্রয়াণ করিতেছে।' কালিদাসের 'মেঘদূতে'ও দেখিতে পাই, যক্ষ মেঘকে বলিয়া দিতেছে,—

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥
(মেঘদূত পূ ১৩)

'পথে বার বার পরিশ্রান্ত হইলে পর্বতের উপরে বিশ্রাম করিয়া এবং বার বার ক্ষীণ হইলে স্রোতের স্বাস্থ্যকর জল পান করিয়া গমন করিবে।'

তারপরে সেই বলাকাপংক্তি, তৃষার্ত চাতক, মানসোৎসুক রাজহংস দল, সেই প্রথম মুকুলিত নীপবনে ময়ূরের নৃত্য, সেই শ্যামজম্বুবন, বননির্ঝরের প্রপাতধ্বনি, সেই কেতকীর জলসিক্ত সুরভি—ইহা বাল্মীকি ও কালিদাস উভয়ের বর্ণনায়ই ছড়াইয়া আছে।

'ঋতু-সংহারে'র শরৎবর্ণনায়ও কালিদাস বাল্মীকির নিকট হইতে অনেক ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। কালিদাসের বর্ণনায় প্রথমেই দেখিতে পাই,—

কাশাংশুকা বিকচ-পদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদ-হংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্ক-শালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা ॥ (ঋঃ সঃ ৩।১)

আজ রূপরম্যা শরৎ যেন নববধূর ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়াছে; কাশ-কুসুমে ইহার সুচিক্কণ পরিধেয় বস্ত্র, প্রস্ফুটিত পদ্মে মনোজ্ঞ মুখ, মন্দমুখর হংসের নাদে রম্য নূপুরনাদ এবং আপক্ক শালিধান্য-শোভিত ইহার তনুগাত্রযষ্টি।[1]

বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই,—

সচক্রবাকানি সশৈবলানি
কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
সপত্ররেখাণি সরোচনানি
বধূমুখানীব নদীমুখানি ॥ (কি-৩০।৫৫)

এই শরতে নদীমুখগুলিকে বধূমুখের মত মনে হইতেছে; কাশকুসুমের দুকূলবস্ত্রে সে মুখ অবগুণ্ঠিত, আর চক্রবাক এবং শৈবালে মিলিয়া মুখের

(১) তুলনীয়—

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী
বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং
প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ (ঋঃ সঃ ৩।২৬)

রমণীয় পত্রলেখা রচনা করিয়াছে।[১] আবার কালিদাসের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

চঞ্চন্মনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ
পর্যন্ত-সংস্থিতসিতাণ্ডজ-পংক্তিহারাঃ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা
মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য ॥ (ঋঃ সঃ ৩।৩)

নদীগুলি আজ সমদা প্রমদাগণের ন্যায় অতি মন্দ মন্দ চলিতেছে; শরতে প্রকাশিত বিশাল পুলিনই তাহার নিতম্বদেশ, চঞ্চল মনোজ্ঞ শফরীমাঁছগুলি তাহার কাঞ্চীদাম,—আর উভয়তটে শোভিত শুভ্র হংসপংক্তিতেই তাহার হার। ইহার সঙ্গে আমরা তুলনা করিতে পারি বাল্মীকির বর্ণনা,—

মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং
নদীবধূনাং গতযোঽদ্য মন্দাঃ।
কান্তোপভুক্তালসগামিনীনাং
প্রভাতকালেষ্বিব কামিনীনাম্ ॥ (কি-৩০।৫৪)

'মীনোপসন্দর্শিত-মেখলা নদীবধূগণের গতি আজ মন্দ,—যেন প্রভাতকালে কান্তোপভুক্তা অলসগামিনী কামিনীগণেব গতির মত।'

শরতে নদীর জল শুকাইয়া যাওয়ায় যে পুলিন প্রকাশিত হয কালিদাস পূর্বোক্ত শ্লোকে তাহাকেই নদীর নিতম্ব দেশ বলিয়াছেন। বাল্মীকিও বলিয়াছেন—

দর্শয়ন্তি শরন্নদ্যঃ পুলিনানি শনৈঃ শনৈঃ।
নবসঙ্গমসব্রীড়া জঘনানীব যোষিতঃ ॥ (কি-৩০।৫৮)

কালিদাসের পূর্ব-বর্ণনাব অনুরূপ বর্ণনা বাল্মীকিতে আরও দেখিতে পাই—

প্রকীর্ণ-হংসাকুলমেখলানাং
প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মী-
র্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্ ॥ (ঐ ৩০।৪৯)

(১) আরও অতুলনীয়,—

নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈ-
র্ব্যাধূয়মানৈর্দ্রুমারুতেন।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ
কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি ॥ (রামায়ণ, কি-৩০।৫১)

আকুল হংসগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া থাকিয়া মেখলার শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং উৎপলের মালা রচিত হইয়াছে, এই সকল সভ উত্তম সরোবরগুলির শ্রী আজ ভূষিতা বরাঙ্গনাদের শ্রীর ন্যায় পরিবর্ধিত হইযাছে।

তার পরে কালিদাসে দেখিতে পাই,—

তারাগণ-প্রবর-ভূষণমুদ্বহন্তী
মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত-শশাঙ্ক-বক্ত্রা।
জ্যোৎস্না-দুকূলমমলং রজনী দধানা
বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা॥ (ঋঃ সঃ ৩।৭)

তারাগণের বহিভূর্ষণ বহন করিয়া, মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত চন্দ্রের মুখ বিকাশ করিয়া আর জ্যোৎস্নার অমলদুকূল বসন পরিধান করিয়া শরতের রজনী বালা প্রমদার মত অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই—

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা
তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি
নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী॥ (কি-৩০।৪৬)

'উদিত চন্দ্রে সৌম্যমুখকান্তি, তারাগণে উন্মীলিত-চারুনেত্র, আর জ্যোৎস্নার অংশুক বস্ত্র পরিহিত শরতের রাত্রি শুক্ল-অংশুকে সংবৃতাঙ্গী নারীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।'

কালিদাস বলিয়াছেন,—

স্ফুট-কুমুদচিতানাং রাজহংসাশ্রিতানাং
মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোমতোয়াশয়ানাং
বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্॥ (ঋঃ সঃ ৩।২১)

এই শরৎকালে উর্ধ্বের আকাশ যেমন মেঘমুক্ত হইয়া এবং চন্দ্র তারকায় অবকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে, তেমনই নিম্নের জলাশয়গুলিও ঐ আকাশের মত শোভা পাইতেছে; মেঘবিমুক্ত আকাশ যেমন স্বচ্ছ নির্মল মরকত মণির তুল্যকান্তি বারিরাশি দ্বারা ভূষিত, এই জলাশয়ও তেমনি স্বচ্ছ নির্মল; আকাশে

যেমন চন্দ্রতারকা ছড়াইয়া আছে—স্বচ্ছ জলাশয়েও তেমনই চন্দ্রতারকার ন্যায় কুমুদ এবং রাজহংস ছড়াইয়া রহিয়াছে।

বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই,—

সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং
মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবান্তরীক্ষম্॥ (কি-৩০।৪৮)

মহাহ্রদস্থ সলিলে হংস ঘুমাইয়া আছে, কুমুদ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—দেখিলে মনে হয় সে যেন মেঘমুক্ত রাত্রির পূর্ণচন্দ্রযুক্ত এবং তারাগণাকীর্ণ অন্তরীক্ষ।

এইরূপে কালিদাসের শরৎ-বর্ণনা বাল্মীকির শরৎ বর্ণনাকেই নানা ভাবে স্মরণ করাইয়া দিবে। বাল্মীকির শরৎ বর্ণনার ভিতরে একস্থানে দেখিতে পাই,—

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্॥ (কি—৩০।৪৫)

চন্দ্রের চঞ্চল করস্পর্শে (কিরণরূপ হস্তস্পর্শে) হর্ষোন্মীলিততারকা (তারকারূপ চোখের তারকা) রাগবতী (আরক্তিম, অনুরাগবতী) সন্ধ্যা আপনিই অম্বর (আকাশ, বস্ত্র) ত্যাগ করিতেছে। এই শ্লোকটিকে সম্মুখে রাখিয়াই যে পরবর্তী কালে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোনও সংশয় নাই।

উপোঢরাগেণ বিলোলতারকং
তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া
পুরোঽপি রাগাদ্ গলিতং ন লক্ষিতম্॥

'ঈষদুদ্বুদ্ধ রাগ বশতঃ চন্দ্র বিলোলতারক নিশামুখকে এমন ভাবে গ্রহণ করিল যে তাহার (নিশার) সমস্ত তিমিরাংশুক যে পূর্বেই রাগবশতঃ স্খলিত হইয়া পড়িল তাহা সে লক্ষ্যই করিতে পারে নাই।' এখানেও রাগ অর্থে আরক্তিম আভা এবং অনুরাগ, বিলোল-তারক অর্থে এখানেও তারকারূপ চোখের তারকাকেই বুঝাইতেছে, 'গৃহীত' শব্দের দ্বারা প্রাপ্ত এবং চুম্বিত এই উভয় অর্থই ব্যঞ্জিত হইতেছে, তিমিরাংশুক এখানে পাতলা অংশুকের ন্যায় অন্ধকারও বটে, আবার পাতলা অন্ধকারের

ন্যায় রেশমী বস্ত্রও বটে, পূর্ব (পুরঃ) এখানে আগে এই অর্থেও গ্রহণ করা যায়, পূর্বদিক্ অর্থেও গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু ঋতু-সংহারের শরৎ-বর্ণনায় বাল্মীকির বিশেষ প্রভাব বর্তমান থাকিলেও শরৎ-বর্ণনায় কালিদাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে 'রঘুবংশে'র চতুর্থ সর্গের শরৎ-বর্ণনায়। এই বর্ণনার চমৎকারিত্ব মূল প্রসঙ্গের সহিত ইহার গভীর সাহিত্যে বা সঙ্গতিতে। এখানে মূল প্রসঙ্গ রাজা রঘুর মাহাত্ম্য বর্ণনা ; সেই মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য কবি যে শরৎ-বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন শরৎ-ঋতুরও অতি সংযত অথচ যথাযথ বর্ণনা, অন্যদিকে তাহা রাজা রঘুর পক্ষেও অতি নিপুণ ভাবে প্রযুক্ত।

নির্বৃষ্টলঘুভির্মেঘৈর্মুক্তবর্ত্মা সুদুঃসহঃ।
প্রতাপস্তস্য ভানোশ্চ যুগপদ্‌ব্যানশে দিশঃ॥ (৪।১৫)

বৃষ্টিহীন লঘু মেঘের দ্বারা পথ উন্মুক্ত হওয়াতে দিক্‌সকল সূর্য এবং (শরৎকালে দিগ্বিজয়ী) রঘুর সুদুঃসহ প্রতাপ যুগপৎ ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

বার্ষিকং সংজহারেন্দ্রো ধনুর্জৈত্রং রঘুর্দধৌ।
প্রজার্থসাধনে তৌ হি পর্যায়োদ্যতকার্মুকৌ॥ (৪।১৬)

ইন্দ্র বার্ষিক ধনু ত্যাগ করিলেন, রঘু জয়শীল ধনু গ্রহণ করিলেন ; কারণ ইঁহারা উভয়েই প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ ধনু ধারণ করিয়া থাকেন।

পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসৎকাশচামরঃ।
ঋতুর্বিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছ্রিয়ম্॥ (৪।১৭)

পুণ্ডরীকের আতপত্র লইয়া এবং বিকশিত কাশকুসুমের চামর লইয়া শরৎ ঋতু রাজা রঘুর অনুকরণ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার (রঘুর) শ্রীকে লাভ করিল না।

প্রসাদসুমুখে তস্মিন্ চন্দ্রে চ বিশদপ্রভে।
তদা চক্ষুষ্মতাং প্রীতিরাসীৎ সমরসা দ্বয়োঃ॥ (৪।১৮)

তৎকালে রঘুর প্রসন্ন মুখচ্ছবি এবং বিশদপ্রভ চন্দ্র এই উভয়ে চক্ষুষ্মান্ লোকদিগের প্রীতি সমানই ছিল।

হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু চ বারিষু।
বিভূতয়স্তদীয়ানাং পর্যস্তা যশসামিব॥ (৪।১৯)

শরতের হংসশ্রেণীতে, তারাগুলিতে, কুমুদ ফুলে, নির্মল সলিলে রঘুর যশো-বিভূতিই যেন প্রসারিত ছিল।

ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তু গুর্ণোদয়ম্।
আকুমারকথোদ্‌ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ ॥ (৪।২০)

শালিধান্য রক্ষণে নিযুক্ত কৃষককামিনীগণ ইক্ষুচ্ছায়ায় বসিয়া প্রজারক্ষক রঘুর শৈশবকাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া যশ গান করিতে লাগিল।

প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্মহৌজসঃ।
রঘোরভিভবাশঙ্কি চুক্ষুভে দ্বিষতাং মনঃ ॥ (৪।২১)

মহৌজস অগণ্য নক্ষত্রের উদয় হওয়ায় জল সকল নির্মল হইয়া উঠিল; কিন্তু ওদিকে মহৌজস রঘুর উদয় হেতু শত্রুগণের পরাভবাশঙ্কি মন কলুষতা প্রাপ্ত হইল।

মদোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজাঃ।
লীলাখেলমনুপ্রাপুর্মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমম ॥ (৪।২২)

মদোদ্ধত প্রশস্ত-ককুদ্‌শালী প্রকাণ্ড বৃষ সকল নদীতট উৎপাটিত করিয়া রঘুর চিত্তাকর্ষক বিক্রমলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল।

বর্ণনার ভিতরে এই-জাতীয় একটা ব্যাপক এবং সুষ্ঠ 'সাহিত্য' কালিদাসের কবি-প্রতিভার একটা বৈশিষ্ট্য।

॥ ৭ ॥

সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাসের উপমা একটা প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছে। সত্য সত্যই কালিদাসের কবি-প্রতিভার একটা উজ্জ্বল পরিচয় তাঁহার উপমা-প্রয়োগে। তাঁহার রচিত কাব্য পড়িতে গেলে বহুস্থানেই দেখিতে পাই, সমুদ্রের তরঙ্গের মত একটার পর একটা উপমা শুধু আসিতেছেই, উপমা ছাড়া যেন কবি কথাই বলিতে পারেন না। কালিদাসের এই উপমা-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, এ উপমা তাঁহার কাব্যে কোথাও বহিরাভরণ-মাত্র হইয়া ওঠে নাই; সে সুকুমার কবিচিত্তের সুষ্ঠুতম বাহনরূপেই কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখানে অবশ্য উপমা-শব্দটিকে আমরা ব্যাপক ভাবে সমস্ত অর্থালঙ্কারের অর্থেই গ্রহণ করিতেছি, আর উপমাই প্রায় সকল প্রকারের অর্থালঙ্কারের মূলে। কালিদাসের উপমা সত্যই রসের আক্ষেপেই আক্ষিপ্ত

এবং তাহা একান্ত ভাবেই 'অপৃক্-যত্ন-নির্বর্ত্ত্য'; সুতরাং কালিদাসের উপমা-প্রয়োগের কৌশল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্নিহিত ভাবকে কাব্যদেহে রূপায়ণেরই কৌশল। এই কৌশলে সিদ্ধিলাভ করিয়াই কালিদাস তাঁহার কাব্যে 'বাক্য' এবং 'অর্থ'কে পার্বতী-পরমেশ্বরের ন্যায়ই অভিন্ন করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমি গ্রন্থান্তরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে আর এ-বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাই না।[১]

মোটের উপরে এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, উপমা-প্রয়োগকালিদাসের কবি-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কালিদাসের কবি-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যের মূলেও বাল্মীকির দান উপেক্ষণীয় নহে। উপমা-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এবং নৈপুণ্যের দ্বারা কবিচিত্তগত ভাবকে সুন্দরতম করিয়া প্রকাশ করিবার প্রতিভা বাল্মীকিরও অপ্রচুর নহে। রামায়ণের ভিতরে বহু স্থানে দেখিতে পাই, এক একটি গোটা অধ্যায়ে কবি শুধু উপমার পর উপমা প্রয়োগ করিয়াই স্বীয় বক্তব্যকে স্পষ্ট এবং রসস্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা পূর্বে বাল্মীকির যে সকল ঋতুবর্ণনা লইয়া আলোচনা করিয়াছি, রামায়ণের সেই সকল অধ্যায়গুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব কবি উপমা ছাড়া কথা অতি কদাচিৎ বলিয়াছেন। আর এই সকল উপমা নিতান্ত সাধারণও নহে, অথবা অযথা ভারে এবং ঝঙ্কারে সে কাব্যের ভিতরে কোন উৎপাতরূপেও দেখা দেয় নাই। বর্ষার বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন,—

শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপংক্তিভিঃ।
কুটজার্জুনমালাভিরলঙ্কর্তুং দিবাকরঃ॥ (কি-২৮।৪)

আজ জলভারে মেঘগুলি এমনভাবে থরে থরে ভূমিভাগের দিকে নামিয়া আসিয়াছে, যেন মনে হয়, এই মেঘের সোপান-পংক্তি বাহিয়া গিয়া কুটজ এবং অর্জুনের মালাগুলি সূর্যের গলায় পরাইয়া দিয়া আসা যায়।[২]

আর—মেঘোদরবিনির্মুক্তাঃ কর্পূরদলশীতলাঃ।
শক্যমঞ্জলিভিঃ পাতুং বাতাঃ কেতকগন্ধিনঃ॥ (কি ২৮।৮)

মেঘের ভিতর হইতে বাহিরে প্রবাহিত হইতেছে যে কেতকীর সুরভিমাখা

(১) লেখকের 'উপমা কালিদাসস্য' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(২) তুলনীয় কালিদাস:—ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী॥ (মেঘদূত, পূ—৬০)

কর্পূরদলের ন্যায় শীতল ও সুগন্ধি বাতাস তাহাকে আজ অঞ্জলি ভরিয়া পান করা যায়।

আর—মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
মারুতাপূরিতগুহাঃ প্রাধীতা ইব পর্বতাঃ॥ (ঐ ২৮।১০)

মেঘের কৃষ্ণাজিনধারী এবং বর্ষাধারার যজ্ঞোপবীতধারী পর্বতগুলি মারুতা-পূরিতগুহাসহ বটু ব্রাহ্মণের ন্যায় রূপধারণ করিয়াছে।

হেমন্ত ঋতুর বর্ণনায়ও বাল্মীকি কয়েকটি অতিশয় চমৎকার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন যাহার মধ্যে মহাকবির সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় রহিয়াছে। হেমন্ত কালে দক্ষিণ দিক্ই সূর্য কর্তৃক বিশেষভাবে সেবিতা,—তাহাতে উত্তর দিক্ শ্রীহীনা হইয়া উঠিতেছে—ঠিক যেন তিলকবিহীনা রমণীর মত।

সেবমানে দৃঢ়ং সূর্যে দিশমন্তকসেবিতাম।
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে॥
(আর—১৬।৮)

আবার—সূর্য কর্তৃক সৌভাগ্য অপহৃত হওয়ায় এবং তুষারের দ্বারা চন্দ্র-মণ্ডল অরুণ বর্ণ ধারণ করায় মনে হইতেছে নিশ্বাসের দ্বারা আচ্ছন্ন দর্পণের ন্যায় চন্দ্রমা প্রকাশ পাইতেছে না—

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥ (ঐ—১৬।১৩)

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুষার-মলিনা হইয়া যাওয়ায় তাপে বিবর্ণা সীতার ন্যায় শুধু দেখাই যাইতেছে—শোভা পাইতেছে না।

জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে॥ (ঐ—১৬।১৪)

ঋতু-বর্ণনা উপলক্ষে আমরা বাল্মীকির বহু উপমা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; বাল্মীকির যুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গেও আমরা তাঁহার বহু উপমা উদ্ধৃত করিয়াছি: তাহার ভিতর দিয়াই তাঁহার উপমা প্রয়োগের কৃতিত্ব লক্ষিত হইবে। যে স্থানেই কাব্যবর্ণিত বিষয়ের ভিতরে একটা আবেগ বা গাম্ভীর্য আসিয়াছে, সেইখানেই কবির বর্ণনায় উপমার পর উপমা দেখা গিয়াছে। একই বস্তুকে লইয়া বহু উপমা দিবার ভিতরে কবির যেন একটা স্ফূর্তি রহিয়াছে। অযোধ্যা-কাণ্ডে দেখিতে পাই, ভরত রামচন্দ্রকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিবার পরে রামশূন্য এবং দশরথশূন্য অযোধ্যাকে তিনি কিরূপে দেখিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি একসঙ্গে শ্লোকের

পর শ্লোকে শুধু উপমাই দিয়া গিয়াছেন। সেই বর্ণনার মধ্যে কিঞ্চিৎ অতিরেক লক্ষিত হইতে পারে বটে—কিন্তু তাহা চমৎকারিত্ববর্জিত নয়; একাদিক্রমে এইরূপ উপমার প্রয়োগ অবশ্যই লক্ষণীয়।

বিড়ালোলূকচরিতামালীননরবারণাম্।
তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব ॥
রাহুশত্রোঃ প্রিয়াং পত্নীং শ্রিয়া প্রজ্বলিতপ্রভাম্।
গ্রহেণাভ্যুদিতেনৈকাং রোহিণীমিব পীড়িতাম্ ॥
অল্পোষ্ণক্ষুব্ধসলিলাং ঘর্মোত্তপ্তবিহঙ্গমাম্।
লীনমীনঝষগ্রাহাং কৃশাং গিরিনদীমিব ॥
বিধূমামিব হেমাভাং শিখামগ্নেঃ সমুত্থিতাম্।
হবিরভ্যুক্ষিতাং পশ্চাচ্ছিখাং বিপ্রলয়ং গতাম্ ॥
বিধ্বস্তকবচাং রুগ্নগজবাজিরথধ্বজাম্।
হতপ্রবীরামাপন্নাং চমূমিব মহাহবে ॥
সফেনাং সস্বনাং ভূত্বা সাগরস্য সমুত্থিতাম্।
প্রশান্তমারুতোদ্ধূতাং জলোর্মিমিব নিঃস্বনাম্ ॥
ত্যক্তাং যজ্ঞায়ুধৈঃ সর্বৈরভিরূপৈশ্চ যাজকৈঃ।
সুত্যাকালে সুনির্বৃত্তে বেদিং গতরবামিব ॥
গোষ্ঠমধ্যে স্থিতামার্তামচরন্তীং নবং তৃণম্।
গোবৃষেণ পরিত্যক্তাং গবাং পত্নীমিবোৎসুকাম্ ॥
প্রভাকরাদ্যৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ প্রজ্বলদ্ভিরিবোত্তমৈঃ।
বিযুক্তাং মণিভির্জাত্যৈর্নবাং মুক্তাবলীমিব ॥
সহসা চরিতাং স্থানান্মহীং পুণ্যক্ষয়াগতাম্।
সংহৃতদ্যুতিবিস্তারাং তারামিব দিবশ্চ্যুতাম্ ॥
পুষ্পনদ্ধাং বসন্তান্তে মত্তভ্রমরশালিনীম্।
দ্রুতদাবাগ্নিবিপ্লুষ্টাং ক্লান্তাং বনলতামিব ॥
সংমূঢনিগমাং সর্বাং সংক্ষিপ্তবিপণাপণাম্।
প্রচ্ছন্নশশিনক্ষত্রাং দ্যামিবাম্বুধরৈর্বৃতাম্ ॥ ইত্যাদি ॥

(১১৪।২-১৪)

অযোধ্যাকে মনে হইতেছিল একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অপ্রকাশা কালী নিশা—যেখানে নর-গজ প্রভৃতি লুপ্ত—আছে শুধু বিড়াল পেচকের বিচরণ; সে যেন চন্দ্রপ্রিয়া রোহিণী—চন্দ্রের শ্রী দ্বারাই সে প্রভাশালিনী,—কিন্তু চন্দ্র রাহুগ্রস্ত

হইলে সেই পীড়িতা রোহিণীর যে দশা, অযোধ্যারও আজ সেই দশা। অযোধ্যা যেন আজ একটি কৃশা গিরিনিদী—ঈষৎ উত্তাপে ক্ষুব্ধ তাহার বারি—পাখীগুলি দাহতপ্ত—মৎস্য এবং গ্রাহসকল তাপ হেতু জলে লীন। অযোধ্যা যেন যজ্ঞাগ্নি-শিখা—যে শিখা একবার ধূমহীন হেমকান্তি লইয়া ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছিল—কিন্তু আহুতিদানের শেষে বিলয়প্রাপ্তা! অযোধ্যা আজ মহাহবে একটি সেনানীর মত—যে সেনানীর কবচসমূহ বিধ্বস্ত—গজ, অশ্ব, রথ, ধ্বজ প্রভৃতি সবই বিপর্যস্ত—বীরসমূহ হত। অযোধ্যা যেন সাগরের জলোর্মি,—একবার সে ফেনপুঞ্জ লইয়া গভীর নিস্বনে জাগিয়া উঠিয়াছিল—পরে বাতাস থামিয়া যাওয়ায় সে যেন নিস্তব্ধ স্তিমিত রূপ ধারণ করিয়াছে। অযোধ্যা যেন যজ্ঞশেষের একটি যজ্ঞবেদী—যজ্ঞের উপকরণসমূহ কিছুই নাই—উপযুক্ত যাজকও নাই—একটি পরিত্যক্ত বেদী যেন নীরবে পড়িয়া আছে। অযোধ্যা যেন একটি গোষ্ঠমধ্যে স্থিতা আর্ত্তা গাভী—সে গোবৃষ কর্তৃক পরিত্যক্তা—নব তৃণাঙ্কুরে চরিয়া বেড়ায় না—স্থির হইয়া উৎসুকাভাবে দাঁড়াইয়া আছে। অযোধ্যা যেন একটি নব মুক্তাবলী—যাহা হইতে প্রভাবিশিষ্ট সুস্নিগ্ধ এবং রশ্মিবিকীর্ণকারী উত্তম বিশুদ্ধ মণিসকল স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। সে যেন একটি আকাশচ্যুতা তারকা—পৃথিবীর অভিমুখে চলিতে চলিতে সহসা পুণ্যক্ষয়বশতঃ পতিতা—এবং সমস্ত দ্যুতিবিস্তার সংহৃত। সে যেন একটি ক্লান্তা বনলতা—বসন্তের শেষে পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—মত্ত ভ্রমরকুল তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল—কিন্তু দ্রুত দাবাগ্নির দ্বারা সে এখন পরিক্লিষ্টা! অযোধ্যার রাজপথগুলি যেন সংমূঢ়ের ন্যায় পড়িয়া আছে—পণ্যবীথি সমুদায় সংরুদ্ধ— যেন লুপ্ত চন্দ্র-নক্ষত্র মেঘাবৃত আকাশ!

হনুমান সীতার অন্বেষণের জন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া প্রভাতে যে ক্ষীণতেজ পাণ্ডুর চন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিল তাহার বর্ণনায়ও কবি শুধু শ্লোকের পর শ্লোক উপমাই দিয়াছেন (সুন্দর-৫।৩-৭)। ইহার ভিতরে দুই একটি উপমা বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। স্বচ্ছ আকাশে শঙ্খ, ক্ষীর, মৃণালের মতন শুভ্র চন্দ্রটি কখনও উদ্‌গত হইতেছে কখনও অবভাসমান—যেন সরসির নীরে সাঁতার কাটিতেছে একটি শুভ্র হংস।

> শঙ্খপ্রভাক্ষীরমৃণালবর্ণং
> হ্যুদগম্যমানং হ্বভাসমানম্।
> দদর্শ চন্দ্রং স কপিপ্রবীরঃ
> পোপ্লূয়মানং সরসীব হংসম্॥ (সুন্দর-৫।২)[1]

---

(১) তুলনীয়—ততঃ কুমুদষণ্ডাভো নির্মলং নির্মলোদয়ঃ।
প্রজগাম নভশ্চন্দ্রো হংসো নীলমিবোদকম্॥ (সুন্দর—১৭।১

সূর্যোদয়ের পরে ক্ষীণপ্রভ চন্দ্র—

> হংসো যথা রাজতপঞ্জরস্থঃ
> সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ।
> বীরো যথা গর্বিতকুঞ্জরস্থ-
> শ্চন্দ্রোঽপি বভ্রাজ তথাম্বরস্থঃ॥ (সুন্দর-৫।৬)

চন্দ্রের সঙ্গে এই রাজতপঞ্জরস্থ হংস এবং মন্দরকন্দরস্থ আপাণ্ডুর ধূসর সিংহের উপমা কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যের সূচনা করে। লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া হনুমান রাবণের অন্তঃপুরে সুপ্তা যে নারীগণকে দেখিয়াছিল তাহাদের ভিতরে—

> মুক্তাহারবৃতাশ্চান্যাঃ কাশ্চিৎ প্রস্রস্তবাসসঃ।
> ব্যাবিদ্ধরসনাদামাঃ কিশোর্য ইব বাহিতাঃ॥
> অকুণ্ডলধরাশ্চান্যা বিচ্ছিন্না মৃদিতস্রজঃ।
> গজেন্দ্রমৃদিতাঃ ফুল্লা লতা ইব মহাবনে॥
> চন্দ্রাংশুকিরণাভাশ্চ হারাঃ কাসাঞ্চিদুদ্গতাঃ।
> হংসা ইব বভুঃ সুপ্তাঃ স্তনমধ্যেষু যোষিতাম্॥
> অপরাণাং চ বৈদূর্যাঃ কাদম্বা ইব পক্ষিণঃ।
> হেমসূত্রাণি চান্যাসাং চক্রবাকা ইবাভবন্॥ (সু—৯।৪৬-৪৯)

কোন কোন রমণীর মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাহারও কাহারও স্তনবাস, কাহারও মেখলা বিক্ষিপ্ত;—তাহাদিগকে মনে হইতেছে, অতি ভারবহনে শ্রান্ত পথিপার্শ্বে কিশোরী গবাদির মত। কাহারও কুণ্ডল খুলিয়া গিয়াছে, দলিত মালা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে,—যেন মহাবনে গজেন্দ্র-দলিতা লতা; কাহারও বুকের ভিতরে চন্দ্রাংশুকিরণহার,—যেন স্তনমধ্যে সুপ্ত হাঁসগুলি,—কাহারও বুকের কাছে বৈদূর্যমণি—যেন জলের বেলে হাঁস,—কাহারও বুকের কাছে হেমসূত্র—যেন চক্রবাকগুলি। এমনি করিয়াই চলিতে লাগিল কবির বর্ণনা। তাহার পরে গিয়া হনুমান্ ধৃতৈকবেণী ধ্যানশোকপরায়ণা সীতাকে দেখিতে পাইল, তখন সীতাকে দেখা গেল—

> ক্ষীণামিব মহাকীর্তিং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্।
> প্রজ্ঞামিব পরিক্ষীণামাশাং প্রতিহতামিব॥
> আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
> দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহৃতামিব॥

পৌর্ণমাসীমিব নিশাং তমোগ্রস্তেন্দুমণ্ডলাম্।
পদ্মিনীমিব বিধ্বস্তাং হতশূরাং চমূমিব ॥
প্রভামিব তমোধ্বস্তামুপক্ষীণামিবাপগাম্।
বেদীমিব পরামৃষ্টাং শান্তামগ্নিশিখামিব ॥

* * *

একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥

(সুন্দর—১৯।১১—১৪, ১৯)

'সীতা যেন ক্ষীণ হইয়া যাওয়া মহাকীর্তি, যেন অবমানিত শ্রদ্ধা, পরিক্ষীণ প্রজ্ঞা, প্রতিহত আশা, বিধ্বস্ত সম্পদ্, প্রতিহত আজ্ঞা, উৎপাতকালে দীপ্ত দিক্, অপহত পূজা ; সে যেন চন্দ্রমণ্ডল তমসাবৃত হইলে পূর্ণিমা রজনী, যেন বিধ্বস্ত পদ্মিনী, যেন হতশূর চমূ (অর্থাৎ সেনাপতি হত হইয়াছে এমন সেনা), তমোধ্বস্ত প্রভা, উপক্ষীণ স্রোতস্বতী, অপবিত্রীকৃত যজ্ঞবেদী, নিবিয়া যাওয়া অগ্নির শিখা।…একটি দীর্ঘ বেণী ধারণ করিয়া অযত্নেই সে শোভা পাইতেছিল—যেমন মেঘ অপসৃত হইলে (শরৎকালে) অযত্নরক্ষিত নীলবনরাজি-শোভিত পৃথিবী।' অন্যত্রও দেখিতে পাই, নিবিড় শোকজালের অন্তরালে ভূমিপতিতা দীপ্তিময়ী তপস্বিনী সীতা ধূম্রজালে আবৃত অগ্নিশিখার মত,—সে যেন সন্দিগ্ধ স্মৃতি, নিপতিত ঋদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা, সোপসর্গ সিদ্ধি, সকলুষ বুদ্ধি, অলীক অপবাদে নিপতিত কীর্তি।[১]

হনুমান্ সীতার বার্তা লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিবার জন্য সাগর-লঙ্ঘন মানসে যখন উত্তুঙ্গ পর্বত-শিখরে আরোহণ করিল, তখনকার সেই পর্বতের বর্ণনাটিও সার্থক উপমাপ্রাচুর্যে চমৎকার হইয়াছে।—

১। শোকজালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্।
সংসক্তাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥
তাং স্মৃতিমিব সন্দিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব।
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব ॥
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুষামিব।
অভূতেনাপবাদেন কীর্তিং নিপতিতামিব ॥
(সুন্দর—১৫।৩২-৩৪) ; আরও (সুন্দর—১৭।১৯-২১)

তুলনীয় দশরথের বর্ণনা—উপরক্তমিবাদিত্যং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্।
তড়াগমিব নিস্তোয়ং সোঽপশ্যজ্জগতীপতিম্ ॥ (অযো—৩৪।৩)

কৈকেয়ীর বর্ণনা—লতামিব বিনিকৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব। ইত্যাদি।
(অযো—১০।২৪-২৬)

সোত্তরীয়মিবাম্ভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিলম্বিভিঃ।
বোধ্যমানমিব প্রীত্যা দিবাকরকরৈঃ শুভৈঃ॥
উন্মিষন্তমিবোদ্ধূতৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ।
তোয়ৌঘনিঃস্বনৈর্মন্দ্রৈঃ প্রাধীতমিব সর্বতঃ।
প্রগীতমিব বিস্পষ্টং নানাপ্রস্রবণস্বনৈঃ।
দেবদারুভিরত্যুদ্ধৈরূর্ধ্ববাহুমিব স্থিতম্॥
প্রপাতজলনির্ঘোষৈঃ প্রাক্রুষ্টমিব সর্বতঃ।
বেপমানমিব শ্যামৈঃ কম্পমানৈঃ শরদ্বনৈঃ॥

নীহারকৃতগম্ভীরৈর্ধ্যায়ন্তমিব গহ্বরৈঃ।
মেঘপাদনিভৈঃ পাদৈঃ প্রক্রান্তমিব সর্বতঃ॥
জৃম্ভমাণমিবাকাশে শিখরৈরভ্রমালিভিঃ।
কূটৈশ্চ বহুধাকীর্ণং শোভিতং বহুকন্দরৈঃ॥

(সুন্দর—৫৬।২৭-৩০, ৩২-৩৩)

শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিলম্বিত শুভ্রবর্ণের মেঘগুলিই সে পর্বতের শুভ্র উত্তরীয়,—দিবাকরের শুভ্র কররাশির দ্বারা সম্যক্ প্রকাশিত হওয়ায় গিরি যেন সেই কররাশি দ্বারা প্রীতিপূর্বক বোধ্যমান বলিয়া মনে হইতে লাগিল; শিখরস্থ ধাতুরাশির বিস্তৃত নয়নের দ্বারা যেন পর্বত নিমেষ ফেলিতেছিল,—সম্মুখস্থ সমুদ্রের নিস্বনের দ্বারা যেন সে বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছিল; নানা প্রস্রবণের স্বরে সে যেন অস্ফুট গান ধরিয়াছিল,—আর দীর্ঘ দেবদারুর বাহু তুলিয়া সে যেন ঊর্ধ্ববাহু তপস্বীর ন্যায় বসিয়াছিল; জলপ্রপাতধ্বনিতে সে যেন চারিদিকে রোষ প্রকাশ করিতেছিল,—কম্পমান শ্যাম শরদ্বনের দ্বারা সে যেন কম্পমান; নীহারের দ্বারা গহ্বরগুলি গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে—সেখানে মনে হয় পর্বত ধ্যানস্থ;—মেঘের চরণে যেন গিরি পদসঞ্চরণ করে, অভ্রমালী শৃঙ্গের দ্বারা যেন আকাশে হাই তোলে।

ইহার পরে হনুমান্ যখন আকাশে লম্ফ দিল তখন সেই 'গগনার্ণবে'রও

একটি সাঙ্গরূপক বর্ণনা রহিয়াছে।[১] অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে আগত ভরতের দুঃখসন্তপ্ত দেহের রৌদ্রতপ্ত হিমালয়ের সহিত চমৎকার একটি উপমা দেখিতে পাই—

প্রস্রুতঃ সর্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবম্।
যথা সূর্যাগ্নিসন্তপ্তো হিমবান্ প্রস্রুতো হিমম্॥
ধ্যাননির্দরশৈলেন বিনিশ্বসিতধাতুনা।
দৈন্যপাদপসঙ্ঘেন শোকায়াসাধিশৃঙ্গিণা॥
প্রমোহানন্তসত্ত্বেন সন্তাপৌষধিবেণুনা।
আক্রান্তো দুঃখশৈলেন মজ্জতা কেকয়ীসুতঃ॥
(অযো—৮৫।১৮-২০)

সূর্যাগ্নিসন্তপ্ত হিমবান্ হইতে যেমন গলিত তুষারধারা প্রবাহিত হয় শোকাগ্নিসন্তপ্ত ভরতের দেহ হইতে তেমনই স্বেদপ্রবাহ দেখা দিল। রামচিন্তাই যেন প্রস্তর—দীর্ঘশ্বাসগুলিই যেন ধাতুস্রব, দৈন্যভাবই পাদপসমষ্ট শোক ও আয়াসই উচ্চ শৃঙ্গ স্বরূপ, প্রমোহই অনন্ত প্রাণিগণ সদৃশ, সন্তাপই ওষধি ও বেণু স্বরূপ। লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধভূমির নদীরূপে একটি সাঙ্গরূপক বর্ণনা আছে (৫৮।২৯-৩৩)। এই জাতীয় সাঙ্গরূপক বর্ণনা রামায়ণের ভিতরে আরও পাওয়া যায়।[২]

বাল্মীকিও বহুল ভাবে উপমা ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেই ব্যবহারের ভিতর কবির যথেষ্ট রসজ্ঞান শিল্পনৈপুণ্য উভয়েরই পরিচয় আছে; কিন্তু শুধু এই বলিয়াই যে আমরা কালিদাসের উপমা-প্রযোগ-প্রতিভায় বাল্মীকির প্রভাবের সম্ভাবনা অনুমান করিতেছি তাহা নহে; কালিদাসের কতগুলি প্রসিদ্ধ উপমা আমাদিগকে স্পষ্টতঃই বাল্মীকির উপমা স্মরণ করাইয়া দেয়। কালিদাস আকাশগামী শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র সারস-মালাকে অস্তস্ত তোরণমালার সহিত তুলনা করিয়াছেন,—

---

(১) আপ্লুত্য চ মহাবেগঃ পক্ষবানিব পর্বত।
ভুজঙ্গযক্ষগন্ধর্বপ্রবুদ্ধকমলোৎপলম্॥
সচন্দ্রকুমুদং রম্যং সার্ককারণ্ডবং শুভম্।
তিষ্যশ্রবণকাদম্বমভ্রশৈবলশাদ্বলম্।
পুনর্বসুমহামীনং লোহিতাঙ্গং মহাগ্রহম্॥
ঐরাবতমহাদ্বীপং স্বাতীহংসবিলাসিতম্॥
বাতসঙ্ঘাতজালোর্মিচন্দ্রাংশুশিশিরাম্বুমৎ।
হনুমানপরিশ্রান্তঃ পুপ্লুবে গগনার্ণবম্॥ (সুন্দর—৫৭।১-৪)

(২) তুলনীয়—অযোধ্যা—৫৯।২৮-৩১

শ্রেণীবন্ধাদ্ বিতন্বদ্‌ভিরস্তম্ভাং তোরণ-স্রজম্।
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ কচিদুন্নমিতাননৌ॥ (রঘু—১।৪১)

বাল্মীকির রামায়ণে দেখিতে পাই ;—

মেঘাভিকামা পরিসংপতন্তী
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপংক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী
লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্য॥ (কি-২৮।২৩)

'বর্ষাগমে মেঘাভিলাষী আকাশে-সঞ্চরমাণ বলাকাশ্রেণী অতি সম্মোদিত হইয়া শোভা পাইতেছে,—যেন বাতাসের দ্বারা কম্পিত আকাশের লম্বমান্ শ্রেষ্ঠ শ্বেতপদ্মের মালা।' শরৎ-বর্ণনা স্থলেও দেখিতে পাই—

বিপক্কশালিপ্রসবানি ভুক্ত্বা
প্রহর্ষিতা সারসচারুপংক্তিঃ।
নভঃ সমাক্রামতি শীঘ্রবেগা
বাতাবধূতা গ্রথিতেব মালা॥ (৩০।৪৭)

'বিপক্কশালিধান্য আহার করিয়া প্রহৃষ্ট সারসের চারু পংক্তিগুলি শীঘ্রবেগে আকাশে ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন বাতাসে বিধূনিত গ্রথিত (শ্বেত পুষ্পের) মালা।'

কালিদাসেব ভিতর দেখিতে পাই, পূতচরিত্রসম্পন্না নারীকে তিনি বহুস্থানে যজ্ঞের হবি রূপে বর্ণনা করিযাছেন। কালিদাস প্রায়ই দেশকাল-পাত্রের সহিত একটা গভীর ঔচিত্য রক্ষা করিবার জন্যই এই উপমাটি ব্যবহার করিতেন। 'দেবতাত্মা' নগাধিরাজ হিমালয় তাঁহার কন্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

ঋতে কৃশানোর্নহি মন্ত্রপূত-
মর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্॥ (কুঃ সঃ ১।৫১)

মন্ত্রপূত হবি যেমন কখনও অগ্নিব্যতীত অন্য কোন তেজোবস্তুতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না, উমাও সেইরূপ মহাদেব ব্যতীত আর কাহারও নিকটে অর্পিতা হইতে পারে না।

শকুন্তলা নাটকেও দেখিতে পাই, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া আকাশবাণীতে দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার প্রণয়-কাহিনী জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—'ধূমাউলিঅদিট্‌ঠিণো বি জজমাণস্স পাবএ আহুই পড়িদা'—যজ্ঞীয় ধূমের দ্বারা আকুলিতদৃষ্টি যাজ্ঞিকের ঘৃতাহুতিও অগ্নিতেই পড়িয়াছে।

রামায়ণের ভিতরেও দেখিতে পাই, সতীত্বের মহিমায় দীপ্ত সীতা যেদিন চরিত্রের পরীক্ষার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সকলে তাহাকে যজ্ঞের অগ্নিতে অর্পিত মন্ত্রপূত হবির ন্যায়ই দেখিয়াছিলেন—

দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্বা যজ্ঞে পূর্ণাহুতীমিব ॥
প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তাং দৃষ্ট্বা হব্যবাহনে।
পতন্তীং সংস্কৃতাং মন্ত্রৈর্বসোর্ধারামিবাধ্বরে ॥

(লঙ্কা-১১৮।৩১-৩২)

সীতার বিবাহের সময়ও জনকরাজা বলিয়াছেন,—

কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ ॥ (বাল-৭৩।১৫)

'হে মুনিশ্রেষ্ঠ, বিবাহের যথাবিধি মাঙ্গল্য অনুষ্ঠানের পর বেদিমূলে সমাগতা আমার কন্যাগণ অগ্নির শিখার ন্যায়ই দীপ্তা।'[১]

কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, রাজা দিলীপ সারাদিন ধেনুকে বনে চরাইয়া দিনান্তে যখন আশ্রমে ফিরিতেছিল, তখন রাজপত্নী সুদক্ষিণা উপোষিত অনিমেষ নয়নের দ্বারা দিলীপের রূপ পান করিতেছিল।—

পপৌ নিমেষালস-পক্ষ্ম-পংক্তি-
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্ ॥ (২।১৯)

রামায়ণে দেখিতে পাই, কুশ এবং লব দুই ভাই যখন রামায়ণ গান করিবার জন্য রামের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল তখন—

হৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তিস্ম মুহুর্মুহুঃ ॥ (উত্তর-৯৪।১২)

'হৃষ্ট মুনিগণ এবং মহাবল রাজগণ সকলে চক্ষুদ্বারা পান করিবার মত বার বার তাহাদিগকে দেখিতেছিল।' রামচন্দ্র যখন বনে গমন করিতেছিল তখন প্রজাগণও সকলে—

অবেক্ষমাণঃ সস্নেহং চক্ষুষা প্রপিবন্নিব।
উবাচ রামঃ সস্নেহং তাঃ প্রজাঃ স্বাঃ প্রজা ইব ॥ (অযো-৪৫।৫)

'রামচন্দ্রকে প্রজাগণ যখন চক্ষুদ্বারা পান করিবার মতই সস্নেহে তাকাইয়া

---

(১) তুঃ—ন সা ধর্ষয়িতুং শক্যা মৈথিল্যোজস্বিনঃ প্রিয়া।
দীপ্তস্যেব হুতাশস্য শিখা সীতা সুমধ্যমা ॥ (আরণ্য—৩৭।২০)

দেখিতেছিল, তখন রামচন্দ্রও সস্নেহে স্বপ্রজাতুল্য (নিজের সন্তানের তুল্য) প্রজাগণকে এই কথা বলিয়াছিল।' বাল্মীকির মধ্যে অবশ্য শুধু চক্ষু দ্বারা পানের কথাই পাই না, রোষকষায়িত 'চক্ষু দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতে' এরূপ বর্ণনাও পাই—'চক্ষুষা নির্দহন্নিব' (কি—৩১।৪৯)।

ভূষণ-বিরহিতা বিষণ্ণ নারীর সহিত নক্ষত্রহীন তমসাবৃত রজনীর তুলনা বাল্মীকি বহু স্থানে করিয়াছেন। অযোধ্যাকাণ্ডে বিমনা কৈকেয়ীর বর্ণনায় দেখিতে পাই—

উদীর্ণসংরম্ভতমোবৃতাননা
তদাবমুক্তোত্তমমাল্যভূষণা।
নরেন্দ্রপত্নী বিমনা বভূব সা
তমোবৃতা দ্যৌরিব মগ্নতারকা॥[১] (অযোধ্যা—৯।৬৬)

ইহারই সমজাতীয় একটি উপমায় অভিনব অর্থ এবং মহিমার সঞ্চার করিযাছেন কালিদাস তাঁহার 'রঘুবংশে' আসন্নপ্রসবা সুদক্ষিণার বর্ণনায়।—

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী॥ (৩।২)

রাণীব দেহ কিঞ্চিৎ কৃশ হইয়া গিয়াছে, তাই আর সমগ্র ভূষণ দেহে রাখিতে পারিতেছেন না,—মুখখানিও লোধ্রকুসুমের ন্যায় পাণ্ডুতা অবলম্বন করিয়াছে;—দেখিতে মনে হইতেছে, যেন অল্পপ্রকাশিত চন্দ্রমার সহিত লুপ্ততারকা প্রভাতকল্পা যামিনী।

রামায়ণে দেখিতে পাই, রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় তখন হেমবর্ণা সীতা নীলাঙ্গ রাবণের পার্শ্বে নীলবর্ণ গজের দেহে স্বর্ণকাঞ্চীর মত শোভা পাইতেছিল।—

সা হেমবর্ণা নীলাঙ্গং মৈথিলী রাক্ষসাধিপম্।
শুশুভে কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা॥ (আরণ্য—৫২।২৩)

সমজাতীয় একটি উপমায় কলিদাস আরও রসমাধুর্য এবং সৌকুমার্য দেখাইয়াছেন 'কুমারসম্ভবের' তৃতীয়সর্গে যেখানে তিনি পিতা হিমালয়ের

---

(১) তুঃ—পাণ্ডুরাভ্রমিবাকাশম্—(অযোধ্যা-১০।১১)

ধূসর কর্কশ বুকে ভয়-সঙ্কুচিতা উমার বর্ণনা করিয়াছেন সুরগজের দন্তলগ্না পদ্মিনীরূপে।

চন্দ্রোদয় এবং উদ্বেল সমুদ্র লইয়া বাল্মীকি বহু উপমা দিয়াছেন। রামের অভিষেকের বর্ণনা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র পিতা দশরথের কাছে গমন করিলে বাহিরে প্রজাগণ উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল—যেমন করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে সমুদ্র চন্দ্রের উদয়ের জন্য।—

> তস্মিন্ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা
> জনঃ স সর্বো মুদিতো নৃপাত্মজে।
> প্রতীক্ষতে তস্য পুনঃ স্ম নির্গমং
> যথোদয়ং চন্দ্রমসঃ সরিৎপতিঃ॥ (অ-১৭।২২)

বহুস্থানেই পর্বদিনের সমুদ্র (সমুদ্র ইব পর্বণি) বাল্মীকির একটি অতি প্রিয় উপমা। সূর্যোদয়ে সমুদ্রের আনন্দের কথাও দুই এক স্থানে দেখিতে পাই।[১] চন্দ্রোদয়ে উদ্বেল সমুদ্র কালিদাসেরও একটি অতি প্রিয় উপমা—এবং এই উপমার চমৎকারিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে উমার সান্নিধ্যে শিবের চিত্তচাঞ্চল্য বর্ণনার সেই প্রসিদ্ধ উপমায়—

> হরস্তু কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য-
> শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
> উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
> ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥ (৩।৬৭)

'চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে জলরাশির ন্যায় মহাদেবও কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য হইয়া উমার বিম্বফলের ন্যায় অধর-ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।'

নদীকে নানাভাবে নারীর সহিত উপমা দেওয়া কালিদাসের বর্ণনার একটা অতি লক্ষণীয় রীতি। আমরা ইতিপূর্বে নানাপ্রসঙ্গে কালিদাসের এই-জাতীয় বহু বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি। বর্ষার নদী বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস বলিয়াছেন,—

> নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্
> প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্মলৈঃ।

---

(১) যথা নন্দতি তেজস্বী সাগরো ভাস্করোদয়ে।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তথা নন্দয় নস্ততঃ॥ (অযোধ্যা—১৪।৫৭)

স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ
প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্ ॥ (ঋঃ সঃ ২।৭)

'চারিদিকের তটতরুগুলি অধঃপাতিত করিয়া আবিল জলের দ্বারা প্রবৃদ্ধবেগ হইয়া সুদুষ্টা স্ত্রীগণের ন্যায় বিভ্রম সহকারে নদীগুলি তাড়াতাড়ি সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে।'

'মেঘদূতে'র ভিতরে কালিদাস নদীর যত বর্ণনা দিয়াছেন সকলই নারীর উপমায়, কারণ, তাহারা প্রায় সকলেই মেঘের নায়িকারূপেই কল্পিত হইয়াছে। বেত্রবতী নদীর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥ (পূ—২৪)

'বেত্রবতী নদীর সভ্রূভঙ্গ মুখের ন্যায় চঞ্চল উর্মি সমন্বিত সুমধুর জল তীরের নিকট গিয়া গর্জন সহকারে পান করিবে।'

তারপরে নির্বিন্ধ্যা—

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ। (পূ—২৮)

বীচিক্ষোভহেতু শব্দায়মান বিহগশ্রেণীই তাহার কাঞ্চীদাম, আর আবর্তই তাহার নাভি। এই নির্বিন্ধ্যা 'মেঘবিরহিণী; তাহার ক্ষীণজলধারাই তাহার একবেণী,—তটতরুর জীর্ণ পত্রেই তাহার বিরহের পাণ্ডুচ্ছায়া।—

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥ (২৯)

তাহার পরে গম্ভীরা নদী,—

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যাৎ
মোঘীকর্তুং চটুলসফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ (পূ-৪০)

এই গম্ভীরা নদীর নির্মল জল যেন ধীরা নায়িকার প্রসন্নচিত্ত; চটুল সফরীর উদ্বর্তনই এই গম্ভীরার কুমুদশুভ্র চাহনি।

এমনি করিয়াই নদীগুলির বর্ণনা করিয়াছেন কালিদাস। শুধু যে নদীর বর্ণনাই নারীর উপমায় করিয়াছেন তাহা নহে, নারীর বর্ণনাও বহুস্থানে করিয়াছেন নদীর উপমায়। বাল্মীকির রামায়ণেও এই-জাতীয় বর্ণনা এবং উপমার প্রাচুর্য দেখিতে পাই। আমরা ঋতু-বর্ণনা প্রসঙ্গে বাল্মীকির যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার ভিতরে এ-জাতীয় উপমা বহু পাওয়া যায়। করয়া বিশেষ বাল্মীকির শরৎ-বর্ণনা এ-জাতীয় উপমায় ভরা। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই রামচন্দ্র বনে যে সকল নদী দেখিয়াছিলেন তাহাদের ভিতরে

জলাঘাতাট্টহাসোগ্রাং ফেননির্মলহাসিনীম্।
ক্বচিদ্বেণীকৃতজলাং ক্বচিদাবর্তশোভিতাম্॥
ক্বচিৎ স্তিমিতগম্ভীরাং ক্বচিদ্বেগসমাকুলাম্।
ক্বচিদ্ গম্ভীরনির্ঘোষাং ক্বচিদ্‌ভৈরবনিস্বনাম্॥

* * *

ক্বচিত্তীররুহৈর্বৃক্ষৈর্মালাভিরিব শোভিতাম্।
ক্বচিৎ ফুল্লোৎপলচ্ছন্নাং ক্বচিৎ পদ্মবনাকুলাম্॥
ক্বচিৎ কুমুদখণ্ডৈশ্চ কুট্মলৈরুপশোভিতাম্।
নানাপুষ্পরজোধ্বস্তাং সমদামিব চ ক্বচিৎ॥

(অযোধ্যা—৫০।১৬-১৭, ২০-২১)

কোনটি জলাঘাতের অট্টহাসিতে উগ্রা রমণীর ন্যায়, কোনটি ফেননির্মলহাসিনী, —কোথাও বেণীকৃতজলা, কোথাও আবর্তশোভিনী ; কোথাও স্তিমিতগম্ভীরা কোথাও বেগসমাকুলা, কোথাও গম্ভীর-নির্ঘোষা—কোথাও ভৈরবনিস্বনা।··· কোথাও তীরতরুর মালা দ্বারা শোভিতা, কোথাও প্রফুল্ল উৎপলে আচ্ছন্না, কোথাও পদ্মবনাকুলা ; কোথাও কুমুদখণ্ড এবং স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পকলিশোভিত, কোথাও নানাপুষ্পরজোধ্বস্তা সমদা নারীর ন্যায়।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দেখি রামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিকট পার্বত্য নদীর বর্ণনা করিতেছে—

তীরজৈঃ শোভিতা ভাতি নানারূপৈস্ততস্ততঃ।
বসনাভরণোপেতা প্রমদেবাভ্যলঙ্কৃতা॥
শতশঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ নানানাদবিনাদিতা।
একৈকমনুরক্তৈশ্চ চক্রবাকৈরলঙ্কৃতা॥
পুলিনৈরতিরম্যৈশ্চ হংসসারসসেবিতা।
প্রহসন্ত্যেব ভাত্যেষা নানারত্নসমন্বিতা॥

কচিন্নীলোৎপলৈশ্ছন্না ভাতি রক্তোৎপলৈঃ কচিৎ।
কচিদাভাতি শুক্লৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদকুট্মলৈঃ ॥
পারিপ্লবশতৈর্জুষ্টা বর্হিক্রৌঞ্চবিনাদিতা।
রমণীয়া নদী সৌম্যা মুনিসঙ্ঘনিষেবিতা ॥ (২৭।১৯-২৩)

পার্বত্য নদীগুলির তীরে তীরে নানা বর্ণের নানা রকমের গাছ—এই বিবিধ তরুরাজি-বিভূষিতা নদীগুলি যেন বিবিধ বসনে এবং অলঙ্কারে ভূষিতা প্রমদা। শত শত পক্ষিসঙ্ঘের নাদে এগুলি বিনাদিতা—পরস্পর অনুরক্ত চক্রবাকের দ্বারা অলঙ্কৃতা; অতি রম্য ইহাদের পুলিনদেশ—তাহাতে হংস সারসের মেলা (এই পুলিনই যেন জঘন দেশ—হংস-সারস-মালাই মেখলা)—নানারত্নসমন্বিতা ইহারা যেন হাসিযা চলিতেছে। কোথাও নীল উৎপলে আচ্ছন্না, কোথাও রক্তোৎপলে সজ্জিতা—কোথাও দিব্য শুভ্র কুমুদমুকুলে সুশোভিতা—কোথাও শতচাঞ্চল্যযুক্ত ময়ূর ক্রৌঞ্চরবে বিনাদিতা—মুনিসঙ্গ-সেবিতা সৌম্যা এই নদীগুলি নারীগণের ন্যাযই রমণীযা।

অন্যত্র দেখি—

নদ্যঃ সমুদ্বাহিতচক্রবাকা-
স্তটানি শীর্ণান্যপবাহয়িত্বা।
দৃপ্তা নবপ্রাবৃতপূর্ণভোগা-
দ্রুতং স্বভর্তারমুপোপয়ন্তি ॥ (ঐ-২৮।৩৯)

উপমাটি অতিশয় ব্যঞ্জনাগর্ভ। নব তৃণাচ্ছাদিত নব নব পার্বত্যঅরণ্যদেশ যেন নদীগুলির নবপ্রিয—পূর্ণভোগের কামনায় তাহাদের প্রতি নদীগুলির গভীর আকর্ষণ, নদীগুলি নবযুবতী—'সমুদ্বাহিতচক্রবাকা' কথার মধ্যে তাহাদের উন্নত স্তনমণ্ডলের আভাস; যাইবার পথে তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে শীর্ণ তটগুলির দ্বারা—যাহারা জীর্ণ বৃদ্ধের মতন—অতএব তাহাদিগকে নদীগুলি উদ্ধত অবজ্ঞায় উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

নদী পুলিনের সহিত নারী-নিতম্বের উপমা বাল্মীকি (দ্রঃ—কি ৩০।৫৮, সুন্দর—৯।৫১) এবং কালিদাস উভয়ের ভিতরেই পাওয়া যায়। কালিদাস ইহা লইয়াই একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন মেঘদূতে—

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্। (৪১

কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, তাড়কা রাক্ষসীর বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

জ্যানিনাদমথ গৃহ্নতী তয়োঃ
প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ।
তাডকা চলকপালকুণ্ডলা
কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী॥ (১১।১৫)

'তারপরে কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রিব ন্যায় তাডকা তাহাদের জ্যানিস্বন শুনিতে পাইয়া কপালকুণ্ডল দোলাইযা বকপংক্তি-শোভিত ঘনকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় আবির্ভূতা হইল।'

রামায়ণে দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবের কণ্ঠে শুভ্রকুসুমযুক্ত গজপুষ্পী লতা পরাইযা দিল, তখন—

স তযা শুশুভে শ্রীমান্ লতয়া কণ্ঠসক্তযা।
মালযেব বলাকানাং সসন্ধ্য ইব তোযদঃ॥ (কি—১২।৪১)

সেই শুভ্রফুলের লতাকণ্ঠে সুগ্রীব বলাকার মালাযুক্ত সন্ধ্যাকালের মেঘেব ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ক্রুদ্ধ বাবণের বর্ণনাতেও এই উপমাটি দেখিতে পাই,—

কামগং রথমাস্থায় শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ।
বিদ্যুন্মণ্ডলবান্ মেঘঃ সবলাক ইবাম্বরে॥ (আরণ্য—৩৫।১০)

কালিদাসের মেঘদূতে অলকাপুরীর বর্ণনায় দেখিতে পাই—

তস্যোৎসঙ্গে প্রণযিন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাম্—(পূ-৬৩)

কৈলাস শিখরের কোলে অলকা যেন প্রণযিনী এবং স্রস্ত গঙ্গা তাহার স্রস্ত দুকূলবসন। বাল্মীকির ভিতবে দেখিতে পাই, পর্বত হইতে নিপতিত নদীকে তিনি প্রিয়ের অঙ্ক হইতে পতিতা প্রিযার সহিত তুলনা করিযাছেন এবং তাহার জলধারা ভূমিপতিত বৃক্ষের সহিত মিলিত হওযায় মনে হইতেছিল, ক্রুদ্ধা প্রমদা যেন প্রিয়বন্ধুদ্বারা বার্যমাণা।—

দদর্শ চ নগাৎ তস্মান্নদীং নিপতিতাং কপিঃ।
অঙ্কাদিব সমুৎপত্য প্রিয়স্য পতিতাং প্রিয়াম্॥
জলেনিপতিতাগ্রৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
বার্যমাণামিব ক্রুদ্ধাং প্রমদাং প্রিয়বন্ধুভিঃ॥ (সুন্দর ১৪।২৯-৩০)

কালিদাস কিংশুক পুষ্পকে বসন্তসম্ভুক্তা বনভূমির নখক্ষত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (কুমারসম্ভব, ৩।২৯ ; তুঃ রঘুবংশ ৯।৩১) ; বাল্মীকি বাতাস কর্তৃক মর্দিত বনের বৃক্ষগুলিকে সম্ভুক্তা রমণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (সুন্দর—১৪।১৫-১৮)। কালিদাস সমুদ্রের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, এই সমুদ্র হইতেই সূর্যরশ্মিসমূহ গর্ভ ধারণ করে,—'গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাৎ' (রঘু ১৩।৪) বাল্মীকি বলিয়াছেন যে ঘনরাজি সমুদ্র হইতে গর্ভধারণ করে (উত্তর—৪।২৩)। কালিদাস 'রঘুবংশে' বলিয়াছেন, 'ভোগীব মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্যঃ' (২।৩২); বাল্মীকির মধ্যে পাই 'চেষ্টমানামথাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব' (সু—১৯।৯)। কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন—

স কীচকৈর্মারুতপূর্ণরন্ধ্রৈঃ
কূজদ্ভিরাপাদিতং বংশকৃত্যম্।
শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ সমুচ্চৈ-
রুদ্গীয়মানং বনদেবতাভিঃ॥ (রঘুবংশ, ২।১২)

মহারাজ দিলীপ বেণুবংশসমূহের রন্ধ্রপ্রবিষ্ট বায়ুশব্দে বংশীবাদন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে থাকিলে কুঞ্জে বনদেবতাগণ কর্তৃক উচ্চে গীয়মান স্বীয় যশ (যশোগান) শুনিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে দেখি—

বেপমানমিব শ্যামৈঃ কম্পমানৈঃ শরদ্বনৈঃ।
বেণুভির্মারুতোদ্ধতৈঃ কূজন্তমিব কীচকৈঃ॥ (সুন্দর-৫৬।৩০)

কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখি পাটল-বর্ণা গাভীর উপরে কেশরী ঠিক যেন ধাতুময়ী অধিত্যকায় প্রফুল্ল লোধ্রদ্রুম।—

স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং
ধনুর্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ।
অধিত্যকায়ামিব ধাতুমষ্যাং
লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্॥ (২।২৯)

ইহার অনুরূপ বর্ণনা রামায়ণে দেখিতে পাই—

লোধ্রাশ্চ গিরিপৃষ্ঠেষু সিংহকেশরপিঞ্জরাঃ॥ (কি-১।৭৬)

'রঘুবংশে' রাজা দিলীপের বর্ণনায় দেখি,—

আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ॥ (১।১৩)

দিলীপের আত্মকর্মক্ষম দেহ,—যেন দেহবদ্ধ ক্ষাত্রধর্ম। রামায়ণে রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত ভরতের বর্ণনায় দেখি—

তং ধর্মমিব ধর্মজ্ঞং দেহবন্ধমিবাপরম্ ॥ (লঙ্কা—১২৭।৩৫)

রামচন্দ্রের পাদুকাধারী ভরত নিজেই যেন দেহবদ্ধ ধর্ম।

কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখিতে, পাই, রামচন্দ্র যখন সীতাকে পুনরুদ্ধার করিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিল তখন আনন্দোৎসবে সমগ্র অযোধ্যা নগবী ভরিয়া উঠিল। তখন—

প্রাসাদকালাগুরুধূমবাজি-
স্তস্যাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না।
বনান্নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন
মুক্তা স্বযং বেণিরিবাবভাসে ॥ (১৪।১২)

সেই অযোধ্যাপুরীব প্রাসাদ হইতে উত্থিত কৃষ্ণ অগুরুর ধূমরাশি বায়ুবশে ভিন্ন হইয়া যাইতেছিল ; মনে হইতেছিল, বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রঘুত্তম রাম যেন স্বয়ং বিরহিণী একবেণী-ধরা অযোধ্যা সুন্দরীব কালবেণী মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। উপমাটির ব্যঞ্জনা নিহিত আছে বাল্মীকির একটি উপমায়, যেখানে ভরত রামচন্দ্রকে অযোধ্যা ফিরিয়া যাইবার অনুবোধ করিয়া বলিতেছে—

সমৃদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাত্মানমভিষেচয় ;
একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে ॥ (অযোধ্যা-১০৮।৮)

'সমৃদ্ধ অযোধ্যায় তুমি নিজেকে (বাজপদে) অভিষিক্ত কর, একবেণী-ধরা সেই নগরী তোমার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে।'

কালিদাস দুই উচ্চভূমির মধ্যে প্রবাহিত নদীকে স্থানে স্থানে নারীর কণ্ঠে শোভিত মুক্তামালার সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'মেঘদূতে' চর্মন্বতীর বর্ণনায় দেখি—'একং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্' (৪৬)। 'রঘুবংশে' মন্দাকিনীব বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা
সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে
মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ ॥ (১৩।৪৮)

নগোপকণ্ঠে নদীধারার এই মুক্তাবলীরূপে বর্ণনার একটা বিশেষ সার্থকতা

আছে। দুই পর্বতশিখরের সহিত নারীর স্তনের উপমা সহিত মিলিত হইয়া নদীর এই মুক্তামালার উপমা পূর্ণতা লাভ করে। এই জন্যই নারীর বক্ষের হারের সহিত দুই শিখরলগ্ন স্রোতস্বতীর উপমাও স্বাভাবিক ভাবেই আসে। তাহারও আভাস আছে কালিদাসের উপমায়। যেমন, 'ঋতুসংহারে'র গ্রীষ্ম-বর্ণনায়—

পয়োধরাশ্চন্দনপঙ্কচর্চিতা-
স্তুষার গৌরার্পিতহার-শেখরাঃ।

বাল্মীকির রামায়ণেও সমজাতীয় উপমা অনেক পাওয়া যায়। সীতার স্তনান্তরভ্রষ্ট চন্দ্রকান্তিহারকে বলা হইয়াছে 'গগনচ্যুতা গঙ্গা'।—

তস্যাঃ স্তনান্তরাদ্‌ভ্রষ্টো হারস্তারাধিপদ্যুতিঃ।
বৈদেহ্যা নিপতন্ ভাতি গঙ্গেব গগনচ্যুতা॥ (আরণ্য-৫২।৩৩)

আবার শিখরে শিখরে প্রবাহিত পার্বত্য নদীর বর্ণনায় দেখি—

মহান্তি কূটানি মহীধরাণাং
ধারাবিধৌ তান্যধিকং বিভান্তি।
মহাপ্রমাণৈর্বিপুলৈঃ প্রপাতৈ-
র্মুক্তাকলাপৈরিব লম্বমানৈঃ॥ (কি-২৮।৪৮)

কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, মহর্ষি বাল্মীকি যখন আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণী সীতা এবং তাহার শিশুপুত্রদ্বয়কে লইয়া রাজসভায় রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন মনে হইল, এক পরম ঋষি যেন উদত্তাদিস্বর-বিশুদ্ধিযুক্তা গায়ত্রী সহ উদীয়মান সবিতার সম্মুখীন হইয়াছেন।—

স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথসীতয়া।
ঋচেবোদর্চিষং সূর্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ॥ (১৫।৭৬)

রামায়ণে দেখিতে পাই, বাল্মীকির অনুগামিনী সীতা যেন ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতি।—

তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥
(উত্তর-১০৭।১১)

অশোকবনে হনুমান্ যখন মলিনবেশা সীতাকে দেখিয়াছিল তখন তাহার মনে হইয়াছিল—'আম্নায়ানামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব॥ (সুন্দর-১৫।৩৮)
অথবা—সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরং গতাম্॥ (সুন্দর-১৫।৩৯)

যেন 'যথাবিধি অনুশীলনের অভাবে প্রশিথিলা বিদ্যা', অথবা 'যেমন সংস্কারের অভাবে অর্থান্তরগত বাক্য।'

শকুন্তলার রূপ বর্ণনায় কালিদাস বলিয়াছেন,—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত-সত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

সীতার রূপপ্রসঙ্গে রামায়ণে দেখি—

ত্বাং কৃত্বোপরতো মন্যে রূপকর্তা স বিশ্বকৃৎ।
ন হি রূপোপমা হ্যন্যা তবাস্তি শুভদর্শনে॥ (সু-২০।১৩)

কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখি, বিমানপথে আসিতে আসিতে রামচন্দ্র নিম্নের ভূমিভাগ দেখিয়া সীতাকে বলিতেছে—

আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাদ্
মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্নকোশৈঃ।
বিডম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে
বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ॥ (১৩।২৯)

ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে লক্ষ্মণের প্রতি রামের উক্তি—

পদ্মকোশপলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টির্হি মন্যতে।
সীতয়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ॥ (১।৭১)

উপরে আমরা বাল্মীকির যে সকল উপমা লইয়া কালিদাসের উপমার পাশাপাশি রাখিয়া রাখিয়া বাল্মীকির উপমার সহিত কালিদাসের উপমার সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিলাম তাহা ব্যতীতও বাল্মীকির রামায়ণে এমন অনেক উপমা রহিয়াছে যাহা স্পষ্টতঃ কালিদাসের কাব্যে কোথাও না পাইলেও পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে থাকে, কালিদাসের উপমার সহিত ইহাদের একটা সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে। বাল্মীকির এইজাতীয় উপমাগুলি লইয়া আলোচনা করিলে এই কথা মনে হইবে, এই দিকে কালিদাসের প্রতিভা এবং বাল্মীকির প্রতিভার ভিতরে সাধর্ম্য রহিয়াছে; সেই সাধর্ম্য-বোধের সঙ্গে বাল্মীকির পূর্ববর্তী বলিয়া তাঁহার 'গুরু'ত্ব এবং কালিদাসের শিষ্যত্বের কথা স্বতঃই মনে আসে। আমরা নিম্নে বাল্মীকির এই জাতীয় কয়েকটি উপমা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিতেছি।

যুবরাজ রাম রূপে এবং গুণে সকল অযোধ্যাবাসীরই অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল ; এই জনপ্রিয়তার বর্ণনা দিলেন বাল্মীকি একটিমাত্র উপমায়—

বহিশ্চর ইব প্রাণো বভুব গুণতঃ প্রিয়ঃ ॥ (অযো-১।১৯)

রাজ্যের প্রজাগণের দেহের ভিতরে একটি অন্তশ্চর প্রাণ ছিল,—আর তাহাদের বহিশ্চর প্রাণ ছিল রাম। রামের অভিষেক-দিবসে প্রজাগণের আনন্দ-চাঞ্চল্য ও তাহার ভাষা প্রকাশ পাইয়াছে একটি উপমায়—

জনবৃন্দোর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বনবতস্তদা।
বভুব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিস্বনঃ ॥ (অযো-৫।১৭)

রাজপথ হইতে যেন সমুদ্রের নিস্বন উঠিতেছিল ; উর্মিমালার ন্যায় জনসঙ্ঘের সংঘর্ষে এবং হর্ষনিনাদেই রাজপথের এই সমুদ্র-রূপ। এই অভিষেকের মঙ্গল দিবসে কৈকেয়ী যখন অপ্রত্যাশিতভাবে বিষ উদ্গীর্ণ করিয়াছিল তখন অনুতপ্ত দশরথ বলিয়াছিলেন,—

রমমাণস্ত্বয়া সার্ধং মৃত্যুং ত্বাং নাভিলক্ষয়ে।
বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাস্পৃশম্ ॥ (অ-১২।৮১)

তোমার সহিত এতদিন রমণ করিয়া তুমিই যে মৃত্যু তাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই ;—বালকের ন্যায় নিভৃতে আমি হস্তদ্বারা কৃষ্ণসর্পকে স্পর্শ করিয়াছি।

দশরথ যখন বনগামী রামের সহিত বহু লোকজন পাঠাইবার জন্য অমাত্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন রাম বিনীত-বচনে বলিয়াছিল ;—

যো হি দত্ত্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং কক্ষ্যায়াং কুরুতে মনঃ।
রজ্জুস্নেহেন কিং তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জরোত্তমম্ ॥ (অযো-৩৭।৩)

দ্বিপশ্রেষ্ঠকে দান করিয়া যে লোক তাহার গলবন্ধের জন্য মন করে, কুঞ্জরোত্তম ত্যাগ করিবার পর সেই রজ্জুস্নেহের প্রয়োজন কি ? অর্থাৎ রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে গমনকালে এই সব অনুচরের প্রয়োজন কি ?

রামচন্দ্র বনে চলিয়া গেলে অনুতপ্ত দশরথ নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিতেছেন,—

কশ্চিদাম্রবণং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ নিষিঞ্চতি।
পুষ্পং দৃষ্ট্বা ফলে গৃধ্নুঃ স শোচতি ফলাগমে ॥
অবিজ্ঞায় ফলং যো হি কর্ম ত্বেবানুধাবতি।
স শোচেৎ ফলবেলায়াং যথা কিংশুকসেচকঃ ॥

(অযো-৬৩।৮-৯)

"'যদি কোন লোক আম্রবণ ছেদন করিয়া পলাশবৃক্ষে জল ঢালিতে থাকে,—তবে ফুল দেখিয়াই অনুরূপ ফলের লোভ করিয়া সে লোক ফলাগমে শোক করিতে থাকে। ফল (কর্মফল, বৃক্ষফল) না জানিয়া যে লোক কর্মের পশ্চাদ্ধাবন করে, ফলের বেলায় কিংশুকসেচক যেমন করিয়া শোক করে সেও তেমন করিয়াই শোক করে।' এখানে আপাতরমণীয়া কৈকেয়ীই কিংশুক, রাম আম্রবণ।

ভরত রামকে বন হইতে ফিরাইয়া লইবার জন্য বনে আসিয়া রামকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে তাহারই (রামেরই) ফিরিয়া রাজ্যগ্রহণ করা উচিত; কারণ, রাজা দশরথ রামকে অনেক করিয়া একটি শিশু বৃক্ষ হইতে যত্নে গবাদি পশু এবং অন্যান্য উৎপাত হইতে রক্ষা করিয়া আজ মহাদ্রুমরূপে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন; সে মহাদ্রুম আজ যদি যৌবনলাভে পুষ্পিত হইয়া আর কোন ফল প্রসব না করে তবে রোপণকারী যে-আনন্দলাভের আশায় তাহাকে রোপণ করিয়াছিল কিছুতেই সে আনন্দ উৎপাদন করিতে পারিবে না।—

যথা তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেণ বিবর্ধিতঃ।
হ্রস্বকেন দুরারোহে রূঢ়স্কন্ধো মহাদ্রুমঃ॥
স যদা পুষ্পিতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ।
স তাং নানুভবেৎ প্রীতিং যস্য হেতোঃ প্ররোপিতঃ॥ (অযো—১০৫।৮-৯)

অরণ্যকাণ্ডে দেখিতে পাই, অপমানিতা শূর্পণখা রামলক্ষ্মণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ভোগবিলাসে মত্ত রাবণকে বলিয়াছিল—

সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্।
লুব্ধং ন বহুমন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ॥ (৩৩।৩)

'গ্রাম্য ভোগসমূহে আসক্ত লুব্ধ এবং কামবৃত্ত মহীপতিকে শ্মশানাগ্নির ন্যায় কখনও প্রজাগণ শ্রদ্ধা করে না।'

সীতাকে হরণ করিতে আসিয়া সীতার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ রাবণ বলিয়াছিল,—

চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি।
মনো মে হরসি রামে নদীকূলমিবাম্ভসা॥ (ঐ ৪৬।২১)

'হে চারুস্মিতা চারুদতী চারুনেত্রা বিলাসিনী সীতা, নদীজল যেমন করিয়া (তাহার ছলচ্ছল লাবণ্যে) কূলের মন হরণ করে তুমি তেমন করিয়াই আমার মন হরণ করিতেছ।'

অশোকবনে বন্দিনী সীতার বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং শোকভারাবপীড়িতাম্।
বায়ুবেগৈরিবাক্রান্তাং মজ্জতীং নাবমর্ণবে ॥

অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা শোকভারপীড়িতা সীতা যেন সমুদ্রমধ্যে বায়ুবেগে আক্রান্ত ডুবু ডুবু নৌকা।

অশোকবনে বন্দিনী সীতার বর্ণনায় একস্থানে দেখি—

একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ॥ (সু-১৯।১৯)

দীর্ঘ একবেণীধরা সীতা অযত্নেই শোভা পাইতেছিল যেমন শোভা পায় পৃথিবী বর্ষার অপগমে নীলবনরাজি দ্বারা।

লঙ্কায় ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণের ভিতরে যখন তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল তখন উভয়ের অস্ত্রাঘাতে উভয়ের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কবিগুরু এই উভয় বীরের বীরত্বের গৌরবোজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন একটি মাত্র উপমায়—

ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গৌ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতাবুভৌ।
রণে তৌ রেজতুর্বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥[১]

রক্তাক্তকলেবর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়েই সে যুদ্ধে শোভা পাইতেছিল—দুইটি পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায়। বীরত্বের মহিমায় বাল্মীকির চোখে রক্তাক্ত ক্ষতগুলি তাজা লাল ফুল হইয়া দেখা দিয়াছে।

বাল্মীকির এই জাতীয় উপমাগুলি আলোচনা করিলে কালিদাসের উপমাগুলির সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ-পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার নিকটেই এই উভয় কবির সাধর্ম্য অতি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। অবশ্য এখানে একটা সংশয়ের অবকাশ থাকিয়াই যায়, আমরা একেবারে গ্রন্থারম্ভেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি; এ সংশয় বাল্মীকির রামায়ণে পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ লইয়া। তবে আমরা উপরে বাল্মীকি ও কালিদাসের যে সকল উপমা লইয়া আলোচনা করিয়াছি তাহার ভিতরেই দেখিতে পাই, উভয় কবির উপমা প্রয়োগে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও বাল্মীকির অনেক উপমা একটু প্রাচীনোচিত অস্পষ্ট এবং আড়ষ্ট—কালিদাসের সেই জাতীয় প্রয়োগ একেবারে নিখুঁত।

(১) তু—অথোক্ষিতঃ শোণিততোয়বিস্রবৈঃ
প্রপুষ্পিতাশোক ইবাচলোদ্গতঃ। ইত্যাদি। (কি-১৬।৪০)

সুতরাং মোটের উপরে রামায়ণোদ্ধৃত উপমাগুলিই প্রাচীনতর এই মতকে গ্রহণ করিয়া আলোচনা করিলে সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িবার ভয় আছে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা নানাদিক্ হইতে বাল্মীকি এবং কালিদাসের কবি-প্রতিভাকে পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম। আলোচনার অন্তে আবার আলোচনার প্রারম্ভে যে কথা বলিয়াছি, সেই কথায় ফিরিয়া যাইতে হয়। কালিদাস বাল্মীকির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ; বাল্মীকি হইতে শ্রদ্ধাবনত হইয়া দুই হাতে তিনি অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা গ্রহণ করিযাছেন তাহাকে পটভূমিতে রাখিয়া তাঁহার ভাস্বর প্রতিভাবলে অনেক কিছু আবার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণেব জন্যও তিনি দুই হাত ভরিয়া সম্পদ্ বিলাইয়া গিয়াছেন। এই দেওয়া-নেওযা উভয়ের ভিতর দিষাই তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণতা প্রকাশ পাইযাছে, কবিগুরু বাল্মীকির লোকোত্তর বিগ্রহও তাহাতে অপূর্ব গৌরবে মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। যুগে যুগে দেশে দেশে এইরূপ প্রতিভার নিবিড় সম্বন্ধ,— তাহারা বলে— 'সহবীর্যং করবাবহৈ—মা বিদ্বিষাবহৈ'—আমবা এক সঙ্গে যেন বীর্যলাভ করি —কখনও যেন একে অন্যকে বিদ্বেষ না করি।

॥ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ॥

॥ ১ ॥

সংসার-প্রবাহের ভিতরে 'নতুন কালে'র ঠিক রূপটি কি সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিযাছেন,

"কোন্ সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।"

(নতুন কাল, সেঁজুতি)

একদিকে অতীতের গঙ্গা—অন্যদিকে ভবিষ্যতের গঙ্গা—আর মাঝখানে জাগিযাছে বর্তমানের চব। জলেব উপরিভাগে এ-চরের যে পরিধিটুকু একবাবে চোখে পড়িতেছে—তাহাই চরের সবটুকু কথা নহে,—অতীতের গঙ্গা—ভবিষ্যতের সম্ভাবনাব গঙ্গা—ইহাদের জলের ভিতরে নিমজ্জিত হইয়া বহিযাছে তাহার ভিত।

বাল্মীকি ও কালিদাসের সম্বন্ধে আলোচনার সমযেই আমরা এ কথা বলিযা আসিয়াছি, কোন যুগই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে; সে যদি আত্ম-সম্পূর্ণ হইত তবে তাহাব একটা স্পষ্ট অবসানও ঘটিতে পারিত; কিন্তু মানুষের সাধনা কালেব সমগ্রতা জুড়িযা; একযুগের সাধনার অপূর্ণতা অপেক্ষা কবে পববর্তী যুগেব সাধনাকে—এইখানেই একেব সহিত অপরের নিরবচ্ছিন্ন যোগ—এইখানেই বিশ্ব-জীবনের অখণ্ডতা। তাই 'অতীত কাল' সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

সেই ভালো প্রতিযুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ কবে না তা'র গান;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তা'র মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কি বলে সে বুঝিতে কে পারে;

(অতীত কাল, পূরবী

এই যে দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-জীবনের সহিত অখণ্ড যোগ রবীন্দ্রনাথ সে সত্যটিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এত গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকেও তিনি একটা বর্তমানের 'আমি-সত্তা'র ভিতরে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। এই 'আমি'র জীবন-ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্বে—সেই সুদূর অতীতের অন্ধকারের ভিতরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে তাহার অগ্রসরণের কাহিনী। আমরা ভাবি, এই জীবনের যত বলা—যত চলা—যত কলা—তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে শুধু একটি এ-জীবনেব আমি—যে আমির ইতিহাস রচনা করিযাছে আমার জন্ম—অবসান ঘটাইবে আমার মৃত্যু।

'আজি ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
যাহার বলায মোর বাণী,
যাহার চলায মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,
যার সুর বেজে ওঠে মোব গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরাণে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা,
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
গণ্ডী দিযে মোব মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায সব কাজে।
ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমার জনম বেযে আমাব মরণে যাবে থামি।'

কিন্তু পরক্ষণেই আসল সত্যটি কবির নিকটে উদ্ভাসিত হইযাছে,—

'জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায
আপনা হারাযে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
সে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে,
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।

যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই-আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে।

কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।

ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে-বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।' (আমি, পরিশেষ)

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জুড়িয়া যে বিরাট অখণ্ড মানব-সত্তা তাহার সহিত ঐকাত্ম্যবোধই বড় প্রতিভার—বড় 'আমি'র লক্ষণ; এই বিরাট অখণ্ড হইতে যে বিচ্ছিন্ন সে-ই ছোট। দৈনন্দিন যে আত্মকেন্দ্রিক কর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আমরা জীবনের এই অখণ্ডতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি বিশেষ জন্মমৃত্যু দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র 'আমি'র ভিতরে নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছি তাহাব ভিতর দিয়াই আমাদের জীবন হইয়া উঠিতেছে লৌকিক; এই লৌকিক রাজ্যে প্রতিভার স্থান নাই; যেখানে আমরা বৃহতের সঙ্গে যোগে বড হইয়া উঠিয়াছি সেইখানেই আমরা লোকোত্তর—সেইটাই প্রতিভার বাজ্য। রবীন্দ্রনাথেব ছিল সেইজাতীয় লোকোত্তর প্রতিভা—বিশ্বজীবনের সহিত তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের যোগও ছিল তাই নিবিড়তম। অতীত জীবন তাই তাঁহার নিকটে মৃত নয—সে নীবব-গভীর; বাহিরে সে আজ কথা বলে না,—আজ 'কলকল ভাষ নীরব তাহার',—'তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন',—কিন্তু তাহার মৌন বাণীর মুখরতা জাগিযাছে অন্তরের গভীরে।—

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও,
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।

হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা মাঝে স্থির হ'য়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও কথা কও॥ (অতীত, কথা)

অতীতের এই অদৃশ্য সক্রিয় রূপটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-জীবনে বহুবার সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বহুবার বহুভাবে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহার শিল্পিমনের নিলীয়মান উপচ্ছায়ায় অতীতের অদৃশ্য শক্তিকে। 'গহন গোপন-সঞ্চারিণী' এই অদৃশ্য শক্তি যে রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর্যামী'র ভিতবে কিভাবে কতটুকু শক্তি-সঞ্চার কবিয়াছে আজ আর সে-কথাও স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া ওঠা সহজ নহে। জীবনের সন্ধ্যায় কবি অনুভব করিযাছিলেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে অতীতের শূন্যে অবলুপ্ত হইতেছে সেখানে তাহাবা একেবারে হারাইয়া যাইতেছে না—বাহিরেব স্থূলরূপ শুধু মনোময়রূপে পবিণত হইতেছে।

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলি-ধূসব আববণে,
অতীতেব শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময়;
বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন,
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল মাঝে তারি ফল শস্য ফলিছে নিয়ত!
(অতীতের ছায়া, বীথিকা)

কবির অনুভূতিতে অতীত তাই নিরাসক্ত শিল্পী—অন্ধকারের ভিতর দিয়াই নূতন কালের আকাশে কত উজ্জল তারকা ছড়াইয়া দিতেছে; নূতন কাল তাহার অনেকগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিতেছে—কতকগুলিকে আবার অশান্ত ফুৎকারে নিভাইয়া দিতেছে।

হে অতীত,
শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অন্ধকারে,
সুখ-দুঃখ-নিষ্কৃতির পারে।
শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,
স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা ;
পুরাতন ছায়াপথে নূতন তারার মতো
উজ্জ্বলি উঠিছে কত,
কত তার নিভাইছ একেবারে
যুগান্তের অশান্ত ফুৎকারে। (অতীতের ছায়া, বীথিকা)

ভারতীয় দার্শনিকগণের ভিতরে পূর্ব-মীমাংসকগণ মনে করিতেন, মানুষের এক জীবনের সকল কর্ম তাহাদের স্থূল রূপ বদলাইয়া একটা সূক্ষ্ম শক্তিরূপে অবস্থান করে,—পরবর্তী জীবনে কর্মের এই সূক্ষ্ম রূপই 'অদৃষ্ট' রূপ ধারণ করিয়া মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। একটু ব্যাপক ভাবে এই মতটি সমগ্র জাতীয় জীবনের উপরেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পূর্বতন যুগের কৃত সকল কর্ম এইভাবে সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করিয়া 'অদৃষ্ট'রূপে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে জাতীয় জীবনধারাকে। এ-সত্য মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রের সত্য—সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা সন্ধান লাভ করি সেই একই সত্যের।

॥ ২ ॥

আমরা আমাদের পূর্বভাগের আলোচনায় দেখিতে পাইয়াছি, কি করিয়া ভারতীয় প্রাচীন আরণ্যক ও কৃষি যুগের কবি বাল্মীকির কাব্য-সাধনা মধ্যযুগের কবি কালিদাসের কবি-প্রতিভাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে ; প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, রামায়ণের কবি বাল্মীকিও কি করিয়া বৈদিক কবিগণের সাধনার ফলভাক্ হইয়াছিলেন। আমরা বর্তমান আলোচনায় দেখাইতে চেষ্টা করিব, উনবিংশ ও বিংশ শতকে কবি

রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া তাঁহার কাব্য-সাধনায় পূর্ব্ববর্ত্তী সকল কবিগণের সাধনার ফলকে গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু নিকটের জিনিস গ্রহণ করেন নাই—দূরের জিনিসও গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু দেশী জিনিস গ্রহণ করেন নাই—দুই হাত ভরিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন বিদেশ হইতেও; তিনি মহাজনও অতি বড়—তাই তাঁহার লেন-দেনের পরিমাণ ও পরিধিও অনেক বড়।

কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ভাষায় এবং ভাবে শুধু পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালী কবিগণকেই গ্রহণ করেন নাই—সংস্কৃত কবিগণকে গ্রহণ করিয়াছিলেন অকুণ্ঠিত-চিত্তে—বিপুল বীর্য্যের পরিচয়ে। অবশ্য ইউরোপের ধনভাণ্ডারের চাবিও তিনি তাঁহার হাতের কাছে পাইয়াছিলেন শৈশব হইতেই,—সেখান হইতেও গ্রহণ করিয়াছেন পর্য্যাপ্ত ভাবে। এ 'তরুণ গরুড়ে'র ছিল বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা—তাই গ্রহণও করিয়াছেন সকল যুগ হইতে সকল দেশ হইতে। আমরা এখানে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতরেও আবার বিশেষ করিয়া মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যের সহিত তাঁহার গভীর যোগের কথাই আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের উপরে সংস্কৃত কবিতার প্রভাবের কথা আলোচনা করিতে গেলে এক-জাতীয় সাদৃশ্য বা মিলের কথা আমাদের মনে আসিতে পারে, যে-জাতীয় মিল প্রভাব-জনিতও হইতে পারে, আবার রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন-কল্পনা-প্রসূতও হইতে পারে। যেমন—'প্রভাত সঙ্গীতে'র 'মহাস্বপ্ন' কবিতার

> রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ,
> পর্বত-দৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস;

কালিদাসের 'মেঘদূতে'র পূর্বমেঘে কৈলাস পর্বতের বর্ণনায

> শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈ র্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
> রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥ (৫৮)

প্রভৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে।

'রাজা ও রাণী' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে বিক্রমদেবের উক্তি—

> প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ,
> মুহূর্ত তাহার পরমায়ু; তারি মধ্যে
> উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ
> মত্ত করিশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্ম সম।

আমাদিগকে কালিদাসের 'কুমার সম্ভবের' 'সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং' (৩।৭৬) প্রভৃতি স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।

'কড়ি ও কোমলের 'বাহু' কবিতার—

কাহারে জড়াতে চাহে দু'টি বাহুলতা

অথবা 'হৃদয়-আসন' কবিতার—

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে—প্রভৃতি[1]

আমাদিগকে শকুন্তলার বর্ণনা 'কোমল বিটপানুকারিণৌ বাহু'ও স্মরণ করাইতে পারে—আরও বেশি স্মরণ করাইতে পারে 'কুমার সম্ভবে'র—

লতা বধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপু-
র্বিনম্রশাখা ভুজবন্ধনানি॥ (৩।৩৯)

'কড়ি ও কোমলে'র 'চরণ' কবিতার

দু'খানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়—
দু'খানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়
শত লক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।

প্রভৃতি সূক্ষ্মতা ও মাধুর্য-ব্যাপ্তিতে খানিকটা পৃথক্ হইলেও মূলতঃ 'কুমার সম্ভবের' উমার বর্ণনা—

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখ-প্রভাভি-
র্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্॥ (১।৩৩)

প্রভৃতির সজাতীয়।

একটি মাধবীলতা আপন ছায়াতে
দু'টি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন।

(হাসি, কড়ি ও কোমল)

(১) তুলনীয়—যৌবনললিতলতা বাহুর বন্ধন (মানসী, নিষ্ফল প্রয়াস)

এখানকার 'অধরের রাঙা কিশলয়-পাত' আমাদিগকে কালিদাসের 'অধরঃ কিশলয়রাগঃ' প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।

এই কবিতার পরের দুইটি পংক্তি—

সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া।

কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে বর্ণনা 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং' এবং তাহার পরেই 'ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ' প্রভৃতিকে অবশ্যই স্মরণ করাইবে।

'কড়ি ও কোমলে'র 'মোহ' কবিতার –

কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর।
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত,
কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর।

পংক্তিগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'কড়ি ও কোমলে'র 'সন্ধ্যার বিদায়' কবিতায়

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে—
যেতে যেতে কনক-আঁচল বেধে যায় বকুলকাননে,

প্রভৃতি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের প্রথম অঙ্কের একটি দৃশ্য আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে; সেখানে সখীগণসহ গমনোদ্যতা শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তকে পুনরায় দেখিবার জন্য বলিতেছে—অণসূএ অহিণঅকুসসূঈএ পরিক্খদং মে চলণং কুরবআসাহাপরিলগ্গং অ বক্কলং। দাব পরিবালেধ মং জাবণং মোআবেমি। (রাজানমবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা)।

'প্রহাসিনী'র ধ্যানভঙ্গ কবিতার 'সইতে হবে স্থূলহস্ত অবলেপের দুঃখ' পংক্তিটির ভিতর 'স্থূলহস্ত অবলেপ' কথাটি স্পষ্টতঃই এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবেই মেঘদূত হইতে (দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্, পূ।১৪) গৃহীত। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকে কানের কাছের পলিতকেশকে বলা হইয়াছে যমরাজের নিমন্ত্রণ পত্র; কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখি, এই পলিত-কেশের ছদ্মবেশে জরা আসিয়া কানের কাছে যেন পরামর্শ দিয়াছে (তং কর্ণমূলমাগত্য···পলিতচ্ছদ্মনা জরা, ১২।২)।

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের লেখার কতকগুলি স্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত

ঠিক পংক্তিতে পংক্তিতে কোনও মিল দেখান না গেলেও পড়িতে পড়িতে মনের মধ্যে একজাতীয় একটা অস্পষ্ট স্মরণ আসে। যেমন 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের—

নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী ;—
এমনি নিভৃত নিরালায়, মনে হয়
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান ক'রে যায় ; গভীর পূর্ণিমারাত্রে,
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শস্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত অঞ্চলে।

ইহা আমাদিগকে বাল্মীকি, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি বহু কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় দেখিতে পাই—

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বর-তল,
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে,

ইহা আমাদিগকে কাদম্বরীর সন্ধ্যাবর্ণনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। সেখানে দেখিতে পাই—

তেজঃপতিপতনাচ্চিতানলমিব সন্ধ্যারাগমপরাশয়া সহ বিশতি পশ্চিমে গগনভাগে, সন্ধ্যানলস্ফুলিঙ্গনিকর ইব স্ফুরতি তারাগণে, দিবসবিরামান্মূর্চ্ছা গমেনেব তমসা নিমীল্যমানেষু দিঙ্মুখেষু—ইত্যাদি।

অর্থাৎ—সূর্য অস্তাচলে পতিত হইলে সন্ধ্যারাগ চিতানলের ন্যায় পশ্চিম-দিকের সহিত পশ্চিম গগনে আবির্ভূত হইল, তারকাগণ এই চিতানলের স্ফুলিঙ্গনিকর দিবসের অবসানে মূর্চ্ছাগমের ন্যায় অন্ধকারে দিঙ্মুখগুলি ঢাকিয়া গেল।

'চিত্রা'র 'প্রেমের অভিষেকে'র ভিতরে দেখিতে পাই,—

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ-মর্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি'
করপদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা ; পুরূরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে , মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দির তলে বসি' একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী , ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে,··· ··
· ····হাত ধ'রে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে।

এখানে প্রেমের ভিতরে বিশ্বমানবের সহিত এক হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতরেই যে কবি প্রেমের এবং সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছেন সে-কথা অতি স্পষ্ট , কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া কবির সংস্কৃত-সাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ—তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগ এবং তাহার সহিত একটা অতীত-প্রীতিরই সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা কবি-প্রতিভার উপরে সংস্কৃত-সাহিত্যের কোন গভীর প্রভাবের পরিচয় নয়। 'খেয়া'র 'বিকাশ' কবিতাটির ভিতরে দেখিতে পাই—

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাত খানি।

আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী ![১]

ইহার সহিত বৈদিক উষা-বর্ণনা—

অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরিবাপোর্ণুতে
বক্ষ উস্রেব বর্জহং। (ঋক্-১।৯২।৪)

অর্থাৎ—'নর্তকীর ন্যায় উষা রূপ ধারণ করিতেছে এবং দোহনকালে গাভী যেরূপ উধঃ প্রকাশ করে সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশ করিতেছে।'—প্রভৃতির মিল দেখান যাইতে পারে।

'নৈবেদ্যে'র 'মৃত্যু' কবিতাটির (৯০ নং) ভিতরে একটি উপমা দেখিতে পাই,—

স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে ॥

ইহার সহিত আমরা আমরা বিশখাদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসের'র 'স্তনন্ধযো ইত্যন্তশিশুঃ স্তনাদিব' (৪।১৪) প্রভৃতির মিল দেখাইতে পারি। 'বলাকা'র 'শা-জাহান' কবিতাটির ভিতরে—

তব সৈন্যদল
যাদের চরণ-ভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ু-ভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি-পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায় না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুর-নিক্কণ
ভগ্ন-প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।

---

(১) তুলনীয়—ফেলো গো বসন ফেলো—ঘুচাও অঞ্চল
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুর বালিকার বেশ কিরণ-বসন।...
আসুক বিমল উষা মানব ভবনে,
লজ্জাহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে॥ (কড়ি ও কোমল, বিবসনা)

প্রভৃতি বর্ণনা আমাদিগকে কালিদাসের 'রঘুবংশে'র কুশ-পরিত্যক্ত অযোধ্যা-পুরীর বর্ণনার কথাই স্মরণ করাইয়া দিবে (১৬।১২-২০ ; এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য) 'গান্ধারীর আবেদনে'র মধ্যে গান্ধারীর উক্তি—

কৌরব কল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রিদিন।

আমাদিগকে 'রঘুবংশে' বর্ণিত অশ্রুমুখী অযোধ্যা-লক্ষ্মীর বিদায় প্রতীক্ষা স্মরণ করাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ স্থানে স্থানে বসন্তের নবপল্লবকে অগ্নিবান বা অগ্নিশিখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

বর্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয় বাণ বন-শাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া। (বসন্ত, মহুয়া)

আবার—

তব ধ্যান মন্ত্রটিরে
আনিল বাহির-তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি' সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন পত্রে জ্বালি' দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।
(তপোভঙ্গ, পূরবী)

ইহার সহিত আমরা রামায়ণে বাল্মীকির বসন্ত বর্ণনার তুলনা করিতে পারি,—

মাং হি পল্লবতাম্রার্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি। (কি—১।২৯)

'পল্লবেব তাম্র-অর্চি লইয়া বসন্ত আমাকে দগ্ধ করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ; (শুভযোগ, মহুয়া)

বাল্মীকি লিখিয়াছেন,—'অশোকস্তবকাঙ্গারঃ,' আর কালিদাস লিখিয়াছেন—

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ
সর্বত্র কিংশুক-বনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ। (ঋতু-সংহার, ৬।১৯)

রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকে যেখানে দেখিতে পাই, নির্বাসনে গমনোদ্যতা কন্যা 'মালিনীর' জন্য রাজমহিষী প্রার্থনা করিতেছে—

বসুগণ, রুদ্রগণ,
বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ
কন্যারে আমার। মর্ত্যলোক, স্বর্গলোক
হও অনুকূল—শুভ হ'ক, শুভ হ'ক
কন্যার আমার। হে আদিত্য, হে পবন,
করি প্রণিপাত, সর্ব দিক্‌পালগণ
কর দূর মালিনীর সর্ব অকল্যাণ।—

সেখানে এই প্রার্থনা আমাদিগকে আশ্চর্যভাবে বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত নির্বাসনে গমনোদ্যত রামচন্দ্রের জন্য মাতা কৌশল্যার প্রার্থনা স্মরণ করাইয়া দিবে।

আমরা কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্যরাশির ভিতরে সংস্কৃত-কাব্যের সহিত এখানে-সেখানে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট এ-জাতীয় বহু মিল দেখান যাইতে পারে; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই-জাতীয় মিলের উপরে আমরা বিশেষ জোর দিতে চাহি না; কারণ, এখানে কোন্‌টা রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে গ্রহণ করিয়াছেন আর কোন্‌টা স্বাধীন দৃষ্টিতে সৃষ্টি করিয়াছেন সে-কথা কিছু জোর করিয়া বলা চলে না।

ইহার ভিতরকার কতগুলি মিল হয়ত সামাজিক উত্তরাধিকার জাত। একটি বিশিষ্ট জাতীয়-জীবনধারাকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় সাহিত্যেরও কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য গড়িয়া ওঠে—সে বৈশিষ্ট্যগুলি সচেতন-গ্রহণ ব্যতীতও সাহিত্যের ভিতরে নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের সহিতই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, এবং গ্রহণও হয়ত করিয়াছেন বহুস্থান হইতে বহু প্রভাব; কিন্তু তাঁহার গভীরতম যোগ ছিল কবি কালিদাসের সঙ্গে। মোটের উপরে কালিদাস তাঁহার নিকটে সমগ্র সংস্কৃত কবিগণের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন। ভারতবর্ষের জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ এবং মহাভারত রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল; 'প্রাচীন সাহিত্যে'র ভিতরে 'রামায়ণ' প্রবন্ধের মধ্যে তিনি যে কথা বলিয়াছেন তাহার ভিতরেই এই শ্রদ্ধার পরিচয় রহিয়াছে। 'সোনার তরী'র 'পুরস্কার' কবিতায় তিনি রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুইখানির

যে দুইটি রূপ দিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়াই কাব্য-হিসাবে এই গ্রন্থ দুইখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ধৃত রূপের একটি আভাস রহিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত জীবন সহস্র সহস্র শতাব্দীর ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া আজিও আসিয়া আমাদের চিত্তের দ্বারে কি ভাবে আঘাত করিতেছে তাহারও মধুরতম পরিচয় দিয়াছেন এই কবিতাটিতে।

সে-সকল দিন সে-ও চ'লে যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়,
যায় নি ত এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযুর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা।
শুধু সেদিনের একখানি সুর
চির দিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে।

'মহাভারত' সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা,—

কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতা-বহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তা'র,
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিক আর।

তবু কোথা হ'তে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমর-সাগর
গ্রহণ করিছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে,
বিজয়ের শেষে সে মহা প্রয়াণ
সফল আশার বিষাদ মহান,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির মানবের প্রাণে।

রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পত্তি—পরবর্তী কালের কবিগণ সকলেই এখান হইতে ভাব, ভাষা, উপাখ্যান এবং প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রহণ সম্বন্ধে আমরা বাল্মীকি-কালিদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছি, এক্ষেত্রেও সেই কথাই প্রযুজ্য। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসদেবের মহাভারত হইতে রবীন্দ্রনাথ যেখানে যেটুকু গ্রহ করিয়াছেন সেখানে যে তিনি বাল্মীকি বা ব্যাসদেবের কাব্যাংশের পুনরাবৃত্তি মাত্র করেন নাই তাহা সহজবোধ্য; এ গ্রহণের তাৎপর্য জীবনের নবলব্ধ বাণীকে অতীত জীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিযা জীবন-রসের 'সামরস্য' আস্বাদন করা। তা ছাড়া মানুষেব জীবন-ইতিহাসের অতীত অংশটার একটা রহস্যঘন মহিমা রহিয়াছে, সেই মহিমার উদ্ভাসের উপরে বর্তমানের জীবনও সহজেই মহিমান্বিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা নূতন সাহিত্য রচনার জন্য তখনই অবলম্বন করি যখন আমাদের চিত্তের ভিতরে যে একটি বিশেষ জীবন-দর্শন রহিয়াছে প্রাচীন সাহিত্য বা সাহিত্যাংশের দ্বারা আমাদের সেই জীবন-দর্শনের একটা রসময় উদ্বোধ ঘটে। সেই যে রসময় উদ্বোধ তাহাতো কবির নিজস্ব—তাহা সম্পূর্ণ এ-কালের; সুতবাং সেকালের বিষয়-বস্তুর দেহের ভিতরে যে প্রাণ-সঞ্চারণ ঘটে তাহা একালেরই জিনিস। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারত—এমন কি উপনিষদ্, বৌদ্ধ-সাহিত্য প্রভৃতি হইতে যত কবিতার বিষয়-বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ভিতরকার প্রাণ-বস্তুও উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর।[১]

রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কবি-প্রেরণা কিশোর কবি বাল্মীকি হইতে বা অন্য

(১) দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত-সাহিত্য—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, জয়ন্তী-উৎসর্গ।

কোন সংস্কৃত কবি হইতে লাভ করেন নাই, করিয়াছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিকট হইতে। তবে রামায়ণে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্ব লাভের উপাখ্যানটি রবীন্দ্রনাথের কবি-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া একটি নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল কবির 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির ভিতরে। এই কবিতার ভিতরে কবি বলিয়াছেন, যে-রামায়ণ কাব্য-সৃষ্টি সেই রামায়ণের রামের জন্মভূমি হিসাবে অযোধ্যার চেয়ে কবি বাল্মীকির মনোভূমিই বেশী সত্য; সেই সুরেই সুর মিলাইয়া বলা যাইতে পারে, 'ভাষা ও ছন্দে'র ভিতরে আমরা যে কবি বাল্মীকির সাক্ষাৎ লাভ করি,—

যিনি—

বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ;

আর নব ছন্দকে উচ্চারণ করিয়া যিনি বলিয়াছিলেন—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হ'য়ে আসে ক্ষীণ
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে,

... ...

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—

সেই কবি বাল্মীকির জন্মভূমিও রবীন্দ্রনাথের চিত্তভূমিতেই সব চেয়ে বেশী। আদি কবির প্রথম ছন্দোলাভের তথ্যটিকে রবীন্দ্রনাথ এখানে যে-সত্যে পরিণত করিয়াছেন সে-সত্য তাঁহার নিজস্ব। এই তথ্যের উপরে এই সত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে যে রবীন্দ্রনাথ প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন তাহার কারণ, এই তথ্যের ভিতরে তিনি আভাস পাইয়াছিলেন এই সত্যের; সে হয়ত বীজাকারে নিহিত

ছিল—অনুকূল চিত্তভূমিতে সেই বীজই আত্ম-সম্প্রসারণ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন তথ্যের উপরে এক্ষেত্রে সত্যের অরোপ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ হইতে একেবারে দূরে সরিয়া পড়েন নাই ; নারদমুনিকে কবি বাল্মীকি যে প্রশ্ন করিযাছেন—

"কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে, নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে, সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"

ইহা মূল রামাযণের অর্থকেও অনেকখানি সম্প্রসারিত এবং মহিমান্বিত করিবাছে বলিয়া মনে হয়।[১]

কিন্তু রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে প্রলুব্ধ করিবার উপাখ্যানটিকে অবলম্বন করিযা রবীন্দ্রনাথ যে 'পতিতা' রচনা করিয়াছেন তাহার সহিত রামায়ণের যোগ শুধু ঐ একটা উপাখ্যানের কাঠামোর ; প্রাচীন তথ্য এখানে নবরূপে সত্য হইয়া ওঠে নাই,—সত্য এখানে তথ্যের উপরে সম্পূর্ণ ভাবেই আরোপিত। এই প্রসঙ্গেই 'মানসী'র ভিতরকার 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটির কথা মনে পড়িযা যায। এখানেও অহল্যাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন ঠিক অহল্যাকে অবলম্বন করিয়া এ-কথার আভাস রামায়ণে কোথাও নাই। কিন্তু তথাপি এ ক্ষেত্রে বাল্মীকির কবি-মানসের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের একটা গভীর মিল রহিযাছে। রবীন্দ্রনাথ যে-কথা এখানে বলিয়াছেন অহল্যাকে অবলম্বন করিয়া, আদি কবি বাল্মীকি সে-কথার আভাস দিয়াছেন সীতার ভিতর দিয়া। একথাটি সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব, অতএব এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া রাখিলাম।

(১) মূল শ্লোকগুলি এই গ্রন্থের পূর্ব্ব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

রামায়ণের ন্যায় মহাভারত হইতেও রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু কবিতার বিষয়-বস্তু নির্বাচন করিয়াছেন, তাহার ভিতরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'চিত্রাঙ্গদা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি নাট্য-কাব্য। এ-গুলি সম্বন্ধেও নূতন করিয়া বলিবার নাই কিছু; একটি উপাখ্যানের সূত্রসার বা চরিত্রের গোটাকয়েক রেখাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা ভাবের দিক হইতেও তাঁহার নিজস্ব—প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতেও নিজস্ব।

॥ ৩ ॥

কিন্তু এহো বাহ্য! অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উপরে রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য কিছু কিছু সংস্কৃত সাহিত্যের অল্পবিস্তর প্রভাব থাকিলেও তাঁহার বিরাট কবিপ্রতিভার তুলনায় তাহা একরূপ নগণ্য,—সত্যকার রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব, অথবা সত্যকার রবীন্দ্রনাথের সহিত দেশ-কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের গূঢ়তম যোগ কালিদাসের। কালিদাসকে তিনি যেমন ভাবে স্বীকার করিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন পূর্ববর্তী কবিগণের ভিতরে এমন আর কাহাকেও নহে। এই স্বীকরণের ও স্বীকৃতির কারণও রহিয়াছে। সে কারণ এই, কালিদাসের কবি-ধর্মের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের একটা সজাতীয়তা আছে।

কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এতখানি অনুরক্তির কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে পাই ভাষার সঙ্গীত-ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশৈশব অনুরক্তি। কৈশোরেই তাঁহার হৃদয়ের অফুরন্ত আকুতি লইয়া তিনি পদে পদে অনুভব করিয়াছেন, 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে' এবং এই সীমাবদ্ধ অর্থের বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্তি দিতে হইলে অবলম্বন করিতে হইবে শব্দের ধ্বনি-সম্পদকে। এই ধ্বনি-সম্পদের দিক হইতে গরীয়সী সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষার এই ঐশ্বর্য শৈশবেই তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে কবি বলিয়াছেন,—

"আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে

একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ-ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।...

"......একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দ খানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলযাদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'—এই পদটি ঠিকমতো যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণতো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরও একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢা মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ॥

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল।

আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিতদেবদারু' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল।"

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র ছন্দ দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই ছিল স্বাভাবিক; জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের কারুকার্য অনেকখানি উজ্জ্বল রঙ-বেরঙের ছবি—কিশোরচিত্তকে অতি সহজে আকৃষ্ট করে এবং নাড়া দেয়। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভিতরে এই আকর্ষণ এবং লঘু চিত্তবিলোড়নের পরিচয় রহিয়াছে।

সতিমিব রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলযিত মলয়ে, সুবিজন নিলযে
বালা বিরহ-বিষণ্ন।

প্রভৃতি যে জযদেবের উপবেই মকৃসমাত্র তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয না। সংস্কতেব এই ধ্বনি-সম্পদের প্রাচুর্যে মুগ্ধ এবং লুব্ধ হইয়া সংস্কৃত বহু কবিই সংযম হারাইযা ফেলিয়াছেন; সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রভৃতির শ্লেষ-প্রীতি চমৎকাবিত্বের জন্য লোভনীয় হইলেও স্থানে স্থানে আবার মুদ্রাদোষে রূপান্তরিত হইয়া কাব্যের ব্যাধিভূত হইয়া পড়িয়াছে,—ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতিব বিবিধবৃত্তি, বন্ধ এবং অনুপ্রাস-যমক সর্বত্র সাহিত্যের অঙ্গীভূত নহে, সাহিত্যের উপকণ্ঠে তাঁবু খাটাইয়া প্যাঁচ কষিয়া তাক লাগাইবার চেষ্টা; জয়দেব ধ্বনি-প্রবাহে ভাসিয়াই চলিয়াছেন—শক্তভূমিতে পা ছোঁওয়াইয়া দাঁড়ান নাই; কিন্তু এ-ব্যাপারে কালিদাস একেবারে নিখুঁত। তিনি ধ্বনি-সম্পন্ন ধনি-পরিবারের ছেলে—প্রতিভায় ছিল অনন্তযৌবনের প্রাচুর্য—কিন্তু আশ্চর্যভাবে সংযমী হইয়া পড়িয়াছিলেন,—উচ্ছৃঙ্খলতার মত্ততা নাই কোথাও। বিপুল সম্পদ্‌কে কি করিয়া অধিকার করিতে হয়, কি করিয়া তাহাকে সাধুতম এবং সুষ্ঠুতম উপায়ে ব্যবহার করিতে হয় সে কথাটি তাঁহার জানা ছিল। এই কারণে সংস্কৃত ভাষার যেখানে বৈশিষ্ট্য কালিদাসের হাতে তাহা লাভ করিল একটা সুস্থ সার্থক পরিণতি। এইখানে আসিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ছন্দের দিক হইতে হোক, শব্দালঙ্কারের দিক হইতে হোক, অর্থালঙ্কারের দিক হইতে হোক এক একটি শ্লোক এক একটি নিটোল মুক্তার দানা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে কোথাও একটি টুকরা ভাঙিয়া খসাইয়া লইয়া সেখানে অন্য কিছু বসাইয়া দিবার জো নাই, আপনি খসিয়া পড়িয়া যাইবে।

শুধু বাঙলা ভাষার কবি হিসাবে নয়, আধুনিক যুগের ভারতীয় কবি হিসাবে কালিদাসের পরে কাব্য-কলার এই নিখুঁত পরিণতি দেখা গিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। সম্পদে অপ্রমত্ততা, প্রাচুর্যে অপূর্ব সংযম, বৈচিত্র্য-বিলাসের ভিতরে সুনিপুণ বৈদগ্ধ্য রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মকে কালিদাসের কবি-ধর্মের একান্ত সজাতীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাই উভয়ের আত্মীয়তাও এত গভীর।

শুধু এই দিক হইতে নয়, কবিধর্মের আরও অনেক মৌলিক উপাদানে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সজাতীয়ত্ব লক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে বলিয়াছেন 'মানস লোকে'র কবি ; এই 'মানস' কৈলাস-শৃঙ্গের 'মানস লোক'ও বটে, নিখিল মানবেব 'মানস লোক'ও বটে।

> মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
> ছিলে তুমি মহেশেব মন্দির প্রাঙ্গণে
> তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস।
> নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধ-নীল-ভাস
> চিরস্থির আষাঢের ঘনমেঘদলে,
> জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।
> আজিও মানসধামে করিছ বসতি,
> চিবদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি,
> শঙ্কর চরিতগানে ভরিয়া ভুবন।
>
> (মানসলোক, চৈতালি)

রবীন্দ্রনাথের 'মানস লোকে'ও একটি অশরীরী কবি বিচরণ করিত— যাহার বাসনা ছিল—

> এপারে নির্জন তীরে
> একাকী উঠেছে ঊর্ধ্বে উচ্চ গিরিশিরে
> রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
> তোমার প্রাসাদ-সৌধ, অনিন্দ্য নির্মল
> চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে
> হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
> মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে,

ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা,······
············অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

(আবেদন, চিত্রা)

এখানকার এই 'মানস লোক'টির সঙ্গে পূর্ববর্ণিত কবি-কল্পিত কালিদাসের বিহার ভূমি 'মানস-লোকে'র একটি প্রচ্ছন্ন মিল অল্পেই চোখে পড়িয়া যায়; দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথের 'মানস'-বিহারী অশরীরী কবিও কালিদাসের ন্যায় সংসারের ঊর্ধ্বে বহু দূরের একটি নির্জন মানস-লোকে অবস্থান করিয়া নিখিল মানবের মানস লোকে অমর হইয়া থাকিবার বাসনা পোষণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কালিদাস ছিলেন সেই কবি যিনি সমসাময়িক দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, মান-অপমান, লাভ-ক্ষতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া জীবনমন্থনজাত বিষকে অঞ্জলি পূরিয়া নিজেই পান করিয়াছেন, আর অমৃত যাহা কিছু উঠিয়াছিল তাহা গানে গানে নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

তবু কি ছিল না তব সুখ দুঃখ যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমান ভার,
অনাদর. অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর, নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি'।
তবু সে সবাব ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্যপানে। তার কোন ঠাঁই
দুঃখ দৈন্য দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল ক'রে গেছ দান॥

(কাব্য, চৈতালি)

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে কাব্যের ও কবির

যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহার সহিত কাব্য ও কবির এই আদর্শের গভীর মিল রহিয়াছে ; কালিদাসকে রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন এবং সেই জন্যই গভীর হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের সম্পর্ক।

আসলে কালিদাস ছিলেন মধ্যযুগের রোম্যান্টিক কবি। 'রঘুবংশের' ক্ষেত্রে কিছু সংশয় থাকিলেও 'মেঘদূত' 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান শকুন্তল', বা 'বিক্রমোর্বশী' প্রভৃতির ক্ষেত্রে মনে খুব বেশী সংশয় থাকে না। অন্যান্য আরও অনেক প্রবণতার সহিত কালিদাসের এই রোম্যান্টিক মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে একটা দূর-প্রীতিতে, সে দূরত্ব স্থানেরই হোক বা কালেরই হোক। প্রিয়া-বিরহের রহস্যের যবনিকার অন্তরালে মহনীয় করিয়া তুলিবার জন্য কবি তাই শাপের ভান করিয়া হিমালযের ক্রোড়ে অবস্থিত অলকাপুরী হইতে নিজেকে সুদূর রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত করিয়া লইয়াছেন ও তারপরে শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিয়া শুধু কল্পনার জাল বুনিয়া এই সবটুকু দূরত্বের ফাঁক ভরিয়া দিয়াছেন। আসলে কবি এই দূরত্বের ফাঁকটুকুই একান্তভাবে চাহিয়াছিলেন বিচিত্র কল্পনার লীলাভুমি রূপে। 'কুমার-সম্ভবে'র ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই, হিমালয়ের পার্বত্য বনপ্রদেশে আলো-অন্ধকারের ভিতরে চেতন-অচেতনের মেলামেশার ভিতর দিয়া কবি যে এক কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানে কোন স্পষ্ট বুদ্ধির দীপ-বর্তিকা লইয়া কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, সেখানে প্রবেশ করিতে হয় রসানুভূতির আলো-আঁধারি গোধুলিতে। শকুন্তলাকেও কালিদাস স্থাপন করিয়াছেন নগর হইতে অনেক দূরে—আরণ্য তপোবনের আশ্রম প্রাঙ্গণে ; সেখানে তাহার যে জীবন তাহা নাগরিক সমাজ ও সমাজহীন আরণ্য জীবনের মাঝখানে তরুলতা, পশুপাখীর মিলিয়া মিশিয়া একটা অনির্বচনীয় রহস্য লাভ করিয়াছে। বিরহোন্মত্ত রাজা পুরূরবাকেও কালিদাস এমনই একটি আরণ্য পরিবেষ্টনীর পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রেমকে অপূর্ব চারুত্ব ও রহস্য দান করিয়াছেন। কালিদাসের রচনা সমূহের ভিতরে আমরা যেটাকে মুখ্যতঃ ক্ল্যাসিক রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি সেই 'রঘুবংশে'র ভিতরেও দেখিতে পাই, কবির প্রতিভা একটা বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে যেখানে তিনি তাঁহার কল্পনাকে একটা স্বাধীন বিচক্ষণ ক্ষমতা দান করিয়াছেন তপোবন-জীবনের ভিতরে। 'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গটি তাই এত সরস, সাবলীল এবং উজ্জ্বল,—ত্রয়োদশে রাম-সীতার বিমান-বিহার তাই এত বিচিত্র মধুর।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কল্পনা-বিলাসী 'সুদূরের পিয়াসী'; এই সুদূর—বিপুল সুদূরের কল্প-লোক তাই যখন 'ব্যাকুল-বাঁশরী' বাজাইত তখন কবি তাঁহার 'ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই' একথা ভুলিয়া যাইতেন এবং বাহির জীবনের সমস্ত কোলাহল হইতে নিজেকে গুটাইয়া লইয়া নির্জনে একাকী শুধু কল্পনার জাল বুনিয়া নিজেকেই বাঁধিতেন এবং ছাড়াইতেন। বহির্বিমুখ কল্পনাব আত্মরতি—ইহাই একটি মৌলিক রোমান্টিক ধর্ম। ববীন্দ্র-নাথের প্রথম জীবনের যে-সকল কাব্য বা কাব্যোপন্যাস পাওয়া যায় তাহাব ভিতবেই কবির এই রোমান্টিক ধর্ম প্রকট হইয়াছে। সেখানেই দেখিতে পাই পারিপার্শ্বিক জীবনের কোলাহল হইতে কবি নিজেকে গুটাইযা লইয়াছেন; সেখানে অন্তরের একটি নিভৃত নির্জন প্রদেশে নিজেকে স্থাপিত করিযা মনকে পাঠাইয়াছেন শুধু কল্পলোকে। সেই কল্পলোকে কি দেখিতে পাই? সমাজ জীবনের অনেক দূরে নিভৃত নির্জন বন-কাননের ভিতরে শুধু অস্ফুট বিচিত্র বঙিন প্রেমের গুঞ্জবণ। তখন পর্যন্তও কালিদাসের সহিত তরুণ কবিমনেব ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই; তাই কল্পনা-বিলাসী সে মন নিরালম্ব ভাবেই জাল বুনিয়া চলিয়াছে।

'ছবি ও গান' পর্যন্তও আমরা রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে কালিদাসের স্পষ্ট কোন প্রভাব লক্ষ্য কবিতে পারি না। এখানেও মাঝে মাঝে কিশোব বোমান্টিক মনের হা-হুতাশ এবং আকুতির পরিচয় পাইতেছি—সে আকুতি এখন পর্যন্ত কালিদাসকে আশ্রয় করে নাই। কবি একলা আকাশেব পানে তাকাইয়া আছেন—আর সেই অবস্থায—

বসন্ত-বাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদু বাস।
যেন সুদূর-নন্দন-কানন-বাসিনী,
সুখ-ঘুম-ঘোরে মধুর-হাসিনী,
অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ
ভেসে ভেসে বহে যায়,
অতি মৃদু মৃদু লাগে গায়।

বিস্মরণ-মোহে আঁধারে আলোকে
মনে পড়ে যেন তায়,
স্মৃতি-আশা-মাখা মৃদু সুখে দুখে
পুলকিয়া উঠে কায়।
ভ্রমি আমি যেন সুদূরে কাননে,
সুদূর আকাশতলে,
আনমনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরযূর কলকলে।
… … …
যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুম-শয়নে আধেক মগনা
বাসক-বসনে আধেক নগনা,
সুখ দুখ গান গাহিছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা। (জাগ্রতস্বপ্ন, ছবি ও গান)

এইখানেই কালিদাসের স্মরণ ঘটিতে পারিত, কিন্তু কল্পনা-বিলাসী কবির মানস-প্রিয়া এখন পর্যন্তও কালিদাসের মানস-প্রিয়ার সহিত এক হইয়া যায় নাই; পরবর্তী কালে দেখিতে পাই, এই-জাতীয় স্থলেই কালিদাস তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-জগৎ লইয়া রবীন্দ্রনাথের মানসে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং কবি অতীতের 'হিমানী-কুহেলীমাখা' কালিদাস-বিরচিত কল্পলোকে প্রবেশ করিয়া একটা তৃপ্তি এবং স্ফূর্তি লাভ করিয়াছেন। কালিদাস তাঁহার সাহিত্য-জগৎকে অনেকখানি কল্পলোকের স্বপ্ন করিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপরে আবার পড়িয়াছে বহুশত বৎসরের যবনিকা—সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছিল সেটা সোনায় সোহাগা। এই 'ছবি ও গানে'র ভিতরেই দেখিতে পাই একটু মধুর স্বপ্নবিলাসের ভিতর দিয়া কবি অতীত জীবনের ভিতরে ভাসিয়া যাইবার প্রবণতার আভাস দিতেছেন। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় দেখি—

নীল শূন্যে ছবি আঁকা রবির কিরণমাখা,
সেথা যেন বাস করিতেছি,
জীবনের আধখানি যেন ভুলে গেছি আমি,
কোথা যেন ফেলিয়ে এসেছি।

আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়,
কোথা যাব কোথা যাই সে কথা যে মনে নাই,
ভুলে আছি মধুর মায়ায়,
... ...
বুঝিবে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষি-বালিকারা,
পরিয়া বাকল-বাস, মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণ-শিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁষে,
মালিনী বহিত পদতলে,
দু-চারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে।

'কড়ি ও কোমলে'র ভিতরেও রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে শুধু ছুঁইয়া ছুঁইয়া চলিয়াছেন। বর্ষা-বাদলে একেলা অন্ধকারে এখন পর্যন্তও রূপ-কথার রাজ্যই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়, কালিদাসের জগৎ এখনও কবিচিত্তকে গভীর ভাবে অধিকার করিতে পারে নাই (দ্রঃ-'উপকথা')। কিন্তু কালিদাসের কবি-মানসের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের গভীর মিলের আভাস এখানেই ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। রোম্যান্টিক মনের একটা প্রধান ধর্ম এই, এ-মন বাহিরে যাহা কিছু দেখে—যাহা কিছু শোনে তাহাতেই তৃপ্ত হইতে পারে না—বহির্জগতের সকল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শকে অবলম্বন করিয়া সে চলিয়া যায় তাহার অন্তর রাজ্যে; এই অন্তর রাজ্যে বাসনায় বিধৃত হইয়া আছে বিশ্ব-জীবনের যে রূপ-রস-মাধুর্য তাহার উদ্বোধের ফলেই বহির্জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ একটা রহস্যালোকে মণ্ডিত হইয়া আস্বাদনীয়তা লাভ করে। 'অন্তরের মাধুরী'র দ্বারা যাহা কিছু সকলকে নূতন করিয়া এবং সরস করিয়া গড়িয়া তোলাই রোম্যান্টিক কবির কাজ। এই কথাটিরই আভাস দিয়াছেন কালিদাস শকুন্তলা-নাটকে রাজা দুষ্মন্তের মুখে। সেখানে বলা হইয়াছে—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি॥

'রম্য দৃশ্য দেখিয়া অথবা মধুর শব্দ শুনিয়া যে সুখী প্রাণীর চিত্তও ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তাহার কারণ, জীবগণ তখন বাসনায় ভাবরূপে স্থিরবদ্ধ জননান্তরের কোন সৌহার্দ্যকেই অবোধপূর্বভাবে (অর্থাৎ চেতনার অজ্ঞাতেই) স্মরণ করে।' এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে—

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারাণ সুখ আছে ওনয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুম কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

(স্মৃতি, কড়ি ও কোমল)

ইহা কালিদাসেরই প্রতিধ্বনি কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে ইহার ভিতর দিয়া কবি-মানসের যে সাধর্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সন্দেহাতীত।

'মানসী'র যুগে রবীন্দ্র-কবিমানসের উপরে কালিদাস স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 'মানসী'তে তিনি যে শুধু মেঘদূত সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন তাহা নহে,—যেখানেই বাদলা-দিনের অন্ধকার কবির মনকে বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া অন্তর্মুখীন করিয়াছে সেখানেই তিনি অতীতের মায়াময় কাব্য-জীবনে ফিরিয়া গিয়াছেন। 'সুদূর বনান্ত হ'তে দক্ষিণ সমীর স্রোতে' কুহুধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া যখন কবি-চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে তখন কবির মনে পড়িয়াছে—

প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশ-লব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে,

ঘন সহকার-শাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্ত সনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখনো সে কুহু-ভাষা রমণীর ভালবাসা
ক'রেছিলো সুমধুরতর। (কুহুধ্বনি, মানসী)

আবার—

বৃষ্টি-ঘেরা চারিধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ ঝুপ শব্দ, আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছল ছল নলিন নয়ন। (পত্র, মানসী)

এই কবিতাগুলি লক্ষ্য করিলে একটা কথা চোখে পড়ে, একটা গভীর চিত্ত-বিলোড়নের ভিতর দিয়া কবির মন যখনই অন্তর্মুখীন হইয়াছে তখনই মানব-জীবনের অতীত রূপের সহিত বর্তমান রূপের ঐক্য তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। বিরহ-মিলন স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে সকল দেশ-কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মানুষের চিত্তে একটা গভীর যোগ রহিয়াছে, সেই যোগেই আমরা এক হইয়া যাই। এ-কথাটি অতি সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে 'মানসী'র 'একাল ও সেকাল' কবিতাটির ভিতরে।

বর্ষা এলায়েছে তা'র মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন.
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।
আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে॥

সেদিনো এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ চকিতদৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।
... ...
চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কা'রা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরাণে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন ;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন-শিথিল বেশ ;
সেদিনো এমনিতর অন্ধকার দিন।

আজও যে কালিদাসের যুগের—বৈষ্ণব কবিদের যুগের বিরহিণীরা আসিয়া কবির মনের চারিদিকে ভিড করিয়া দাঁড়াইতেছে তাহার কারণ—

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এবং 'এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।'

'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতার ভিতরেও এই কালের যোগ এবং কবি-ধর্মের যোগ প্রকাশ পাইয়াছে। বিরহ-বেদনার ভিতরে মানব-চিত্তের যে সর্বজনীনতা রহিয়াছে তাহা সর্বজনীন বলিয়াই সর্বকালিক। কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মেঘমন্দ্রস্বরে সেদিন বিশ্বের বিরহীর বেদনাই 'সঘন সঙ্গীতের মাঝে পুঞ্জীভূত' হইয়া উঠিয়াছিল। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবীন মেঘের ঘনঘটায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সেদিন যেন 'জগতের যতেক প্রবাসী জোড় হস্তে মেঘপানে শূন্যে মাথা' তুলিয়া সমস্বরে বিরহের গাথা গাহিয়াছিল—সুদূরপ্রান্তে গৃহকোণে ভূতল-শয়না মুক্তকেশা তাহাদের বিরহিণী প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া। সেই সকল বিরহি-বিরহিণীর বাণীকে একটি সঙ্গীতে বাঁধিয়া লইয়া কালিদাস

দেশদেশান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছেন; যুগযুগান্তের প্রবাহ বহিয়া সে সঙ্গীত আজিও আমাদের হৃদয়ের তটে আসিয়া আঘাত করিতেছে, যুগে যুগে নিত্য নূতন প্রতিধ্বনি সেই সঙ্গীতকে যেন নিরন্তর স্ফীত করিয়া তুলিতেছে।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব-বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের পরে, করি' বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা; করিয়া বিস্তার
নবঘন স্নিগ্ধচ্ছায়া; করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,—

সেই একদিন বহুপূর্বে উজ্জয়িনীর কবির নিকট নববর্ষা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

সেদিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরু গুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
একদিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝ'রে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি।

আর আজ—

ভারতের পূর্বশেষে
আমি ব'সে আজি; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।

বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

সুতরাং স্বভাবতঃই কালিদাসের সুর মেঘদূতের ভিতর দিয়া আসিয়া পৌঁছায় ঊনবিংশ শতাব্দীর কবির কানে ও প্রাণে—সেই সুরকে অবলম্বন করিয়া কবির মন ঘুরিয়া বেড়ায় কালিদাসের যুগের সেই প্রথমবর্ষায় সচকিত স্বপ্নমোহভরা জীবনের বিচিত্র লীলার ভিতরে।

বর্ষার কবিতার ভিতরে রবীন্দ্রনাথ এই কালের যোগটা অনুভব করিয়াছিলেন অতি নিবিড় ভাবে—শুধু কালিদাসের সঙ্গে নয় বৈষ্ণব-কবিদের সঙ্গেও। 'শ্যামলী'র 'স্বপ্ন' কবিতাটির ভিতরে দেখি, ঘন অন্ধকার রাত্রে বাদলের হাওয়া যখন এলোমেলো ঝাপটা দিতেছে চারিদিকে,—যখন মেঘ ডাকিতেছে গুরু গুরু—যখন—

থর্ থর্ করছে দরজা,
খড়্ খড়্ ক'রে উঠছে জানালাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি
সার-বাঁধা সুপুরি-নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা-ঝাঁকানি।
দুলে' উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো
দল পাকানো প্রেতের মতো।

তখন—

মনে পড়েছে ঐ পদটা—
"রজনী সাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন......
স্বপন দেখিনু হেনকালে।"
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়িধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল-পরা
ঘাটের থেকে নীলসাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি'-চলা।

আজ এই ঝোড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই—
তার সকালে, তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়
তার চোখের চাহনিতে,
তিন-শো বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।
... ...
শ্রাবণের রাত্রে এমনি ক'রেই বয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালেব স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

'সোনার তরী'তেও দেখিতে পাই, যেদিন চারিদিকে অবিরল ঝরঝর বৃষ্টি জল এক প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র একখানি ঘরকে সমুদয় বহির্বিশ্ব হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দেয় তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাব সেই নিজের ঘবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের জগতে নিজেকে টানিয়া লইয়া কালিদাস, জয়দেব, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সকল কবিব সহিত এক হইয়া যান, কারণ বাহিবের বিশ্বে তাঁহারা দেশ-কালের দ্বাবা যতই পৃথক্ থাকুন না কেন বাদলা দিনের নির্জ্জন অন্তর-মন্দিরে বিরহখিন্ন তাঁহারা সকলেই এক।—

চারিদিকে অবিরল ঝব ঝব বৃষ্টিজল
এই ছোট প্রান্ত ঘরটিরে
দেয় নির্বাসিত করি— দশদিক অপহরি,—
সমুদয় বিশ্বেব বাহিবে।
বসে বসে সঙ্গীহীন ভালোলাগে কিছুদিন
পড়িবারে মেঘদূত কথা :—
—বাহিরে দিবসরাতি বায়ু করে মাতামাতি
বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা ;—
বহু পূর্বে আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন ভারতের
নগ-নদী-নগরী বাহিয়া
কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম
দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া।

ভালো করে দোঁহে চিনি, বিরহী ও বিরহিণী
জগতের দু'পারে দুজন,
প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান,
মনে মনে কল্পনা সৃজন।'
যক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গণে
দেখে শুনে ফিরে আসি চলি।
বর্ষা আসে ঘনরোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী। (বর্ষা যাপন, সোনারতরী)

'মেঘদূত,' 'ঋতু-সংহার' প্রভৃতি কাব্যের ভিতর দিয়া বর্ষাঋতু সম্বন্ধে কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে একটা ঐকাত্ম্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ষড়্-ঋতুর প্রত্যেক পরিবর্তনই কবি-চিত্তে স্পন্দন তুলিলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা ঋতুর একটা পৃথক্ আবেদন ছিল। কালিদাস বলিয়াছেন, 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'; এই কথাটি রবীন্দ্রনাথের কবিমনেরও একটা মূল কথা।

বর্ষার মেঘে ঘনাইয়া-আসা অন্ধকার—অবিরল ধারাপতনের একটানা সুর—বহির্বিশ্বের সকল রূপ—সকল শব্দকে যেন একটা গভীর যবনিকার অন্তরালে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, মন কেবলই ফিরিয়া আসে অন্তর রাজ্যের কল্পলোকে। সেই কল্পলোকে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ যখন বর্ষার সঙ্গীত রচনা করিতে গিয়াছেন তখন রবীন্দ্রনাথ শুধু রবীন্দ্রনাথ নহেন—সেখানে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া দিয়াছেন বর্ষার কবি কালিদাস—বর্ষার কবি বিদ্যাপতি এবং বাঙলার অন্যান্য বর্ষার কবি—বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব-কবিগণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-কথা স্পষ্টভাবে এবং অকুণ্ঠিতচিত্তেই স্বীকার করিয়াছেন। যেদিন—

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতিময় তরুলতিকা।

সেদিন—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি' আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা॥ (বর্ষামঙ্গল, কল্পনা)

বস্তুতঃ আমরা এই 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটিকে যদি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব, এখানে কালিদাস এবং বাঙলার বৈষ্ণব-কবিগণ কি করিয়া রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সুরের ঐকতান তুলিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ কোথাও ঢাকা পড়ে নাই—সুর কোথাও ম্লান হইয়া যায় নাই,—কালিদাস ও বৈষ্ণব-কবিগণ নেপথ্যে অবস্থান করিয়া বিচিত্র নেপথ্য-সঙ্গীত রচনা করিতেছেন—সেই নেপথ্য-সঙ্গীতের উপরে রবীন্দ্রনাথের সুর বিচিত্র ঔজ্জ্বল্য এবং গম্ভীর মহিমা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতিমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥

বর্ষার সমাগমে 'তরুণী পথিক-ললনা' আমাদিগকে কালিদাসের

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
(মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৮)

প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। এখানে আছে 'জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না'; কালিদাস বলিয়াছেন—

... ... ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ। (ঐ-১৬)

'তড়িৎ-চকিত-নয়না' কথাটি মনে করাইতে পারে কালিদাসের 'বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতচকিতৈঃ' (ঐ-২৭)। 'মালতিমালিনী' প্রভৃতি 'প্রিয়-পরিচারিকা'গণ নিশ্চয়ই কালিদাসকে স্মরণ করাইবে এবং বর্ষার 'অভিসারিকা'গণ সংস্কৃত-কবিগণের সহিত বৈষ্ণব-কবিগণকেও স্মরণ করাইয়া দিবে। 'ঋতু-সংহারে' আছে—

তড়িৎপ্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ
প্রয়ান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

'ঘনবনতলে' জয়দেবের 'বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ' প্রভৃতি স্মরণ করাইতে পারে। 'এস ঘননীলবসনা'র সহিত জয়দেবের অভিসারকালে 'শীলয় নীলনিচোলম্' স্মরণ করুন। 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা'র সহিত তুলনা করুন কালিদাসের 'পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাঃ' অভিসারিকাগণের (পূর্বমেঘ ৩৫) ও । বর্ষাগমে "আনো বীণা মনোহারিকা'র সহিত কালিদাসের 'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং' (উত্তর মেঘ—২৫) প্রভৃতির তুলনা করুন। ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ-পাতায় নবগীত করো রচনা,
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী ॥

প্রথমতঃ 'আনো মৃদঙ্গ' প্রভৃতির সহিত 'মেঘদূতে'র 'সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ' 'ললিতবনিতাঃ' প্রাসাদগুলির স্মরণ করুন। বর্ষা-সমাগমে 'নব অনুরাগিণী' এবং 'প্রিয়সুখভাগিনী'গণকে আবাহন জানান ব্যাপারেও সংস্কৃত-কবি, বৈষ্ণব-কবি এবং রবীন্দ্রনাথের ভিতরে ঐকমত্য দেখা যাইতেছে। 'কুঞ্জকুটীরে ভাবাকুললোচনা'র প্রেমের নবগীত রচনার কথা শকুন্তলা-নাটকের তৃতীয় অঙ্ক স্মরণ করাইতে পারে ; অবশ্য শকুন্তলা গান রচনা করিয়াছিল 'শুকোদর-সুকুমার-নলিনীপত্রে' ; ভূর্জপাতায় প্রেমগীত রচনা 'কুমার-সম্ভবে'র—

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র
ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ। (১।৭)

প্রভৃতি স্মরণ করাইতে পারে। আর 'মেঘ-মল্লার রাগিণী'তে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন সঙ্গীতকারগণের সহিতই 'সঙ্গত' করিয়াছেন সে কথার বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তারপরে দেখিতে পাই—

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দু'টি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত নয়নে।
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে॥

'কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী' প্রভৃতির সহিত স্মরণ করুন— 'পুষ্পাবতংস-সুরভীকৃত-কেশপাশাঃ' (ঋতুসংহার), 'জনিত-রুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ' (ঐ), 'মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভিরাযোজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য' প্রভৃতি। 'তালে তালে দু'টি কঙ্কণ কনকনিয়া' প্রভৃতির সহিত তুলনীয—

তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ॥ (উত্তরমেঘ, ১৮)

আরও—

'কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো' ইত্যাদি। (উত্তরমেঘ, ৩)

তারপরে—

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল আলস আবেশে।
শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী,
কোথা তোরা পুরকামিনী।
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী।
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী॥

ইহার সহিত তুলনা করুন 'মেঘদূতে'র—

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥ (পূর্বমেঘ, ৩৭)

আছে

তারপরে—

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমাল কুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলোনা,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা ॥

ইহা পদে পদেই আমাদিগকে বৈষ্ণব-কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

আমরা প্রায় সমস্ত কবিতাটিই উদ্ধৃত করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম—বর্ষা-বর্ণনায় অতীত কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ দেখাইবার জন্য। কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে মিল এখানে আমরা দেখিলাম এ-বিষয়ে অনুরূপ মিল আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি বাল্মীকি ও কালিদাসের ভিতরে, আবার প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বর্ষা-বর্ণনায় কবিগুরু বাল্মীকিও যে বৈদিক কবিগণের সাহিত্য হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই এমন নহে। কাব্যের ক্ষেত্রে অনুকরণে ও স্বীকরণে যে পার্থক্য কতখানি এই কবিতাটি হইতে এ কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এখানে কালিদাস এবং বৈষ্ণব-কবিদের নিকট হইতে কত গ্রহণ করিয়াছেন। —আবার সেই পুরাতনের পটভূমিকায রবীন্দ্রনাথ যাহা দিয়াছেন তাহাকে 'অপূর্ব' বলিতেও কোন বাধা দেখিতেছি না। প্রাচীনদের ভাবের টুকরাগুলি কবির মনে গিয়া নূতন করিয়া দানা বাঁধিয়াছে—নূতন সঙ্গীত আসিয়াছে—প্রকাশ-ভঙ্গি আসিয়াছে—সমস্ত জুড়িয়া পাইয়াছি একটা নূতন আস্বাদ; এবং সেই নূতন আস্বাদেই সমস্ত কবিতাটির সার্থকতা। পরবর্তী কালের 'ক্ষণিকা'র 'নববর্ষা' কবিতাটি আলোচনা করিলেও দেখিতে পাইব তাহার পশ্চাতেও একটি অস্পষ্ট অতীতের পটভূমিকা রহিয়াছে।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল রোম্যান্টিক কবিরই একটা গভীর অতীত-প্রীতি রহিযাছে। তাহার কারণ এই, রোম্যান্টিক কবি বাহিরের জগৎটাকে চান না, চান তাঁহার মানস-জগৎকে। যে জীবনটা বর্তমানের সেটা এত কাছের এবং এত স্পষ্ট যে তাহার বাহিরের রূপটাকে সব সময় ইচ্ছা করিলেও অস্বীকার করিতে পারি না; তাহার সকল কুশ্রীতা, দৈন্য এবং অসম্পূর্ণতা চিত্তকে অনভিপ্রেতভাবে আসিয়া পীড়িত করে। কিন্তু যে-জীবন সুদূর অতীতের সে অনেক দূরের বলিয়া তাহার বাহিরের রূপটা আপনা হইতেই য়াছে,—তাই তাহাকে অবলম্বন করিয়া কল্পনায় কল্পলোক

রচনা করিতে অসুবিধা হয় না। যাহা অনাগত তাহাও রহিয়াছে দূরে—ভবিষ্যের অন্ধকারে অস্পষ্ট রহিয়াছে তাহারও রূপ—তাই তাহাদ্বারাও রচনা করা যাইতে পারে আদর্শ কল্পলোক। রোম্যাণ্টিক কবিগণ তাই বর্তমান জীবন সম্বন্ধে একটা চিত্তের বৈরূপ্য বা ঔদাসীন্য লইয়া হয় ফিরিয়া চলিয়া যান অতীতের অস্পষ্ট লোকে অথবা তৃপ্তি খোঁজেন ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ আশার ভিতরে। রবীন্দ্রনাথ যে-যুগে যে-দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-যুগ এবং সে-দেশ সম্বন্ধে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইয়াছে,—

বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।

কিন্তু কালিদাসের যুগটির উপরে কল্পনার তুলিকার সাহায্যে যত ইচ্ছা রঙ্ বুলানো যাইতে পারে। কালিদাস যে-যুগে যে-দেশে জন্মিয়াছিলেন সেই দেশে সেই যুগেও নিশ্চয়ই দুঃখ ছিল, দারিদ্র্য ছিল,—অবিচার ছিল, অত্যাচার ছিল—কুশ্রীতা ছিল, অপমান ছিল; পারিপার্শ্বিক জীবনের রূঢ় বাস্তব রূপটি হয়ত কবিচিত্তকে পীড়িত করিয়াছে—অতএব তিনি কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া লইলেন হিমালয়ের কৈলাস শিখরের উৎসঙ্গে অবস্থিত একটি অলকা নগরী, যেখানে—

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥
যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ।
আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ
নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ
বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥

(মেঘদূত, উত্তরমেঘ ২-৪)

"রমণীগণের হস্তে লীলাকমল, অলকে কুন্দকলির মালিকা, লোধ্র ফুলের

রেণুর দ্বারা আননশ্রী পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কেশচূড়াপাশে নবকুরুবক, কর্ণে মনোহর শিরীষফুল,—আর সীমন্তে বর্ষাগমজাত কদম্ব ফুল।"

"যেখানে গাছগুলিতে নিত্য ফুল ফোটে এবং (সেই কারণেই) ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখর; হংসশ্রেণী দ্বারা রচিত হইয়াছে কাঞ্চি যাহাদের এমন সরোবর-গুলিতে নিত্যই পদ্ম ফুটিয়া থাকে; কেকারবের জন্য উৎকণ্ঠিত ভবনশিখীগুলির কলাপ নিত্য-প্রকাশমান, রাত্রিগুলিতে নিত্য জ্যোৎস্না—তাই অন্ধকার প্রতিহত।"

"যেখানে আনন্দোত্থিত নয়ন-সলিল ব্যতীত অন্যকারণে অশ্রু নাই; যে তাপ পুষ্পধনু মদন হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রিয়মিলনে আবার প্রতিনিবৃত্ত হব সে তাপ ছাড়া অন্য তাপ নাই, প্রণয়-কলহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে বিরহের উৎপত্তি নাই, যৌবন ছাড়া আর কোনও বয়স নাই।"

এইরূপ শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিয়া কালিদাস যে অলকাপুরীর বর্ণনা কবিলেন তাহার কোথায়ও কোনও অপূর্ণতা নাই, কল্পনার দানে সে শুধু প্রেম-সুখ-সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ ধাম। কালিদাস উজ্জয়িনীতে বসিয়া তাঁহার এই স্বপ্নের অলকাপুরীকে যেমন কবিয়া আস্বাদ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমন করিযাই আবাব কালিদাসের যুগটিকে আস্বাদ করিয়াছেন। কালিদাসের যুগটি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল একটি স্বপ্নলোক, যে-লোকে দুঃখ ছিল না দাবিদ্র্য ছিল না—জীবন সংগ্রামের কোন কঠোরতা ছিল না—ছিল শুধু সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ। এই জন্যই কালিদাসের যুগের প্রতি এবং কালিদাসবর্ণিত যুগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আর অনুরক্তির সীমা নাই। 'প্রাচীন' সাহিত্যের ভিতরে 'মেঘদূত' সম্বন্ধে আলোচনার ভিতরে এই অসীম অনুরক্তিই কত ব্যাকুলতা লইযা দেখা দিয়াছে। কবি সেখানে বলিয়াছেন,—

"রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্যদিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের জন্য আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রাক্কালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক্ পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং গ্রামের প্রান্তে জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল! আর সেই যে অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত, তাহারাই বা কোথায়? আর সেই

সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী! অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের মন ভারাক্রান্ত নহে—আমরা কেবল সেই যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে পুরবধূদিগের কেশ-সংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল তাহারই একটু গন্ধ পাইতেছি এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবন-শিখরের উপরে পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত, তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রকাণ্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাজধানীর নির্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিত হৃদয়ে ব্যাকুল চরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে, তাহারই একটুখানি ছায়ার মতো দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে, তাহার পায়ের কাছে নিকষে কনক-রেখার মতো যদি অমনি একটুখানি আলো করিতে পারা যায়।”

এতখানি অতীত-প্রীতির সহিত অতি স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে একটা বর্তমানের প্রতি অবজ্ঞা,—ফলে অতীতের কালিদাসের যুগের যাহা কিছু সকলই দেখা দিযাছে একটা ‘শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা’ লইয়া; আর তুলনায় বর্তমান কাল অনেক নীচে নামিয়া যাইতেছে তাহার ‘ইতরতা’ লইয়া।—

“আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদীগিরি নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি রেবা সিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটা শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা, সিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলী হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।”

‘মানসী’র ‘মেঘদূত’ কবিতার ভিতরেও কালিদাস রচিত একটি কল্প-লোকের মোহ রবীন্দ্রনাথের গৃহত্যাগী উদাসী মনকে শুধু সুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে; মুক্তগতি-মেঘপৃষ্ঠে কবির মনও শুধু মন্থর গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহিতেছে সেই স্বপ্নরাজ্যে।—

কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট, কোথা রহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি বেত্রবতীকূলে

পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম র'য়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে'
বনস্পতি। না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বরাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হ'তেছে বিকল ;
ভ্রূ-বিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;—

এ-কথা রবীন্দ্রনাথের বহুবার মনে হইয়াছে, তিনিই যেন যুগান্তের পারে নির্বাসিত কবি কালিদাস—স্বপ্নে আজিও তাই তিনি আধুনিক কাল হইতে তাঁহার সেই পূর্বজন্মের জীবনে ফিরিয়া যান সেই প্রথম প্রিয়ার সন্ধান করিতে। স্বপ্নে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়—কিন্তু শুধু করুণ আঁখিতে উভয়েরই নীরব ভাষা, কারণ 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি', কালিদাসরূপে তাঁহার প্রিয়াকে যে ভাষায় তিনি প্রেম-সম্ভাষণ জানাইতেন এই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে সে ভাষা আর তাঁহার জানা নাই, আর সে ভাষায় সম্ভাষণ না জানাইতে পারিলে স্বপ্নপুরীর সে প্রিয়ার সহিত যেন কথা বলাই চলে না।

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলা-পদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দ কলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।

বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে ॥

মহাকাল মন্দিরেব মাঝে
তখন গম্ভীবমন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্যপরে সন্ধ্যাবশ্মি রেখা।
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সঙ্কীর্ণপথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তাবি দুই ধাবে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোবণেব শ্বেতস্তম্ভ পবে
সিংহের গম্ভীব মূর্তি বসি' দম্ভভবে ॥ (স্বপ্ন, কল্পনা)

কখনো কবি মনে মনে কল্পনা কবিয়াছেন, তিনি যদি কালিদাসেব কালে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে কি হইত। তিনি তখন কালিদাসেব যুগটিকে ঘিবিযা, কালিদাসেব কাব্যে বর্ণিত—বিশেষ কবিযা মেঘদূত এবং শকুন্তলায বর্ণিত জীবনযাত্রা ঘিরিয়া কত মোহময কল্পনায আত্মপ্রসাদ লাভ কবিযাছেন। কালিদাসেব সেই যুগ—সেই জীবন—তাহাকে এমন কবিয়া ভাবিতেও সুখ। উজ্জযিনীব বিজন প্রান্তে কাননঘেরা একটি বাড়িতে মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে সংঘাত-আবর্তহীন মন্থব ধাবায় কবিব জীবনতবী বহিয়া যাইত। তখন—

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি, থাকত নাকো ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম, যেন নাইক মৃত্যুজরা।
ছ'টা ঋতু পূর্ণ ক'রে
ঘটত মিলন স্তবে স্তবে,
ছ'টা সর্গে বার্তা তাহাব বৈত কাব্যে গাঁথা।
বিরহ-দুখ দীর্ঘ হ'ত,
তপ্ত অশ্রু নদীর মতো,
মন্দগতি চলত রচি' দীর্ঘ করুণ গাথা।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাক একটুমাত্র ত্বরা ॥ (সেকাল, ক্ষণিকা)

এই দ্বন্দ্ববিহীন অনাবিল লঘুমন্থর জীবনের চারিপাশে—

অশোক কুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হ'ত ফুল্ল, প্রিয়ার মুখের মদিরাতে।

প্রিয় সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি' করিত রব,
রেবার কূলে কলহংস-কলধ্বনির মতো।

কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোন নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী ঝঙ্কারিত কত।

আসত তারা কুঞ্জবনে চৈত্র জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক শাখা উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে

কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রৈত হাতে কী জানি কোন্ কাজে।

অলক সাজত কুন্দফুলে,
শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব-নীপের মালা।

ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা।

কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে॥

(সেকাল, ক্ষণিকা)

এই কবিতার শেষের দিকে কবি অবশ্য বর্তমান যুগকে লইয়াই সান্ত্বনা লাভ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কবিতাটির প্রথম অংশের সহিত শেষ অংশের তুলনা করিলে দেখিতে পাইব কবির এই সান্ত্বনা কত লঘু এবং দুর্বল। যে সকল আধুনিক বিনোদিনী বেণী দোলাইয়া চলেন তাঁহাদের পানে তাকাইয়া কবি যতই সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা করুন, তাঁহার মন পড়িয়া রহিয়াছে মালবিকার দিকে—

কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে
কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় কালিদাস শুধু কবি—তিনি ছিলেন চিরানন্দময় অলকাব অধিবাসী।—

আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিবানন্দময
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি' উমাপতি ভূমানন্দ ভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেইক্ষণে
গাহিতে বন্দনা-গান—গীতি সমাপনে
কর্ণ হ'তে বর্হ খুলি' স্নেহহাস্য ভবে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়াপরে॥ (কালিদাস, চৈঃ)

এই হরগৌরীর সহিতও কালিদাসের যেন একটি সুকুমার ঘনিষ্ঠতা ছিল; হর-গৌরীর প্রেম-গীতি রচনা করিয়া কবি নিজেই দেবদম্পতিকে তাহা শুনাইয়া আসিতেন—প্রমথগণ তখন চারিদিক ঘিরিয়া দাঁডাইযা থাকিত। তখন—

শিখরের পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যা-মেঘস্তর,
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি' পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত-গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে, যবে অবশেষে

ব্যাকুল সরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে ॥ (কুমারসম্ভব গান, ঐ)

আমরা পূর্বেই (প্রথম ভাগে) কালিদাসের 'ঋতু-সংহার' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, কালিদাসের নিকটে ছয়টি ঋতু যেন শুধু ভোগের উপকরণ লইয়া দেখা দিত,—কালিদাস যেন যৌবরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট রূপে শুধু নিবলস ভোগ-বিলাসের বাসনায় উন্মুখ থাকিতেন। কালিদাসের সেই যৌবরাজ্যের সম্রাট রূপটি অঙ্কিত করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ 'ঋতু-সংহার' কবিতাটিতে।—

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য সিংহাসন 'পরে।
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণ রাজছত্র ঊর্ধ্বে ক'রেছে ধারণ
শুধু তোমাদের পরে। ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি',
নব নব পাত্র ভরি' ঢালি দেয় তা'রা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে। ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসর ভবন।
নাই দুঃখ নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী ॥ (চৈতালি)

শুধু প্রেমের দিক হইতে, নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিন্ত ভোগ-সম্ভাবনার দিক হইতেই নয়, খুঁটি-নাটি সমস্ত দিক হইতেই কালিদাসের যুগটা বর্তমান যুগ হইতে মধুর এবং শ্রেষ্ঠ মনে হইত। কালিদাসের যুগে কাব্য রচিত হইলে মালবিকার দলকে কবি সেগুলি পড়িয়া শুনাইতেন,—প্রাপ্তি ছিল মালবিকাগণের স্বহস্তে পরাইয়া দেওয়া 'বেল ফুলের মালা'। আধুনিক মালবিকাগণের সঙ্গে কবির সেরূপ কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহারা ছাপার বই কিনিয়া পড়ে—আর 'দোকানে পাঁচসিকে দিয়েই খালাস'। কিন্তু—

উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল-ডাঙার অম্নিবাস্-এ চড়ে।
মন বলচে নিঃশ্বাস ফেলে—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য—
আর আমি যদি হতেম—কী হবে বলে।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে। (পত্র, পুনশ্চ)

আজিকার দিনের যাহা রমণীয়, যাহা চিত্তকে মুগ্ধ করে তাহাকেও কবি আজকার দিনের কিছু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই,—তাহার রমণীয়তাকেও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কালিদাসের যুগের জিনিস বলিয়া। তাই আজকার দিনের 'পুষ্পচয়িনী' দেখিয়া তিনি যেখানে সত্যই মুগ্ধ হইয়াছেন সেখানে তিনি তাহাকে চিরন্তনের 'পুষ্পচয়িনী' করিয়া কালিদাসের যুগের 'পুষ্পলাবী' রমণীগণের সহিত যুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাই কবি এ-যুগের 'পুষ্পচয়িনী'কে প্রশ্ন করিয়াছেন,—

হে পুষ্পচয়িনী,
ছেড়ে আসিযাছ তুমি কবে উজ্জয়িনী
মালিনী ছন্দের বন্ধ টুটে'।
... ...
তুমি আজ
করেছ যে অঙ্গসাজ
নহে সগু আজিকার।
কালোয় রাঙায় তার
যে ভঙ্গীটি পেয়েছে প্রকাশ
দেয় বহুদূরের আভাস।
মনে হয় যেন অজানিতে
রয়েছ অতীতে,
মনে হয় যে প্রিয়ের লাগি
অবন্তী নগর-সৌধে ছিলে জাগি'

তাহারি উদ্দেশে,
না জেনে সেজেছ বুঝি সেযুগের বেশে।
মালতী শাখার 'পরে,
এই যে তুলেছ হাত তন্বীভরে
নহে ফুল তুলিবার প্রয়োজনে,*
বুঝি আছে মনে
যুগ অন্তরাল হ'তে বিস্মৃত বল্লভ
লুকায়ে দেখিছে তব সুকোমল ও-কর-পল্লব।

(পুষ্পচয়িনী, বিচিত্রিতা)

সাধারণ কেরাণীর গৃহিণী চারুপ্রভাও যেদিন পাশের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুলে বেণী পাকাইয়া কাঁটা বিঁধায় সেদিনও কবি তাহার স্বামীকে দিয়া তাহাকে তাহার আটপৌরে 'চারু' নামে সম্ভাষিত করাইতে পারেন নাই; সেখানেও দেখি—

আজ প্রথম আমার মনে হোলো
অল্প মজুরির দিন-চালানো
একটা মানুষের জন্যে
নিজেকে-ত সাজিয়ে তুলছে
আমাদের ঘরের পুরানো বউ
দিনে দিনে নতুন-দাম-দেওয়া রূপে।
এ তো নয় আমার আটপহুরে চারু।
ঠিক এমনি ক'রেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপবেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে।
অমরুশতকের চৌপদীতে
—শিখরিণীতে হোক স্রগ্ধারায় হোক—
ওকে ত ঠিক মানাত।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী। (সম্ভাষণ, শ্যামলী)

আমরা উপরে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক কবিধর্ম এবং তজ্জনিত অতীত স্মৃতি ও প্রীতির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। এই রোম্যান্টিক ধর্ম সম্বন্ধে কবি নিজেই সচেতন ছিলেন এবং নিজেই সে-কথাটার বহুপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। 'সানাই'র 'অনসূয়া' কবিতাটিতে কবি অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোম্যান্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে পথ জানে—
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।
আকাশকুসুম-কুঞ্জবনে,
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার।
আজি এই চৈত্রের খেয়ালে
মনেরে জড়াল ইন্দ্রজালে।
দেশকাল
ভুলে গেল তার বাঁধা তাল।
নায়িকা আসিল নেমে আকাশ-প্রদীপে আলো পেয়ে।
সেই মেয়ে
নহে বিংশ শতকিয়া
ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গ-হাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিক্‌স্‌-পরীক্ষাবাহিনী।
আতপ্ত বসন্তে আজি নিঃশ্বসিত যাহার কাহিনী।
অনসূয়া নাম তার, প্রাকৃত ভাষায়
কারে সে বিস্মৃত যুগে কাঁদায় হাসায়,
অশ্রুক হাসির ধ্বনি মিশায় সে কলকোলাহলে
শিপ্রাতটতলে।

পিনদ্ধ বল্কল-বন্ধে যৌবনের বন্দী দুত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।
অযতনে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ
বনপথে মেলে চলে মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস।
প্রিয়কে সে বলে "পিয়"
বাণী লোভনীয়,
এনে দেয় রোমাঞ্চ হরষ
কোমল সে ধ্বনির পরশ।

এই রোম্যান্টিক কবিধর্মের জন্যই দেখিতে পাই, কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বেশী করিয়া দেখিয়াছেন জীবনের সেই অংশটা—যেটা সুন্দর, মোহময়, রমণীয়। কিন্তু জীবনের যে আরও একটা দিক পড়িয়া রহিয়াছে তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিকে তেমন বেশী আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

অতীত-প্রীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই রোম্যান্টিক কবিধর্মের আলোচনায় উল্লেখ করা যাইতে পাবে কালিদাসের 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি কাব্যের সহিত আর একখানি কাব্য—তাহা বাণভট্টের 'কাদম্বরী'। এই 'কাদম্বরী'র ভিতরে বর্ণিত গভীর বনের নির্জন প্রান্তে মহাদেবের মন্দির এবং সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রেমপ্রতিমা মহাশ্বেতার অপূর্ব প্রেম-সাধনা শুধু রবীন্দ্রনাথের নহে, সকল কাব্যরসিকের চিত্তেই গভীর ভাবে দাগ কাটে। যে প্রদোষের আলো-আঁধারের ভিতরে কবি শিবমন্দিরে নির্জন প্রাঙ্গণে এই স্নিগ্ধস্নাতা শুভ্রবসনা প্রেম-তপস্বিনীকে বীণাযোগে সঙ্গীতনিরতা রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সকলেরই হৃদয় আকৃষ্ট করে। এখানকার এই দৃশ্যটির একটা আভাস রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা'র বহুস্থানে নির্জন শিবমন্দিরের বর্ণনায় ইহার আভাস আছে; 'চিত্রা'র 'আবেদন' কবিতায় সংসারের ওপারে 'কাব্য লক্ষ্মী'র মন্দির বর্ণনায় আমরা ইহার আভাস লক্ষ্য করিয়াছি। 'চিত্রা'র 'বিজয়িনী' কবিতার 'অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন নামিলা স্নানের তরে' প্রভৃতি কাদম্বরীর 'অচ্ছোদ সরসীনীরে' মহশ্বেতার স্নানের দৃশ্য মনে করাইয়া দিবে। 'কল্পনা'র 'স্পর্ধা' কবিতার ভিতরে দেখি—

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছামিছি,
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, 'ছি ছি!'

সখী ওলো সখী, কহিনু শপথ ক'রে
তবু সে গেল না সরে।
অধরে কপোল পরশ করিল তবু,
কাঁপিয়া কহিনু, 'এমন দেখিনি কভু!'
সখী ওলো সখী, একি তার বিবেচনা,
তবু মুখ ফিরাল না।
আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল—
কহিনু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল!'
সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়,
মিছে তারে অনুনয়।

এই দৃশ্যটিই যে 'কাদম্বরী'র মহাশ্বেতার সহিত চন্দ্রপীড়ের প্রথম মিলনের দৃশ্যের ছায়ায় অঙ্কিত তাহা বুঝিতে কোনই অসুবিধা হয় না। 'নবীনে'র মধ্যে কবি বলিয়াছেন, 'নন্দনবন থেকে কোমল আলোর শুভ্র সুকুমার পারিজাতস্তবকে তার ডালি ভ'রে আনল। সেই ডালিখানিকে ওই কোলে নিয়ে বসে আছে কোন মাধুরীর মহাশ্বেতা।' 'মহুয়া'র 'একাকী' কবিতায় দেখি,—

অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে,
জনশূন্য তুষার শিখরে
কোন্ মহাশ্বেতা, কোন তপস্বিনী বিছাল অঞ্চল,
স্তব্ধ অচঞ্চল,—ইত্যাদি।

'পরিশেষে'র 'জরতী' কবিতায় দেখি—

হে জরতী মহাশ্বেতা
দেখেছি তোমাকে
জীবনের শারদ অম্বরে
বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র লঘু স্বচ্ছ মেঘে।

কিন্তু অন্য কবি এখানে সেখানে বিশেষ উপলক্ষ্যে দেখা দিয়াছেন, কালিদাস দেখা দিয়াছেন বিবিধ উপলক্ষ্যে। তিনি আসিয়াছেন রসিকতার ভিতরে —তিনি আসিয়াছেন ছোট্ট পাখীর প্রসঙ্গে—তিনি আসিয়াছেন বর্তমানের সহিত সকল দ্বন্দ্বে। আধুনিকাদের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতে গিয়াও কবি বলিয়াছেন—

সেকালেও কালিদাস বররুচি-আদিরা ;
পুরসুন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা,
যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে,
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে।

(আধুনিকা, প্রহাসিনী)

আধুনিক 'নারী প্রগতি' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয়নি তো চিনে,
কেনেনি ইস্টিশনের টিকেট ;
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলেনি ক্রিকেট্
চণ্ড বেগের ডাণ্ডাগোলায় ;
তারা তো মন্দ মধুর দোলায়
শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে।

(নারী প্রগতি, প্রহাসিনী)

'অনাদৃতা লেখনী' (প্রহাসিনী) যেই সম্ভাব্য পত্র লিখিয়া পাঠাইতে পারিত তাহার ভিতরেও উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছেন কালিদাস।—

'স্বাধিকারে প্রমত্তা কি ছিলাম কোনদিন।'—ইত্যাদি।

সে লেখনীটির নামও 'কালিদাসী', বোধহয় 'লেখনী' ঈ-কার যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বলিযা।

'অধীরা'র সঙ্গে কালিদাসের যুগের ধীরা নায়িকাগণের দ্বন্দ্বটুকু ফুটাইতে কবি বলিয়াছেন,—

করুণ ধৈর্য গণে না দিবস,
সহে না পলেক গৌণ ;
তাপসের তপ করে না মান্য,
ভাঙে সে মুনির মৌন।
মৃত্যুরে দেয় টিটকারী তার হাস্যে,
মঞ্জীরে বাজে যে ছন্দ তার লাস্যে,

নহে মন্দাক্রান্তা,
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমল কান্তা। (অধীরা, সানাই)

'রোগশয্যায়' বসিয়াও কবি চড়ুই পাখীকে বলিয়াছেন—

যখন প্রাতে দোয়েলরা দেয় শিস
কবির কাছে পায় তারা বক্‌শিশ,
সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম সুর সাধি
লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি,
সকল পাখি ঠেলে
কালিদাসের বাহবা সে-ই পেলে।
তুমি কেয়ার কর না তার কিছু
মানো নাকো স্বরগ্রামের কোনো উঁচুনিচু।
কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙ্গা চেঁচামেচি
বাধাও কি কৌতুকে।
নবরত্ন সভায় কবি যখন করে গান
তুমি তারি থামের মাথায় কি কর সন্ধান।
কবিপ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী,
সাবা মুখর প্রহর ধ'রে তোমার মেশামেশি। (৬নং)

॥ ৪ ॥

কিন্তু 'এহো হয়, আগে কহ আর'। পূর্বে আমরা যে-সকল আলোচনা করিলাম তাহার ভিতর দিয়া কালিদাসের সহিত নানাদিক হইতে রবীন্দ্রনাথের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তার সন্ধান পাওয়া যাইবে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উপরে কালিদাসের প্রভাব বিচার করিতে ইহাই যথেষ্ট নহে। সে প্রভাব আরও স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যেখানে কালিদাস আসিয়া রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাবধারার ভিতরে নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যের ভিতরে বিশেষ করিয়া 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' রবীন্দ্রনাথের কবিমনে বিভিন্নযুগে বিভিন্ন প্রতিফলন লাভ

করিয়াছে। আমরা গ্রন্থের প্রথমভাগের আরম্ভেই এ কথার আভাস দিয়া আসিয়াছি যে এই প্রতিফলনের ফলে যে কাব্য-সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ভিতরে প্রাচীনের দানকেও যেমন আমরা ছোট করিতে পারি না, বর্তমান কবির স্বকীয়তাকেও অস্বীকার করিতে পারি না। অখণ্ড সাধনার এইখানেই বৈশিষ্ট্য। এ-কথার আভাসও আমরা পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি যে 'মেঘদূত' কাব্য রবীন্দ্রনাথের মানস-লোকে প্রবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার ভিতরে যে বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই অতীত 'মেঘদূতে'র পটভূমিকায় 'নব মেঘদূত' এবং সত্যই 'অপূর্ব অদ্ভুত'। এ সব ক্ষেত্রে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, কালিদাসের কবিমনই সমানধর্মা রবীন্দ্রনাথের কবি-মনের ভিতরে আসিয়া যুগোপযোগী বিভিন্ন বিবর্তন লাভ করিয়াছে; আবার একথাও সত্য হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি নিজস্ব ভাবধারা রস-পরিপোষণের জন্য সায় খুঁজিয়া পাইয়াছে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যে। এইজাতীয় প্রভাবের ভিতরে এই দুইটা সত্যই মিলিয়া আছে; অর্থাৎ কালিদাসও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা উদ্বোধিত এবং পরিপুষ্ট করিযাছেন, আবার রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের কাব্য-গুলির ভিতরে নিজের ভাবধারা আরোপিত করিয়া নূতন অর্থ-সঞ্চার করিযাছেন। কালিদাসের কাব্যে যে-কথা ছিল অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সম্প্রসারণের দ্বারা গভীর করিয়া তুলিয়াছেন; যে কথা ছিল না কালিদাসের কাব্যে তাহাকে কালিদাসের পরিবেষ্টনীর ভিতরেই নূতন কবিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। অথবা এ-কথাও বলা যাইতে পারে যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস তাঁহার মনের তারে যে সুর বাঁধিয়াছিলেন তাহা এত যুগের বায়ুকম্পনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের তারে নূতন নূতন ঝঙ্কার দিয়াছে। এ সুর অনেক খানিই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুর—কালিদাস শুধু অতীতের যবনিকার অন্তরাল হইতে নেপথ্য সঙ্গীত রচনা করিতেছেন; সেই নেপথ্য-সঙ্গীতের সহিত গভীর সঙ্গতিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুরও একটা নূতন মহিমা লাভ করিযাছে।

'মানসী'র ভিতরে রবীন্দ্রনাথ যে 'মেঘদূত' রচনা করিয়াছেন তাহার ভিতরেই অতীত নেপথ্য-সঙ্গীতের উপরে নূতন সুরের নূতন রাগিণী আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। কালিদাসের সৌন্দর্যপুরী অলকার মধ্যস্থিতা বিরহিণী যক্ষবধূ নিতান্তই রক্তমাংসের প্রিয়া—সে বিরহিণী নারী মাত্র; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অলকা সৌন্দর্যের কল্প-লোক—আর সেখানকার বিরহিণী প্রিয়া

কবির অশরীরী মানস প্রতিমা,—প্রেম-সৌন্দর্যের গভীর রহস্যালোকে সে কবির গহন ভাবলোকেই অবস্থান করিতেছে।

এই মতো মেঘরূপে ফিরি' দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি।
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবর-কূলে
মণিহর্ম্যে অসীম-সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা,
মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তা'রে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশি-রেখা
পূর্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হ'যে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক; যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে একাকী জাগিয়া।

আমাদের এই আটপৌরে ভাঙাচোরা সংসারের নেপথ্য-লোকে যে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যলোক বিরাজ করিতেছে এবং সেখান হইতেই যে জীবনের সকল সৌন্দর্য-প্রেমের রহস্য উৎসারিত হইতেছে ইহা রবীন্দ্র-কাব্যের ভিতরে একটি মূল ভাব-বিশ্বাস। এই সৌন্দর্যলোক সম্বন্ধেই 'চিত্রা'র 'জ্যোৎস্নারাতে' কবিতায় কবি বলিয়াছেন,—

নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

এখানে বেশ বোঝা যায়, সৌন্দর্যলোক সম্বন্ধে এই ভাব-বিশ্বাস এখানে রূপায়ণ লাভ করিয়াছে কালিদাসের 'মেঘদূত'কে আশ্রয় করিয়া। কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন 'কালিদাসে' তাহার অতি ক্ষীণ ব্যঞ্জনা মাত্র রহিয়াছে। অলকাপুরীর এবং তন্মধ্যস্থিত বিরহিণী যক্ষবধূর কালিদাস যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার ভিতরকার একটি ব্যঞ্জনায় ভর করিয়া বাস্তবলোক হইতে ভাবলোকে উত্তরণ খুব সহজ এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যঞ্জনাকেও অনেক দূর ছাড়াইয়া গেলেন; তাহার ফলে কালিদাস হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়া তিনি কালিদাসের কাব্য-মহিমার সাহায্য লইয়া সম্পূর্ণ 'নব মেঘদূত' রচনা করিয়াছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে' এই 'মেঘদূতের' আলোচনায় কবি বলিয়াছেন—

"কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই।"

এই প্রসঙ্গে কবি 'সর্বব্যাপী মনের' কথা আনিয়াছেন, বৈষ্ণবের আর্তি 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির' প্রভৃতির স্মরণ করিয়াছেন। দৃষ্টির অনেক দূরে অবস্থিত এই অসীম দয়িত এবং তাহার সহিত গিরিশৃঙ্গে 'একাকী দণ্ডায়মান' মানুষের অতলস্পর্শ বিরহের কোন আভাসও কালিদাসের মধ্যে নাই। আমরা প্রথম ভাগে কালিদাসের 'মেঘদূত' আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি 'মেঘদূতে'র কবি একান্ত রসিক সম্ভোগের বিলাসী কবি; 'মেঘদূতে' বিরহ একটা বিরহের বিলাস মাত্র—সে সম্ভোগকেই বিচিত্র এবং রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে; তাহার ভিতরে এই অধ্যাত্ম বিশ্বাসের ব্যঞ্জনামাত্রও কোথায়ও নাই—কবি এখানে ভাবব্যঞ্জনার সম্প্রসারণের ফলে কালিদাস হইতে দূরে সরিয়া নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

'চৈতালি'র 'মেঘদূত'-এ কবি বলিতেছেন, কবি কালিদাস যেদিন মিলনের মরীচিকার ভিতরে যৌবনের বিশ্বগ্রাসী অহমিকায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেদিন সম্ভোগের রঙ্গালয়ে আসীন তাঁহাকে ছয় ঋতু-সহচরী আসিয়া চামর-ছত্র দ্বারা সেবা করিত সেদিন কবি বহির্বিশ্ব হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন একটা উৎকট আত্মকেন্দ্রিকতায়; তারপরে দেবতার অভিশাপের

মত্তন সেই সুখরাজ্যে বিচ্ছেদের শিখা নামিয়া আসিল—সেই বিরহের ভিতরে বিশ্বজগতের সহিত কবির অন্তরের মধুর যোগ স্থাপিত হইল—এবং সেই বিশ্বজগতের সহিত আন্তরিক যোগেই জাগিল 'মেঘদূতে'র বিরহ-গান—

সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
দেখা দিল চারিদিকে পর্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম। বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে॥

ইহাও কালিদাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনা, এখানেও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে আর একটি কথা—যে কথা রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কবির সহিত এক কণ্ঠে তাঁহার বহু কবিতার ভিতরে বলিয়াছেন; সে কথাটি এই—প্রিয়মিলনে আমরা নিজেদের ভিতবে থাকি সঙ্কুচিত হইয়া—বিরহে চিত্তের ঘটে নিঃসীম প্রসার—সেই প্রসারিত চিত্তের ভিতর দিয়াই বিশ্বমানবের সহিত—তথা বিশ্বজগতের সহিত আমাদের গভীর যোগ। মিলনে আমরা চলি না—তখন বেষ্টনী পড়ে ছোট্ট একটি বাসকক্ষের চারিদিকে—সেই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর ভিতরেও আমরা নিশ্চল; বিরহে ভাঙিয়া যায় বেষ্টনী—সীমার বাহিরে তখন আমরা চলি—আমাদের প্রেম চলে। এই কথা কবি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন 'পুনশ্চে'র 'বিচ্ছেদ' কবিতায়। যে কোন বর্ষার দিন 'মেঘদূতে'র দিন নয়; যে দিনটা চারিদিক হইতে অচলতায় বাঁধা—মেঘ চলে না, হাওয়া চলে না—টিপি টিপি বৃষ্টি ঘোমটার মতন পড়িয়া থাকে দিনের মুখের উপর, সেদিন 'মেঘদূতে'র দিন নয়।

যে দিন মেঘদূত লিখেচেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীলপাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেচে মেঘ,
পুবে হাওয়া বয়েচে শ্যামজম্বু-বনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।
যক্ষ নারী বলে উঠেচে
মাগো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।
মেঘদূতে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার পরে,
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েচে জয়ী। (বিচ্ছেদ, পুনশ্চ)

এইটাই যেন মেঘদূতের বড় কথা। মিলনে প্রেম চলে না—তাই সে আনে আমাদের চিত্তের বন্ধন। মেঘদূতের দিনে বাহিরের সংসারটা একান্ত অস্থির ভাবে চলমান হইয়া ওঠে—সংসারের সেই চলমানতার সহিত যোগ দেয় আমাদের বিরহের চলা—ব্যথার ভারকে পরাজিত করে চলার মুক্তি।

সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝরণায়, উদ্বেল নদীস্রোতে,
মুখরিত বন-হিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেচে
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী।
একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়েছিল
নিভৃত বাসকক্ষের বাইরে।
যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরলো
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হোলো শেষ। (ঐ)

যক্ষের প্রেম যতক্ষণ বিরহে চঞ্চল হইয়া মেঘের মতন চলিয়াছে, ততক্ষণ বেদনা নাই—সে প্রেম চলার আনন্দে উচ্ছল; কিন্তু বেদনা দেখা দিল কৈলাসের অলকাপুরীর বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে—কারণ, অলকার নিরন্তর প্রতীক্ষমান প্রেম চলে না।—নিত্য পুষ্প, নিত্য জ্যোৎস্নার ভিতরেও সেখানে যক্ষবধূ নিত্যই একা—সে একান্ত বিরহিণী। যক্ষের প্রেম এখানে অপূর্ণ—যে অপূর্ণ সেই চলিয়াছে অভিসারিকার বেশে পূর্ণের দিকে নব নব আনন্দের পর্যায়ে, কিন্তু যে পূর্ণ সে একা—সে পায় না পথ চলার আনন্দ—সে নিরন্তর অপেক্ষা করে শুধু 'দুই' এর জন্য।

যেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা।

অপূর্ণ যখন চলেচে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করচে স্থির হয়ে ;
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা, সেই তো একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে। (ঐ)

কিন্তু পূর্ণ যে সেও ত শুধু নিশ্চল বসিয়া নাই,—তাহার প্রতীক্ষার ভিতরেই আছে চলার আহ্বান—সে আহ্বান আগাইয়া আসে অপূর্ণের অভিসার পথে ; 'বিরহী অপূর্ণে'র চলা আর 'একাকী পূর্ণে'র আহ্বান এই দুই'ত মিলিয়া মিশিয়া এক সুরে এক তালে চলে সৃষ্টির ভিতরে। তাই—

ভুল বলা হ'ল বুঝি
সেও ত নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,—
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলচে একই তালে।
তাই নদী চলেচে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। (ঐ)

'শেষ-সপ্তকে'র আটত্রিশ সংখ্যক কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এক-দিন যক্ষের প্রেম ছিল আপনার ভিতরেই বদ্ধ—যেমন গন্ধ থাকে পদ্মকুঁড়ির ভিতরে। সেদিন সঙ্কীর্ণ সংসারের একান্তে ছিল যক্ষের প্রেয়সী 'যুগলের নির্জন উৎসবে' ;—যক্ষ সেদিন তাহার সম্ভোগের আলিঙ্গনের ভিতরেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহার প্রিয়াকে, যেমন করিয়া চাঁদকে হারাইয়া ফেলে শ্রাবণের ঘন মেঘ আপনার আলিঙ্গনের আচ্ছাদনে। তারপরে—

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে
কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে।

খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়ি-গুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে
বৃষ্টির জলে ভিজে' সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।

শুধু তাহাই নয়, মিলনের আশ্রয় যে প্রিয়া, সে ছিল শুধু রক্ত-মাংসের প্রিয়া; বিরহে যক্ষ হইয়াছে কবি, সে তাই নিজের 'অন্তর আঙিনায়' গড়িয়া তুলিয়াছে অপূর্ব মূর্তি—'স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী'। এই মানসপ্রতিমা নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী মানব-প্রতিমারই রসরূপ—সে আজ আসন পাইয়াছে 'অনন্তের আনন্দমন্দিরে'। 'শেষ-সপ্তকে'র পরিশিষ্টে যে কবিতাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড) তাহার ভিতরে 'যক্ষ' কবিতাটিতেও কবি ঠিক এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

এই কথাটিই অন্যভাবে বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'র ভিতরকার 'মেঘদূত' লেখাটিতে। সংসারে দূরের মানুষকে একদিন কাছে করিয়া লই প্রথম মিলনে বাঁশির সুরে; কিন্তু তারপরে দেখা যায়, বাঁশি আর বাজে না; তাহাব কারণ,—'কেন না, আধখানা কথা ভুলেছি। শুধু মনে রইল, সে কাছে; কিন্তু সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না।···দুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চুপকে বাঁশির সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়।'

দুই মানুষের মাঝখানকার এই যে আকাশটা আমরা দৈনন্দিন জীবনে তাহাকে আর কখনই ফাঁকা থাকিতে দিই না—আমরা তাহাকে ভরিয়া দিই হাজার রকমের কথায়, কাজে-কর্মে তাই পরস্পর পরস্পরকে একেবারে হারাইয়া ফেলি। কিন্তু 'এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্বদিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবিব কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

'আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার সুদূর দুর্গম নির্বাসন পার হয়ে যাক।

'কিন্তু তা হলে তাকে যেতে হবে কালের উজান-পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা

ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘশ্বাসে আর শাল-মঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে।'

কবি বলিতেছেন, সেই হারাইয়া যাওয়া প্রথমমিলনের ক্ষণটিকে এই জীবনেই আবার গভীর করিয়া ফিরাইয়া পাওয়া যাইতে পারে যদি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপরে নামিয়া আসে নববর্ষার মেঘকজ্জল রহস্যাবরণ। 'যখন ঝিল্লীর ঝঙ্কারে বেণুবনের অন্ধকার থর্‌থর্‌ করছে, যখন বাদল হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে-কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধে-ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে।'

'নবজাতকে'র 'সাড়ে ন'টা' কবিতাটির ভিতরে কবি 'মেঘদূত' কাব্যের কাব্যরূপের একটি চমৎকার পরিচয় দিয়াছেন। বহু দেশান্তরের গান যখন আমরা রেডিওতে শুনি তখন মনে হয় বহুদূরের বিদেশিনীর গান আমার কাছে একটি অরূপ সুর মাত্র; সে বহুদূর হইতে বহু গিরিনদী পার হইয়া আসিয়াছে—পথে পথে কত বিচিত্র ভাষার কোলাহলের ভিতর দিয়া সে বহিয়া আসিয়াছে—সংসারের কত জন্মমৃত্যু বিলাপ উৎসব—রণক্ষেত্রের নিদারুণ হানাহানি—'লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি' সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে—কিন্তু সে একান্তই নির্লিপ্ত এবং নিরাসক্ত, ঠিক সেইভাবেই—,

যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত।
বাণীমূর্তি সেও একা।
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা।
তার পাশে চুপ
সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ
সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল
জীবনে উচ্ছল
ওর মাঝে তার কোন আলো পড়ে নাই।
রাজার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই।
যুগ যুগ হয়ে এল পার
কালের বিপ্লব বেয়ে, কোন চিহ্ন আনে নাই তার।

'পুনশ্চে'র 'বিচ্ছেদ' কবিতার ভিতরে যে কথা বলিয়াছেন কবি 'মেঘদূতে'র

প্রসঙ্গে, তাহারই নবরূপ দেখিতে পাই ‘সানাই’এর ‘যক্ষ’ কবিতার ভিতরে। পূর্ণতার সহিত সৃষ্টির একটা ভেদ রহিয়াছে—এই বিরহের ব্যাকুলতাই সৃষ্টিকে জীবন-মরণের ভিতর দিয়া ‘ভবিষ্যের তোরণে’ পথিক করিয়া চালাইয়া দিতেছে। কবি বলিতেছেন—

ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

প্রভুর শাপ পাইয়াই যক্ষ ধন্য হইয়াছে; কারণ অপূর্ণতার বিরহ-বেদনাই তাহাকে নিরন্তর ছুটাইতেছে পূর্ণের পানে এবং মর্ত্যলোকের এই অপূর্ণতার বিরহ আসিয়া ‘স্তব্ধ পূর্ণের দ্বারে’ বার বার আঘাত করিতেছে এবং

স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হোতে
ছায়ায় বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্ত্যের আলোতে
উহারে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।

‘বিচ্ছেদ’ কবিতায় কিন্তু কবি বলিয়াছেন যে আহ্বানের ভিতর দিয়া পূর্ণও আগাইয়া আসে অপূর্ণের দিকে—উহাই তাহার চলা। সে কথাটার উপরে কবি এখানে আর জোর দেন নাই।

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়
দণ্ড পল গনি গনি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থ লাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা।
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা।
তার তরে বাণীহীনা যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা
অর্থহারা
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্ত্য ভূমে
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।

॥ ৫ ॥

রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র কবিতার উপরেও দু'এক স্থানে 'মেঘদুতে'র এই প্রভাব লক্ষণীয়; যক্ষ সেখানে শুধু চিরন্তনের 'বিরহী'র রূপ ধারণ করিয়াছে—যক্ষ-প্রিয়া 'স্বপনরূপিণী আলোক সুন্দরী'র রূপ পরিগ্রহ করিযাছে।—

হে বিরহী হায় চঞ্চল হিযা তব
নীরবে জাগো একাকী শূন্য মন্দিরে
কোন সে নিরুদ্দেশ লাগি
আছ চাহিয়া।
স্বপনরূপিণী আলোকসুন্দবী
অলক্ষ্য অলকাপুবী-নিবাসিনী
তাহার মূবতি রচিলে বেদনায়
হৃদয মাঝাবে।

(রবীন্দ্ররচনাবলী, ২২শ খণ্ড, সংযোজন, ২)

ববীন্দ্রনাথেব ভাবধারার উপবে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার কবিযাছিল কালিদাসেব 'কুমাব-সম্ভব' কাব্যখানি। এই কাব্যখানির ভিতরে ববীন্দ্রনাথ প্রেমেব একটি অতি উচ্চ আদর্শ লাভ করিযাছিলেন এবং সেই পবিত্র আদর্শের সহিত কালিদাসের কবিমূর্তিও রবীন্দ্রনাথেব দৃষ্টিতে একটা অপূর্ব মঙ্গলের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিযাছিল। চরম শিল্পকলাব ভিতরে একটা মঙ্গলের উচ্চ আদর্শ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করিযাছিলেন কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকেব ভিতবেও। এই দুইখানি অমর কাব্য-সৃষ্টি হইতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস আসিযাছিল যে কালিদাস শুধু শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'শৈব কবি'। ধর্মবিশ্বাসেই কালিদাস শৈব ছিলেন না, তিনি শৈব ছিলেন কাব্যেব আদর্শেও; সেখানেও সকল ললিত-কলা-সৃষ্টির ভিতর দিযা তাঁহাব চিত্ত সমাহিত ছিল শিব বা মঙ্গলের চিন্তায। তাঁহার রস-সাধনা এবং শিব-সাধনা তাঁহার কাব্যসৃষ্টির ভিতরে তাই গভীর সঙ্গতি লাভ কবিযাছে। 'কালের যাত্রা'র 'কবির দীক্ষা' কবিতাটিতে দেখি—

বুঝলেম কথাটা।
মিলচে তত্ত্বানন্দস্বামীর সঙ্গে।
শিবমন্ত্র দেন তিনি প্রলয় সাধনায়।

শিবমন্ত্র দিই আমি ও।

অবাক করলে,
তুমিত জানি কবি,
কবে হ'লে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিবা।

'প্রাচীন সাহিত্যে'ব ভিতবেও কবি বলিযাছেন—

"কালিদাসেব সৌন্দর্যচাঞ্চল্যেব মাঝখানে ভোগবৈবাগ্য স্তব্ধ হইযা আছে। মহাভাবতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈবাগ্যেব কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগেব এবং ভোগবিবতিব কবি বলা যাইতে পাবে। তাঁহাব কাব্য সৌন্দর্য-বিলাসেই শেষ হইযা যায না—তাহাকে অতিক্রম কবিযা তবে কবি ক্ষান্ত হইযাছেন।"

শকুন্তলা নাটকে তাই দেখিতে পাই, যৌবনেব উগ্র চঞ্চল প্রেম প্রশান্ত পবিণতি লাভ কবিযাছে কঠোব তপস্যাব ভিতব দিযা। শকুন্তলাব কিশলযবাগেব ন্যায অধব, কোমলবিটপানুকাবী বাহু এবং কুসুমেব ন্যায লোভনীয যৌবন গভীব প্রশান্তি এবং উজ্জ্বল মহিমা লাভ কবিযাছে তাহাব মলিনধূসববসনা নিযমচর্যায শুষ্কমুখী ধৃতৈকবেণি বিবহব্রতচাবিণী শুদ্ধশিলা মূর্তিতে। যৌবনেব প্রেম পবিপূর্ণতা লাভ কবিযাছে মাতৃত্বেব মহিমায়—ভোগেব উগ্রবাসনা কল্যাণেব মাধুর্যে ও প্রশান্তিতে, আত্মকেন্দ্রিকতাব ক্ষুদ্রতা বৃহতেব মধ্যে পবিব্যাপ্তিতে। সৌন্দর্যেবও চবিতার্থতা তাই বাসনা-বিক্ষোভে নহে—গভীব চিত্ত প্রশান্তিতে। সৌন্দর্য ও প্রেমেব এই আদর্শটি চমৎকাব রূপ গ্রহণ কবিযাছে ববীন্দ্রনাথেব 'আবোগ্যে'ব মধ্যে একটি কবিতায।—

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বযসে
নির্ঝবেব প্রলাপকল্লোলে,
অজানা শিখব হ'তে
সহসা বিস্ময বহি আনি
ভ্রূভঙ্গিত পাষাণেব নিশ্চল নির্দেশ
লঙ্ঘিযা উচ্ছৃল পবিহাসে,
বাতাসেবে করি ধৈর্যহাবা,

পরিচয় ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্যের ভাষা,
চারিদিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত
তারি মধ্যে মুক্ত করি' ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ শুদ্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে
চারিদিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

'কুমার-সম্ভবে'র ভিতরেও দেখিতে পাই, নবযৌবন-সমাগমে প্রতি অঙ্গে 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' উমা তাহার দেহজ রূপ, অকাল বসন্ত এবং মদনকে সহায় করিয়াই লাভ করিতে চাহিয়াছিল শিবের মত স্বামী—মদন সেখানে ভস্মীভূত—উমা সেখানে প্রত্যাখ্যাতা। উমার সেই প্রেম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল যখন নিজের মনে মনে সে নিজের রূপকে নিন্দা করিয়াছিল এবং তপস্যা দ্বারাই অবন্ধ্যরূপতা লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' উমার উজ্জ্বল মহিমা অক্ষমালাধারিণী তপস্বিনী উমায়।

'কুমার-সম্ভবে'র অকালবসন্তের সমাগম, উমার ব্যর্থ অভিযান, মদনের শোচনীয় পরাজয়—আবার উমার কঠোর তপস্যা এবং সুন্দরের কাছে প্রেমের কাছে যোগীশ্বর শিবের পরাজয়—এই সমস্তই ভাবে ভাষায়—দৃশ্যে গন্ধে গানে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে বিভিন্ন কালে কেবলই দোলা দিয়াছে; সেই দোলায় জাগিয়াছে যে স্পন্দন তাহাই রূপায়িত হইয়াছে কবির জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাঁহার বহু কাব্যের ভিতরে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের ভিতরে রূপজ মোহ যে কোথাও দেখা দেয় নাই তাহা নহে, কৈশোর এবং যৌবনের প্রেম-কবিতার ভিতরে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা সমগ্রভাবে বিচার করিলে মনে হয়, ইহার ভিতরে তীব্র হইয়া ওঠে নাই প্রবৃত্তির আলোড়ন, যাহাকে আধুনিক কালে গালভরা নাম দেওয়া হইয়াছে 'প্যাসন্'। রবীন্দ্রনাথের প্রেমকবিতা সম্বন্ধে এমন অভিযোগ শোনা গিয়াছে যে, তাঁহার প্রেমকবিতার

ভিতরে 'বুকের টিপ্‌টিপানি' নাই। কিন্তু এ-সকল অভিযোগ দায়ের করিবার পূর্বেই মনে রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শৈবকবি। এই শৈবধর্ম যেমন তাঁহার শিল্পের ক্ষেত্রে—তেমনই তাঁহার প্রেমের ক্ষেত্রে। সুতরাং স্নায়ু-উত্তেজক লালসা-উদ্রেককারী প্রেম রবীন্দ্রনাথের মূল কবি-ধর্মেরই বিরোধী; এবং এই মূল কবিধর্মে কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের গভীর মিল।

প্রেমের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই শৈবধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে 'কড়ি ও কোমলে'র যুগ হইতেই। সেখানে আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ভোগস্পৃহা পলে পলে কবিচিত্তে আনিয়াছে শ্রান্তি ও বিতৃষ্ণার প্রতিক্রিয়া।—

সুখশ্রমে আমি সখি, শ্রান্ত অতিশয়—
পড়েছে শিথিল হয়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুমশয়ন,
কুসুমরেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে।
... ...
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাস রুদ্ধ হয়—
পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়—
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই। (শ্রান্তি)

আবার—

দাও খুলে দাও সখি, ওই বাহুপাশ।
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।
কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ!
এ চিরপূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান।
আমারে ডেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ—
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ। (বন্দী)

বিরাট বহির্বিশ্বের বিচিত্র ধারার সহিত যোগে মুক্তিকামী কবির কাছে

এই অলস আবেশে দেহভোগের বন্দীত্ব প্রথম হইতেই পীড়াদায়ক হইযাছিল। দুশ্চর ধ্যান-কর্মেব জ্বলদর্চিশিখার ভিতব দিয়া অতনুকে জ্বলদর্চিতনুরূপে পাইবার যে আকাঙ্ক্ষা 'মহুয়া'র মধ্যে প্রকট হইযাছে তাহার আভাস ছড়াইয়া আছে এই 'কড়ি ও কোমলে'র বহু কবিতাব ভিতবে। 'বলাকা'র 'শাজাহান' কবিতাব মধ্যে কবি 'যে প্রেম সম্মুখপানে চলিতে চালাতে নাহি জানে' তাহাকে ধিক্কার দিযাছিলেন। সেই ধিক্কারের মৃদু উচ্চারণ এই 'কড়ি ও কোমলে'র বহু কবিতার মধ্যেই শ্রুতিগোচর। সেখানে দেখি—

কোথা হ'তে নিয়ে এলে প্রেমেব আভাস,
কোন অন্ধকাব ভেদি উঠিল আলোতে।
এ নহে খেলাব ধন, যৌবনেব আশ—
বোলো না ইহার কানে আবেশেব বাণী।
নহে নহে এ তোমার বাসনাব দাস—
তোমাব ক্ষুধাব মাঝে আনিও না টানি। (পবিত্র জীবন)

এই প্রসঙ্গে 'কড়ি ও কোমলে'র 'মরীচিকা' কবিতাটি সমগ্রভাবেই স্মরণ করা যাইতে পাবে।—

এসো, ছেড়ে এস সখি, কুসুমশযন।
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আব কবিবে গো বসিয়া বিবলে
আকাশকুসুমবনে স্বপন চযন।
দেখো, ওই দূব হতে আসিছে ঝটিকা—
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খব অশ্রুজলে।
দেবতাব বিদ্যুতের অভিশাপ শিখা
দহিবে আঁধাব নিদ্রা বিমল অনলে।
চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে—
সুখ দুঃখ লযে সবে গাঁথিছে আলয—
হাসিকান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসাব সংশযরাত্রি রহিব নির্ভয।
সুখরৌদ্রমরীচিকা নহে বাসস্থান—
মিলায মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যে এই যে 'শৈব প্রেমে'র আদর্শ—বৃহতের সঙ্গে

মঙ্গলের সঙ্গে যোগে যাহার শৈবত্ব—তাহা 'শৈব কবি' কালিদাসের প্রভাব-জনিত একথা সত্য মনে হয় না। প্রেমের ক্ষেত্রে এই শৈব ধর্ম রবীন্দ্রনাথের একান্তভাবে স্বভাবজ। সেই স্বভাবজ ধর্মের সঙ্গে কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত প্রেমধর্মের একটা মিলের ফলে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের এই ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই আকর্ষণের ফল রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। তাহার ফলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই ভাবাদর্শটি যখনই রবীন্দ্রনাথের চিত্তে জাগ্রত হইয়াছে তখনই তিনি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কালিদাসের শকুন্তলা—বিশেষভাবে কালিদাসের অঙ্কিত উমার স্মরণ করিয়াছেন।

'কুমার-সম্ভব' কাব্যের স্পষ্ট প্রভাব প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে। 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্য-কাব্যের প্রথমেই দেখিতে পাই, তপস্বী ব্রহ্মচারী অর্জুনের চিত্ত জয় করিবার জন্য রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা বসন্ত ও মদনের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছে এবং পরে দেখিলাম এই বসন্ত এবং মদনের সহায়তায়ই রূপজমোহে চিত্রাঙ্গদা তপস্বী ব্রহ্মচারী অর্জুনের চিত্তজয় করিয়াছে। ইহার পশ্চাতে অকাল বসন্ত এবং মদন সহায়ে গিরি-নন্দিনী উমার যোগীশ্বর শিবের চিত্তজয় করিবার আয়োজনের স্মৃতিটি কবিচিত্তে কাজ করিয়াছে। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখিতে পাই, দেহজ রূপের উপরে আসিয়াছে চিত্রাঙ্গদার ধিক্কার; কারণ দেহজ রূপের জন্য নরনারীর ভিতরে যে ক্ষণিক আকর্ষণ তাহা প্রেম নহে—উহা প্রেমের তীব্র অপমান। তাই উমার ক্ষেত্রেও যেমন দেখিয়াছি—নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী। এখানেও তেমনি দেখিতে পাই—

এই দু'টি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দু'টি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে ধরা, দুই হাতে ছিন্ন
ক'রে ফেলে' সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল প'ড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ,
ক্ষণস্থায়ী।

তারপরে আমরা দেখিয়াছি, কালিদাস যে শকুন্তলার যৌবনের চঞ্চল প্রেমকে মাতৃত্বের প্রসন্ন পরিণতি দান করিয়াছেন, উমার প্রেম-সাধনাও যে গিয়া মাতৃত্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে এই আদর্শটি রবীন্দ্রনাথ অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই প্রভাবে হয়ত কবি চিত্রাঙ্গদার রূপজ প্রেমকে শুধু চঞ্চল ভোগবাসনার ভিতরেই নিবদ্ধ রাখেন নাই, পরিশেষে চিত্রাঙ্গদার মাতৃত্বের আভাসের ভিতরে কাব্য সমাপন করিয়াছেন।

পরবর্তী কালে কবি 'চিত্রাঙ্গদা'কে অবলম্বন করিয়া যখন নৃত্যনাট্য রচনা করিয়াছিলেন তখনকার ভূমিকাটিও অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ।—

প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে।
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।

বর্ণবৈচিত্র্যে,
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটি 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যের মর্মকথা। এই নাট্যকাহিনীতে আছে—

প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায।

ইহার পরেই 'কুমার-সম্ভবে'র প্রভাব সম্পর্কে 'সোনারতরী'র 'প্রতীক্ষা' কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। 'উৎসর্গে'র 'মরণ' কবিতাটির ভিতরে এবং এই জাতীয় আরও দু'একটি কবিতার ভিতরে কবি মরণ এবং নবজীবনের ভিতরে যে একটি শিব-পার্বতীর মধুর মিলন সম্পর্কের কথা বলিযাছেন তাহারই আভাস পাওয়া যায় এই 'প্রতীক্ষা' কবিতাটিতে। আমরা 'মরণের' আলোচনা প্রসঙ্গেই এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ইহার পরে উল্লেখ করা যাইতে পারে 'চিত্রা' কাব্যের সুপ্রসিদ্ধ 'বিজয়িনী' কবিতাটি। ইহার ভিতর দিয়া যে সত্যটি কবি রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন

এবং বিরাট সাফল্যের সহিত রূপায়িত করিয়াছেন তাহা এই যে পরিপূর্ণ নারীসৌন্দর্য আমাদের চিত্তকে শুধু কামনার তরঙ্গ তুলিয়া বিক্ষুব্ধ করে না, পরিপূর্ণ নারীসৌন্দর্যের এমন একটা প্রশান্ত গম্ভীর মহিমা রহিয়াছে যে তাহা আমাদের চিত্তের ভিতরে আনে পরিপূর্ণ প্রশান্তি। মানুষের ভিতরে দেহজরূপলোলুপ মদন আছে—সে শুধু সুযোগ খোঁজে নারীর নগ্নরূপকে ভোগ করিবার; মানুষের ভিতরে আর একটি আছে প্রশান্ত শিব—সে খোঁজে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ভিতরে মূর্তিমান কল্যাণ—সেই শিবের নিকটে মদনের পরাভব পদে পদে। তাই চারিদিকে মত্ত বসন্তের সমাগমে যে মদন নির্জনে অচ্ছোদ সরসিনীরে একাকিনী সুন্দরীব স্নানের সময়ে—

—সহাস্য কটাক্ষ করি'
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তা'ব, নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।

সেই মদনই স্নান-পূতা কল্যাণময়ী পরিপূর্ণসৌন্দর্য-প্রতিমা রমণীর—

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমিপরে
জানুপাতি' বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

এখানকার যেটুকু সত্যানুভূতি তাহার উপরে রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতার দাবিই সমধিক। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় কালিদাসের কাব্যে নারী-সৌন্দর্যের পশ্চাতে যে প্রশান্ত মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে কালিদাসের দান অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কারই বেশী। কবি নিজে যে সত্যের আভাস আবিষ্কার করিয়াছেন কালিদাসের কাব্যে তাহাই তাঁহার পরিণত মনে দানা

বাঁধিয়া উঠিয়াছে একটা কাব্যসত্যে—অর্থাৎ একটা রসানুভূতিতে। কিন্তু কাব্যের রূপায়ণে একটি সত্যের ক্ষীণ আভাসকে অবলম্বন করিয়া এখানে কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' ঘনীভূত সংক্ষিপ্ত রূপ লইয়া আসিয়া দেখা দিয়াছে পটভূমিকার রূপে। যে পাঠকের মনের পটভূমিকায়—অর্থাৎ তাঁহার বাসনার ভিতরে এইরূপ 'কুমার-সম্ভবে'র ঘনীভূত রূপ স্থিরবদ্ধ নাই তিনি কবিতা হিসাবে এই 'বিজয়িনী' কবিতাকে কিছুতেই সম্যক্ আস্বাদ করিতে পারিবেন না; কারণ কবিতা ত শুধু ফলের আঁঠিটি মাত্র নয়—আঁঠির সংলগ্ন রসাবরণটিই এখানে প্রধান কথা। এখানকার স্নানলীলারত রমণীর নিরাবরণ অনিন্দ্যসুন্দর কান্তিকে ঘিরিযা যে বসন্ত একটি মত্ত উদ্দীপনার আভাস বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে তাহা 'কুমার-সম্ভবে'র মদনসখা অকালবসন্তেরই একটি সংক্ষিপ্ত অভিনব রূপ। দু'এক স্থানে কবি ইচ্ছা কবিযাই কালিদাসের শ্লোক ভাঙ্গিয়া তাঁহার বর্ণনার ভিতরে বসাইযা দিযাছেন।

গুঞ্জরি' ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ নযন মৃগ;

ইহা যে কালিদাসেরই—

মধুর্দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূযত কৃষ্ণসারঃ॥

প্রভৃতিরই রূপান্তর মাত্র তাহাতে কোন সংশয নাই। বর্ণনায এতখানি মিল রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই রাখিযাছেন সচেতন শিল্পীর মত—কালিদাসের পটভূমিটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ হযত কালিদাসেব পটভূমিকা গ্রহণ না করিযাও এই সত্যানুভূতিটিকে ভাষা দিতে পারিতেন; কিন্তু অতীতের পটভূমিকায় ইহা এখানে যেরূপ রসঘন হইয়া উঠিয়াছে অন্যথায় ইহা সেইরূপ আস্বাদ্য হইয়া উঠিত কিনা সে বিষয়ে আমাদের সংশয রহিয়াছে।

'চিত্রা'র ভিতরকার 'প্রস্তর মূর্তি' কবিতাটিতেও 'কুমারসম্ভবে'র উমার তপস্বিনী মূর্তির পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। 'প্রস্তর মূর্তি'কে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

হে নির্বাক অচঞ্চল পাষাণ সুন্দরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি কত বর্ষ ধরি
অনম্বরা অনাসক্তা চির একাকিনী
আপন সৌন্দর্যধ্যানে দিবস যামিনী
তপস্যামগনা। সংসারের কোলাহল
তোমারে আঘাত করে নিয়ত নিষ্ফল,—
জন্মমৃত্যু দুঃখসুখ অস্ত-অভ্যুদয়
তরঙ্গিত চারিদিকে চরাচরময়,
তুমি উদাসিনী।

ইহার পরেই আমরা 'কল্পনা'র 'মদনভস্মের পূর্বে' এবং 'মদন-ভস্মের পর' কবিতা দুইটির উল্লেখ করিতে পারি। অনঙ্গ দেবতা যখন অঙ্গ ধরিয়া নব ভুবনে ঘোরা-ফেরা করে তখন সর্বত্রই জাগে প্রেমের চঞ্চলতা ; মদন-সঞ্জাত সেই চঞ্চল প্রেম মানুষকে মত্ত করে—বিবশ করে—এবং বৃহত্তর জীবন-পরিধি হইতে সঙ্কুচিত করিয়া আনে—

বাসর গৃহদুয়ারে
স্তিমিতশিখা-প্রদীপ-আলোকে।

প্রেমের এই বন্ধন বহির্বিশ্বে মুক্তি লাভ করে মদন-ভস্মের দ্বারা ; মিলনে যাহার বন্ধন বিরহেই তাহার নিঃসীম মুক্তি। তাই—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তা'রে ছড়ায়ে।

এখানেও কানে আসে কালিদাসের নেপথ্য-সঙ্গীতের ঝঙ্কার ; সেই ঝঙ্কারই বিচিত্র ঝঙ্কার তুলিতেছে আমাদের রসপিপাসু পাঠকচিত্তে।

তারপরে উল্লেখ করিতে পারি 'উৎসর্গে'র অন্তর্গত হিমালয় সম্বন্ধে দুইটি কবিতা। একটি কবিতায় আছে, বিরাট হিমালয় যেন অটল আসনে গভীর নির্জনে একটি পাঠকের ন্যায় থরে থরে পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া খুলিয়া একখানি 'সনাতন পুঁথি'র পাঠে রত। সেই সনাতন পুঁথিখানির বিষয়-বস্তু কি ?—

আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা—

নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে—কিছু নাহি চাহি যাঁর
তিনি কেন চাহিলেন—ভালোবাসিলেন নির্বিকার—
পরিলেন পরিণয়পাশ।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে দেখিতে পাই, দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতি শৈলে-শৈলে—প্রতি শৃঙ্গে-শৃঙ্গে যেন অভেদাঙ্গ হরগৌরীব বিচিত্র মূর্তি বিস্তার লাভ করিয়াছে।—

ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
দুর্গম দুঃসহ মৌন—জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণ পদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবব
মহান দরিদ্র, রিক্ত আভরণহীন দিগম্বর,
হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে একী লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্য নব পল্লবে কুসুমে
ছাযারৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিরিশেরে রয়েছেন ঘিবি
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

কবিতাটির প্রথম অংশে 'কুমার-সম্ভবে' বর্ণিত যোগস্থ শিবকে উমা কর্তৃক পুষ্প উপচারে অর্ঘ্যদানের ছবিটি এবং দ্বিতীয়াংশে হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের ছবিটি ফুটিয়া উঠিযাছে। ইহার পরে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'উৎসর্গে'র 'মরণ' কবিতাটি। মৃত্যু আমাদের বহির্দৃষ্টিতে যতই রুদ্র—যতই ভীষণ হোক তাহার একটি অনিন্দ্য-সুন্দর স্ময়মান প্রসন্ন বরমূর্তি রহিয়াছে—সেই প্রসন্ন বরমূর্তিতে সে মিলন-সূত্রে আবদ্ধ হয় নবজীবনের নববধূর সহিত। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথের একটি মূল কবি-বিশ্বাস—এবং এই বিশ্বাসের বলেই তিনি মৃত্যুভযকে জয় করিতে চাহিয়াছেন সমগ্র জীবনে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-ধারার অখণ্ডতার পরিকল্পনা এবং সেই অখণ্ড প্রবাহের ভিতর দিয়া বিকাশমান 'জীবন-দেবতা'র পরিকল্পনার সহিত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কিত এই বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটা অজ্ঞাত রহস্যাবৃত তমসার ভিতর

দিয়া নবজীবনের নবীন আলোতে আমরা পরিচয় পাই মৃত্যুর এই কল্যাণতম রূপের। বহির্বিশ্ব তাহার অপ্রেমের মিথ্যাদৃষ্টিতে শিবের রুদ্রমূর্তিতে যতই ভীত-সন্ত্রস্ত হোক—নবজীবনের নববধূ উমা তাহাকে অভ্রান্ত দৃষ্টিতেই চিনিয়া লইতে পারে। তাই—

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি' রহি' গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি' জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্বম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

শুনি' শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরু দুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জর জর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

'কুমার-সম্ভবে'ও দেখিতে পাই, মহাদেব সম্বন্ধে উমার চিত্তে কোন সংশয়

বা বিভ্রমের লেশমাত্র ছিল না। ছদ্মবেশী বটু ব্রাহ্মণ আসিয়া যখন উমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য শ্মশানবাসী ভস্মভূষণ শিবের অসদাচার, সর্পবলয়িত হস্ত, শোণিতবিন্দুবর্ষী গজাজিন, বৃষবাহন প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছিল তখন উমা দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিল—'ন বেৎসি নূনং যত এবমাথ মাং'—'তুমি তাঁহাকে ভালভাবে জান না, সেই জন্যই এই সব কথা বলিতেছে। অথবা—

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া
তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥

'বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই, তুমি যেমন শুনিয়াছ সে ঠিক ঠিক সেই রূপই হোক ; এখানে আমার মন 'ভাবৈকরস' রূপে অবস্থান করিতেছে ; স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কখনও লোকের কথা বিচার করে না।'

আমাদের নবজীবনের নববধূটিও এইরূপ 'ভাবৈকরস' হইয়াই অবস্থান করে,—তাই তাহার চোখে ধরা পড়িয়া যায় জটাধারী সর্পবলয়িত-বাহু বিভূতিভূষণ শ্মশানচারী মৃত্যুর অভিনব কান্তমূর্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'সোনার তরী'র 'প্রতীক্ষা' কবিতার ভিতরে মরণের এই বরবেশের আভাস রহিয়াছে। সেখানেও কবি মৃত্যু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তুই কি বাসিস ভাল আমার এ বক্ষোবাসী
পরাণ-পক্ষীরে।
তাই এর পার্শ্বে এসে কাছে বসেছিস ঘেঁসে
অতি ধীরে ধীরে।
দিন রাত্রি নির্নিমেষে চাহিয়া মোদের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে
রুদ্র আরাধনা।

জীবনের প্রেয়সীকে লইয়া মৃত্যু তাহার অন্ধকার রথে শূন্যপথে যাত্রা করে, তারপরে নবজীবনের ভিতরে আসিয়া আবার—

কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন।

আসলে মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের নিকটে 'জীবন-দেবতা'রই একটা ক্ষণিক রুদ্র-

রূপ। এই 'জীবন-দেবতা'ই নটরাজ শিব; এক জীবন যখন পুরাতন হইয়া যায়, যখন বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া, চুম্বন মদিরাবিহীন হইয়া যায় তখনই বৈচিত্র্যহীনজীবন বৈচিত্র্যপ্রয়াসী নটরাজ 'জীবন-দেবতাকে' ডাকিয়া বলে—

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আর বার
চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে। (জীবন-দেবতা, চিত্রা)

তখন নটরাজ 'জীবন-দেবতা' মৃত্যুর রুদ্রমূর্তি ধারণ করে; কিন্তু জীবন তাহাকে ঠিক চিনিতে পারে। 'প্রতীক্ষা' কবিতায়ও বলা হইয়াছে—

ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে;
আমার পরাণবধূ ক্লান্তহস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে
ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি—
মন্ত্র পড়ি' নিয়ো;
রক্তিম অধরে তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।

এই কথাটিই রূপ পাইয়াছে 'বলাকা'র 'সর্বনেশে' কবিতাটির ভিতরেও। রক্তমেঘের ঝিলিকের ভিতর দিয়া গহন-পারের বজ্রধ্বনির ভিতর দিয়া পাগল ভোলানাথের মরণের আহ্বান জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহার ভিতরে—

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না?
চরণে তোর রুদ্রতালে
নূপুর বেজে উঠবে না?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো।
ঐ বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো॥

'বলাকা'র 'দুই নারী' কবিতার ভিতরে যে দুই নারীর বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার পশ্চাতেও 'কুমার-সম্ভবে'র আদর্শকে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। নারীর একটি উর্বশী-রূপ রহিয়াছে—যে রূপে সে পুরুষের 'তপোভঙ্গ' করে এবং

> উচ্চ-হাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
> নিয়ে যায় প্রাণমন হরি'
> দু-হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
> রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
> নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

কিন্তু নারীর আর একটি কল্যাণময়ী মূর্তি রহিয়াছে—সে মাতৃত্বে উজ্জ্বল, সে—

> ... ...ফিরাইয়া আনে
> অশ্রুর শিশির-স্নানে
> স্নিগ্ধ বাসনায়,
> হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
> ফিরাইয়া আনে
> নিখিলের আশীর্বাদ পানে।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন-সাহিত্যে'র ভিতরেও 'কুমার-সম্ভব' ও 'শকুন্তলা' সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার ভিতরেই আমরা কালিদাস-অঙ্কিত নারীর এই দুইটি রূপের চিত্র পাইয়াছি। বসন্ত ও মদন সহায়ে শুধু মাত্র ভরা যৌবনের ভরসায় যে উমা মহাদেবের মন প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে গিয়াছিল, যৌবনের চঞ্চললীলায় যে শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের ভোগবাসনা বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল তাহারাই নারীর উর্বশী মূর্তি; কিন্তু সে নারীরই কল্যাণময়ী প্রশান্তমূর্তি আমরা দেখিয়াছি তপস্যাযপূতা কুমার-জননী পার্বতীর ভিতরে, ভরত-জননী শকুন্তলার সৌম্য তপস্বিনী মূর্তিতে।

এই 'শকুন্তলা', 'কুমার-সম্ভবে'র প্রেমের আদর্শ 'পূরবীর' 'বনস্পতি' কবিতাটির মধ্যেও সূক্ষ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পূর্ণতার সাধনায় ঊর্ধ্বনেত্রে বনস্পতি ধ্যানে মগ্ন, 'বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে' জাগে তাহার সাড়া—তাই সে 'মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।' একদিকে—

> ধ্রুবত্বের মূর্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়
> বিপুল প্রাণের বহে ভার।

কিন্তু—

তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার।

এই তপস্বী বনস্পতির তপোভঙ্গ করিবার জন্য দিগঙ্গনা অশান্ত আবেগে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কবি বলিতেছেন—

দয়া ক'রো, দয়া ক'রো, আরণ্যক এই তপস্বীরে
ধৈর্য ধরো, ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
একী তীব্র প্রেম, এযে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ,—
দুরন্ত চুম্বন-বেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহ মোরে কহ,
কিশোর কোরক নব নব।
অকস্মাৎ দস্যুতায় তারে রিক্ত করি নিতে চাও
সর্বস্ব তাহার তব সাথে?
ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,
হবে তারে মুহূর্তে হারাতে।
যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
লুণ্ঠনের ধন লুটি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব
উঠিবে কঠিন হেসে হেসে।
আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বর তলে,
শান্তিরূপে এস দিগঙ্গনা।
উঠুক স্পন্দিত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।
দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হ'ক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি।

ইহার পরে আমরা উল্লেখ করিতে পারি 'পূরবীর' 'তপোভঙ্গ' কবিতাটি।

'বলাকা' রচনার পরে রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছে, কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি ক্রমেই 'ধ্যানী' হইয়া উঠিতেছেন। 'ধ্যানে'র প্রধান কথাই 'প্রত্যাহার' বহির্বিশ্বের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—যাহা নিরন্তর চিত্তকে মুগ্ধ করে ও রস-চঞ্চল করিয়া তোলে তাহা হইতে চিত্তের প্রত্যাহার। রবীন্দ্রনাথেরও মনে হইয়াছে এই 'বলাকা'র যুগটা যেন অনেকখানি প্রত্যাহারের যুগ—রূপলোক রসলোক হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া ধ্যানলোকেই বেশী অবস্থিতি। যৌবনে তিনি জগৎকে এবং জীবনকে যেমন করিয়া রূপে রসে গ্রহণ করিতে এবং ভোগ করিতে পারিতেন এখন যেন তেমন আর পারিতেছেন না। কবি অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার ভিতরে যেন একটি ভোলা-মহেশ্বর বাস করিতেছে। অবশ্য কবি অনেকস্থলেই বলিয়াছেন,—'আমি নটরাজের চেলা'; এই নটরাজ শিবই কবি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'। এই শিবের দুইটি রূপ, একরূপে তিনি 'যোগীশ্বর'—যখন তিনি 'ভোলা সন্ন্যাসী', যখন—

> চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
> নিবিড় নিবদ্ধ হ'য়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
> শান্ত হ'য়ে আসে। (তপোভঙ্গ, পূরবী)

অথবা কালিদাসের ভাষায়—

> অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ-
> মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
> অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-
> ন্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ (কুমার-সম্ভব, ৩।৪৮)

যখন 'তিনি বৃষ্টিহীন অম্বুবাহের (জলভরা মেঘ) মতন, তরঙ্গহীন বারিধির মতন, অন্তশ্চর বায়ুর নিরোধহেতু নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মতন।' কিন্তু তাঁহার আর একটি রূপ রহিয়াছে যে রূপে প্রেমের আহ্বানে—সুন্দরের আহ্বানে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়—চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে বিশাল বারিরাশির মত তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতিমা উমার নিকটে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবি-জীবনে অনেকবার এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন; কখনও কখনও তিনি বাহিরের জগৎ হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়াছেন—নিজেকে নিজের ভিতরে সংহরণ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু এই আত্মসংহরণ —এই ধ্যান তাঁহাকে পরক্ষণের জগৎ এবং জীবনের দিকে আরও গভীর

ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে ও তপস্যার কঠোরতা চিত্তে আরও নবীন সরসতা আনিয়া দিয়াছে; তাই দেখিতে পাইতেছি, 'বলাকা'র 'তপোভঙ্গে'র পরেই আসিয়াছে 'পূরবী'র নবীন সরসতা। কবি বলিতে চান, মানুষের একান্তভাবে রূপ-রস-বিরূপ হইয়া আত্ম-সংহরণের ভিতরে ধ্যানস্থ থাকিবার উপায় নাই, কারণ মানুষের এই বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে সমস্ত সৃষ্টি জুড়িয়া চলিতেছে দেবগণের চক্রান্ত—তাহারা চক্রান্ত করিয়াছে সুন্দরের সঙ্গে—সেই সুন্দরই সৃষ্টির কবি—রূপ-রস-বিরাগী মানুষের সন্ন্যাসী চিত্তকে সে ফিরাইয়া আনে এই রূপ-রসের জগতে—তাহাকে লুব্ধ করে—মুগ্ধ করে—প্রেমে সৌন্দর্যে মাধুর্যে ভরপুর করিয়া তোলে। তাই ধ্যানস্থ মানুষের আশ্রমের বহির্দ্বারের মূর্তিমান বারণের তর্জনীনির্দেশ অবহেলা করিয়াও মূর্তিমান সুন্দর আসিয়া বলে—

> তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
> স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
> তব তপোবনে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, তাঁহার অন্তরস্থ শিবের এই ধ্যান-তপস্যা যেন একটি ছলনা মাত্র—সুন্দরের হাতে প্রেমের হাতে বার বার পরাজিত হইয়া নিত্য নূতন বৈচিত্র্যে ও মাধুর্যে নবীন হইয়া উঠিবার আয়োজন। যোগীশ্বর শিবের উমাপতি মূর্তি যোগের ভূমিকাতেই আরো রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আত্ম-সমাহিত চিন্তা ও ধ্যানের কঠোরতাই আনয়ন করে সুন্দরকে গ্রহণ করিবার নবীন উদ্যম।

> হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
> সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
> ছদ্ম-রণ-বেশে।
>
> বারে বারে পঞ্চশরে
> অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
> দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
> বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব ব'লে
> আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
> মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহ-তলে,
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ-দাহে।
তপ্ত-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

রূপেরসে পরিপূর্ণযৌবনা পৃথিবীর মায়াই এখানে উমা, তাহাকেই আত্ম-সমাহিত তপস্যার ভিতর দিয়া বৈচিত্র্য এবং নবত্বে উজ্জ্বল করিয়া পাইতে চাহে আমাদের নটরাজ শিবের চেলা কবি-পুরুষ।

পৃথিবীর বুকে ষড়ঋতুর আবর্তনের ভিতরেও কবি দেখিয়াছেন নটরাজের এই লীলা। শীতের কঠোরতার ভিতবে আছে নটরাজের রিক্ত সন্ন্যাসী বেশে কঠোর তপস্যা ; কিন্তু বসন্ত আসিয়া বলে—

ভাঙব, তাপস, ভাঙব তোমার কঠিন তপের বাঁধন,
এই আমাদের সাধন।
চল কবি চল সঙ্গে জুটে,
কাজ ফেলে তুই আয়রে ছুটে,
গানে গানে উদাস প্রাণে জাগারে উন্মাদন॥
('সুন্দর', ঋতু-উৎসব)

সমগ্র বৎসর জুড়িয়া ধরণীর বুকে চলে নটরাজ ভোলা-মহেশ্বরের যে লীলা তাহা মধুরতম প্রকাশ লাভ করিযাছে 'নটরাজ' কাব্যের ভিতরে। এখানে দেখা যাইতেছে, কবির পবিণত চিন্তা—পরিণত রসবোধ মিলিয়া পৌরাণিক শিব, এমন কি কালিদাসের শিবকেও একটা গভীর পরিণতি দান করিয়াছে। অবশ্য নটরাজ শিবের পরিকল্পনা নূতন নহে ; কিন্তু সেই পরিকল্পনার ভিতরে কবি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহার জীবন-দেবতা তথা তাঁহার বিশ্ব-দেবতার সকল তত্ত্ব। আর মূলতঃ নটরাজের পরিকল্পনা কোন দার্শনিক পরিকল্পনা নহে—শিল্পীর পরিকল্পনা। ধরণীর বুকে ঋতুরঙ্গশালায় নটরাজের যে নৃত্যাভিনয় হইতেছে তাহার ভিতরে প্রথমে বৈশাখে দেখি তাহার তপস্বী রুদ্র সন্ন্যাসী রূপ।

ধ্যান নিমগ্ন নীরব নগ্ন
নিশ্চল তব চিত্ত।
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে
নিঃশেষ সব বিত্ত।
রসহীন তরু নির্জীব মরু,
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
ঐ চারিধারে করে হাহাকার
ধরা ভাণ্ডার রিক্ত॥ (বৈশাখ, নটরাজ)

কিন্তু কবি জানেন, তাঁহার কবি-জীবনে যেমন এই রুদ্র সন্ন্যাসী কঠোর তপস্যায় আত্মসংহরণ করে নিত্য নূতন করিয়া সুন্দরের কাছে পরাভব মানিবার জন্য, বহির্বিশ্বেও তাহার চলিতেছে সেই একই লীলা। তাই প্রার্থনা জাগে—

জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে
তাপস, লোচন মেল' হে।
... ...
পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দিক ঝঙ্কার,
ধুলায় মিশাক যা কিছু ধূলার,
জয়ী হোক যাহা নিত্য। (ঐ)

সংসারে এই রুদ্র-তপস্যার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই তপস্যার বহ্নি দূর করিয়া দেয় যাহা কিছু উমার রূপে এবং প্রেমে ছিল মূল্যহীন আবর্জনা, উজ্জ্বল করিয়া তুলিযাছে তাহার সত্য এবং শাশ্বত রূপ এবং প্রেমকে। নটরাজের এই বৈশাখের রুদ্র তপস্যায়ও—

তাপস নিঃশ্বাস বাযে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে।
বৎসরের আবর্জনা দূর হযে যাক।
... ...
মুছে যাক সব গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক ধরা।
(বৈশাখ-আবাহন, ঐ)

কিন্তু এই অগ্নি-তপস্যার মাঝখানে একটি গভীর ব্যঞ্জনা রহিয়াছে—সে ব্যঞ্জনা হইল সুন্দরের জন্য রুদ্র সন্ন্যাসীর গোপন আহ্বান।—

শুনিতে কি পাস্
এই যে শ্বসিছে রুদ্র শূন্যে শূন্যে সন্তপ্ত নিঃশ্বাস
এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত খঞ্জনী,
মাধুরীর মঞ্জরীর মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি ?
রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্য-মাল্য সাঙ্গ হয় সঙ্গোপনে সুন্দরের লাগি। (ব্যঞ্জনা, ঐ)

রুদ্র তপস্যার ভিতরে নটরাজের একটি 'মাধুরীর ধ্যান' রহিয়াছে; সেই মাধুরীর ধ্যানটাই আসল কথা, সেই মাধুরীকে আরও মধুর করিয়া পাইবার জন্য ধূলিধূসরিত পিঙ্গল জটাজালে শুষ্ক তপস্যার কঠোরতা। তাই মধ্যদিনে যখন পাখী গান বন্ধ করে এবং রাখাল বাঁশী বাজায় তখন—

শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি ; (মাধুরীর ধ্যান, ঐ)

বৈশাখের রুদ্রমূর্তি নটরাজ তাহার সকল বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া আকাঙ্ক্ষা করে ধরণীর শ্যামলী প্রিয়াকে; তাই আষাঢ়ের আকাশে যখন প্রথম গুরু গুরু ডমরু বাজিয়া ওঠে তপস্বীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া ওঠে সেই শ্যামলী প্রিয়ার সহিত মিলন-সম্ভাবনায়। তাই—

তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে ওঠে চমকিয়া।
চির জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চির জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া॥ (আষাঢ়, ঐ)

তারপরে সেই বিরহিণী প্রিয়া তাহার বৃষ্টি-ছলছল আঁখি দুইটি লইয়া

গৃহকোণে যখন নীপের অঞ্জলি রচনা করে এবং রুদ্র সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয়ের সকল ব্যাকুলতার সহিত সেই অঞ্জলি ঢালিয়া দেয়, তখন—

মল্লার রাগে গর্জিয়া ওঠ গাহি,
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে। (ঐ)

শ্রাবণের মধুর বর্ষণ, শরতের প্রশান্ত উজ্জ্বল মুক্তি, ফলভারাবনত হেমন্তের অন্নপূর্ণা মূর্তি—ইহার ভিতরে নটরাজ প্রেমে সৌন্দর্যে বিভোল ; কিন্তু আবার—

উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাতলো তপের শুষ্ক আসন,—(আসন্ন শীত, ঐ)

কিন্তু বসন্তে আবাব সে দেখা দেয় 'ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন' সুন্দরের বেশে—'ভুবন-মোহন নব বববেশে।' এই শিব-সুন্দরের জন্য ধরণীর তপস্বিনী উমাও কতই না তপস্যা করিযাছে।

তারি লাগি' তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহবণ
তোমার উদ্দেশে॥

... ...

সূর্য প্রদক্ষিণ কবি' ফিরে সে পূজাব নৃত্যতালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তা'র প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মি-টীকা।
সমুদ্র-তরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্রপাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিক-দিগন্তরে
রচে মরীচিকা॥
আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুণে' গুণে'।
সার্থক হ'লো যে তা'র বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে। (বসন্ত, ঐ)

এখানে কবি সুন্দরের মিলন-প্রত্যাশিনী ধরণীর উমার বিরহ-তপস্যার যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা অভিনব এবং অদ্ভুত। এ-বিরহের পরিকল্পনাটি

সম্পূর্ণই কবির নিজস্ব,—অথচ তাহার সহিত কুমারসম্ভবের উমার বিরহ-তপস্যার রহিয়াছে কি সুকুমার যোগ। ধরণীর উমা—

তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,

কালিদাস বলিয়াছেন,—'তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে'। ধরণীর উমা 'আপনারে তপ্ত করে'; কালিদাসের উমা 'নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা'; সে 'হুতজাতবেদসং', সে—

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং
শুচিস্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভা-
মনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥ (কু ৫।২০)

'গ্রীষ্মকালে শুচিস্মিতা সুমধ্যমা সেই উমা প্রজ্বলিত চারিটি অগ্নির মধ্যে গিয়া নেত্রপ্রতিঘাতিনী প্রভাকে জয় করিয়া (অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিয়া) অনন্যদৃষ্টি হইয়া সূর্যকে দেখিতে থাকে।'

ধরণীর উমা তপস্যার জন্য আপনাকে 'ধৌত করে'; কালিদাসের তপস্বিনী উমাও 'কৃতাভিষেকা', 'উদবাসতৎপরা'; ধরণীর উমা 'ছাড়ে আভরণ,' কালিদাসের উমা—

বিমুচ্য সা হারমহার্যনিশ্চয়া
বিলোলযষ্টি-প্রবিলুপ্তচন্দনম্।
ববন্ধ বালারুণবভ্রু বল্কলং
পয়োধরোৎসেধবিশীর্ণসংহতি ॥ (৫।৮)

'অনিবার্যনিশ্চয়া সেই উমা যে বিলোল হারযষ্টির দ্বারা বুকের চন্দন বিলুপ্ত হইত সেই হারকে পরিত্যাগ করিয়া বালার্ক-পিঙ্গল বল্কল দেহে বন্ধন করিয়াছে—পয়োধরের উচ্ছ্রায়ের হেতু সে বল্কল ভিন্ন হইয়াছে।'

ধরণীর উমা 'সূর্য প্রদক্ষিণ করি' ফিরে', এবং—

নম্রভালে আঁকে তা'র প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মি-টীকা।

কুমারসম্ভবের বর্ণনায় আছে—

তথাতিতপ্তং সবিতুর্গভস্তিভি-
র্মুখং তদীয়ং কমলশ্রিয়ং দধৌ।

'সূর্যের কিরণের দ্বারা অতিতপ্ত তাহার মুখ কমলশ্রী ধারণ করিল।'
ধরণীর উমা—

> সমুদ্র-তরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্রপাঠ করে,
> উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে ;

কালিদাসে আছে—

> উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ
> সবাষ্পকণ্ঠস্খলিতৈঃ পদৈরিয়ম্।
> অনেকশঃ কিন্নরাজকন্যকা
> বনান্তসঙ্গীতসখীররোদয়ৎ ॥ (৫।৫৬)

'শিবের চরিত্র গীত হইতে আরম্ভ হইলে উমা সবাষ্পকণ্ঠ হেতু স্খলিত পদে (গানের পদ) বনান্তসঙ্গীতসখী কিন্নরকন্যাগণকে অনেকবার কাঁদাইয়া ছিল।'

ধরণীর উমার—

> বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
> রচে মরীচিকা ॥

কালিদাসের উমাও ত্রিভাগশেষ নিশান্তে মুহূর্তের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া যেন কাহার ছায়ামূর্তি দর্শন করিয়া 'কোথায় নীলকণ্ঠ' বলিয়া প্রলাপোক্তি করিত (৫।৫৭)।

ধরণীর উমা—'আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ' ; কালিদাসের উমারও—

> কৃতোঽক্ষসূত্রপ্রণয়ী তথা করঃ ॥ (৫।১১)

আরও দেখি—

> অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলী
> সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্। (৫।৬৩)

উপরে রবীন্দ্রনাথের এবং কালিদাসের যে কাব্যাংশগুলি পাশাপাশি সাজাইয়া দেওয়া হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে, কালিদাসের প্রতিভার সহিত গভীর যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কত মহৎ এবং স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। উমা-মহেশ্বর এবং তাঁহাদের তপস্যা ও প্রেম রবীন্দ্রকাব্যে 'ঋতুরঙ্গশালা'র বর্ণনায় যে নবরূপ গ্রহণ করিয়াছে কালিদাসের কবি-কল্পনায় তাহার কোথাও কোন আভাস নাই। কিন্তু কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একান্তভাবে দৃঢ়বদ্ধ থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাস্বাদের ক্ষেত্রে তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে।

কালিদাসের কাব্যসম্বন্ধে কবিচিত্তে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল অনেক 'প্রমুষ্ট-তত্ত্বাকস্মৃতি'—সেই স্মৃতিগুলি রসানুভূতির 'সামরস্যে'র ভিতর দিয়া কবির মানস-ছবিগুলির সহিত অতি সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

ইহার পরে 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের একটি নবতম রূপের সহিত আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যে। 'মহুয়া' প্রেমের কাব্য, কিন্তু নবযৌবনা উমার দেহরূপের মত্ততার উপরে প্রতিষ্ঠিত লঘুভোগের চঞ্চল প্রেম নহে, এ প্রেম উমার তপশ্চর্যার পরবর্তী প্রেম। যৌবনে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে প্রেম আসিয়াছিল, সে প্রেম মর্ত্যের প্রেম, চঞ্চল ভোগবাসনার সহিত জড়িত দেহজ আকর্ষণ। প্রথমদিকের কবিতায় তাই রূপের মোহজাল কল্পনার জালকে আছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তারপরে আসিযাছিল মধ্যজীবনে আর একটি যুগ যখন মর্ত্যের এই রূপ ও রূপজ প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার মন একটু একটু করিয়া বিরাগী হইযা উদাসীন হইযা উঠিল; তিনি প্রেম খুঁজিলেন অরূপ-লোকে; 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রভৃতির ভিতব দিয়া তিনি মত্ত হইযা উঠিলেন অরূপের প্রেমে, অরূপের টানে, অসীমের অধ্যাত্ম প্রেমে। তারপরে আসিল 'বলাকা'র তত্ত্বপ্রধান যুগ; 'গীতাঞ্জলি' হইতে 'বলাকা' পর্যন্ত মদন-ভস্মান্তে প্রেমের একটা তপশ্চর্যার যুগ; এই তপশ্চর্যার ভিতর দিয়া লাভ হইল নবীন বলিষ্ঠ ভাস্বর প্রেম। কিছু দিন যেন কবি মর্ত্যের দেহধারী মদনকে একেবারে ভস্ম করিযা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু এই অধ্যাত্মযোগ এবং ধ্যানযোগের ভিতর দিয়া মর্ত্যের প্রেম যেন পুড়িয়া নিখাদ উজ্জ্বল সোনা হইয়া দেখা দিয়াছে। এই সময়কার রচিত 'তপতী' নাটকের ('রাজা ও রাণী' নাটকের পরিবর্তিত নাট্যরূপ) ভিতরেও সুমিত্রার প্রেমে শৈবমন্ত্রের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। এই সময়কার 'যোগাযোগ' উপন্যাসের প্রেমের সকল তিক্ত বিরোধও প্রশান্তি লাভ করিয়াছে 'কুমার-সম্ভব'-এর ভিতরে। এই শৈবমন্ত্রে পরিশোধিত প্রেম উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে এ-যুগের 'মহুয়া' কাব্যে। তাই কবি আবার মর্ত্যের মাটিতে ফিরিয়া আসিয়া মদনের 'উজ্জীবন' করিয়াছেন।—

> ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
> রুদ্র-বহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চি তনু।
> যাহা মরণীয় যাক ম'রে,
> জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে।

যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু ॥

'মহুয়া'র কবিতাগুলি মূলতঃ কবি বিবাহের উপযোগী করিয়াই রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিবাহের কবিতা হইলেও ইহার একটা অনন্যসাধারণতা রহিয়াছে, সেই অনন্যসাধারণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে 'কুমার-সম্ভবে'র পঞ্চমসর্গের প্রেম-সাধনার আদর্শে। এ-প্রেম শুধু বসন্তের চপল প্রণয় নয়, 'দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ' জীবনের সেই দুর্গম বন্ধুর পথেই চলিবে বীর্যের মহিমায় এই প্রেমের জয়যাত্রা। এখানে 'তুচ্ছ লজ্জা ত্রাসে'র কোন স্থান নাই, এখানে বিশ্ববিমুখ আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাসনার স্থান নাই, এ-প্রেম জীবনের পথে দুর্জয় শক্তি—এ প্রেম আত্ম-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া বিশ্বজীবনের সহিত করে নিবিড় যোগসাধন; এই বীর্যদীপ্ত কল্যাণতম প্রেমই হইয়া উঠিয়াছে 'শিবে'র গ্রহণযোগ্য।

এই 'উজ্জীবন' কবিতাটি যে 'মহুয়া'র প্রথম কবিতা এ জিনিসটাকে সম্পূর্ণ একটা আকস্মিক জিনিস বলিয়া মনে হয় না। প্রচ্ছন্নভাবে এই কবিতাটিই কাব্যখানির ভূমিকা-স্বরূপ; ইহার ভিতরে যে প্রেমের বর্ণনা রহিয়াছে তাহার সর্বত্রই প্রেমের একটা 'জ্বলদর্চি' তনুর আদর্শ গূঢ় হইয়া রহিয়াছে, ত্যাগ সাধনার বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই মিলনের মহিমা। এইজন্যই কবি এখানে প্রেমের যতই বিচিত্ররূপের বর্ণনা করুন, তাহার ভিতর দিয়া একটা তপশ্চর্যা এবং বীর্যের দীপ্তিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 'নাগরী'র বর্ণনায়ও তাই কবি বলিয়াছেন,—

আপন তপস্যা লয়ে যে-পুরুষ নিশ্চল সদাই
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভ'রে।

'কুমার-সম্ভবে'র প্রেমের আদর্শ অপূর্ব চমৎকৃতি লাভ করিয়াছে 'মহুয়ার' 'লগ্ন' কবিতাটিতে। ধরণী-উমার সহিত তাহার প্রার্থিত দয়িতের মিলন

হইবে কোন্‌ লগ্নে? উমা প্রথম জীবনে একবার শিবপূজারিণী ছিল; কিন্তু নবযৌবনের সমাগমে সে দেহজ সৌন্দর্যের গর্বে গর্বিতা হইয়া শিবের মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু সে লগ্নে কি তাহার মিলন হইয়াছিল?

প্রথম মিলন দিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে,
যেদিন গৈরিক বস্ত্র ছাড়ে
আসন্নের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা?

প্রাঙ্গণের চারিধারে ঢাকিয়া সজল আচ্ছাদনে
যেদিন সে বসে প্রসাধনে
ছায়ার আসন মেলি;
পরি লয় নূতন সবুজরঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন।

দিগন্তের অভিষেকে
বাতাস অরণ্যে ফিরি নিমন্ত্রণ যায় হেঁকে হেঁকে।
যেদিন প্রণয়ী বক্ষতলে
মিলনের পাত্রখানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে,
কবির সংগীত বাজে গভীর বিরহে,—
নহে নহে, সেদিন তো নহে।

সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে,
যেদিন বাতাস ফিরে গন্ধ চিনে চিনে
সবিস্ময়ে বনে বনে,
শুধায় সে মল্লিকারে কাঞ্চন-রঙ্গনে,
তুমি কবে এলে।

নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধুলায় দেয় ফেলে
ঐশ্বর্যগৌরবে।

কলরবে
অজস্র নিশায় বিহঙ্গম
ফুলের বর্ণের রঙ্গে ধ্বনির সংগম;

অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতি সংঘ আনে পাখায় পাখায়
চিত্রলিপি, কুসুমেরি বিচিত্র অক্ষরে ;
ধরণী যৌবন গর্ব্বভরে
আকাশেরে নিমন্ত্রণ করে যবে
উদ্দাম উৎসবে ;
কবিব বীণার তন্ত্র যে-বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে
প্রমত্ত উৎসাহে।

আকাশে বাতাসে
বর্ণের গন্ধেব উচ্চহাসে
ধৈর্য নাহি রহে,—
নহে নহে, সেদিন তো নহে।

উপবেব বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যসংক্ষিপ্ততায় "কুমাব-সম্ভবে"র তৃতীয় সর্গটিব একটি আস্বাদন দিয়াছেন। তারপরে মিলনের যথার্থ লগ্নেব বর্ণনা, তাহা 'কুমাব-সম্ভবে'র পঞ্চম সর্গ—

যেদিন আশ্বিনে শুভক্ষণে
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হয় ধনে।

প্রাচুর্য-প্রশান্ত তট পেয়েছে সঙ্গিনী
তরঙ্গিনী—
তপস্বিনী সে যে, তার গম্ভীর প্রবাহে—
সমুদ্র বন্দনা গান গাহে।

মুছিয়াছে নীলাম্বর বাষ্পসিক্ত চোখ,
বন্ধমুক্ত নির্মল আলোক।

বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালী মালতী কুন্দে কাশে।

অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিনী নিরবগুণ্ঠিত,

আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।

এই মূল ভাবরস ব্যতীত 'মহুয়া' কাব্যের অনেক কবিতাতে আমরা কুমার-সম্ভব' অবলম্বনে কতগুলি অর্থালঙ্কারও লাভ করি; এই অর্থালঙ্কার-গুলিও মূল ভাবরসকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যেমন—

তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী। (বরণ, মহুয়া)

অথবা—

যেন তার চক্ষুমাঝে
উদ্যত বিরাজে
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী। (জয়তী, ঐ)
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি'
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি। (সাগরিকা, ঐ)

আমরা কিছু পূর্বে 'মহুয়া' কাব্যের রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকের উল্লেখ করিয়াছি। অল্পবয়সে রচিত 'রাজা ও রাণী' নাটকের 'তপতী'তে পরিণতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানেও যেন যৌবনের উদ্দামতায় প্রৌঢ়ের ধ্যান-তপশ্চর্যা যুক্ত হইয়াছে। সেই ধ্যান-তপশ্চর্যার ভিতর দিয়া শকুন্তলা-কুমারসম্ভবের প্রেমাদর্শ নানাভাবে নাটকখানির উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নাটকখানির প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই, রাজা বিক্রম 'মীনকেতু'র পূজার যে আয়োজন করিয়াছিল তাহার ভূমিকা করিল দেবদত্ত ও একদল উপাসক ভৈরবের স্তব দিয়া, এবং সে স্তবেরও আরম্ভ হইল—'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ'।

নাটকের মধ্যে দেখিতে পাই, একটা আত্মকেন্দ্রিক উদগ্র বাসনা লইয়া বিক্রম সুমিত্রাকে ভোগসঙ্গিনী মাত্র করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল; সেই প্রেমস্পৃহাকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমরা ধিক্কৃত হইতে দেখিলাম। শুধু 'বিক্রম-প্রেয়সী'ত্বই সুমিত্রার সমগ্র পরিচয় হইতে পারে না, কারণ, 'শুধু কি তিনি রাজবধূ। তিনি যে লোকমাতা।' আদর্শটি আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে সুমিত্রার নিজেরই উক্তিতে,—'তোমার চিত্তসমুদ্রে যে তুফান

উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়—উন্মত্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মুহূর্তে এ যাবে তলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে।'

'মহুয়া'র পরে 'কুমার-সম্ভব'কে আবার দেখিতে পাই 'বিচিত্রিতা'র 'ছায়াসঙ্গিনী' কবিতায়। পরিণতবয়স্কা নারীর সমস্ত দেহমন ঘিরিয়া একটি 'ছায়াসঙ্গিনী' বিরাজ করিতেছে। এই 'ছায়াসঙ্গিনী' কাহার ছায়া? একদিন এই নারীর জীবনে যৌবনের প্রথম ফাল্গুনী আসিয়াছিল; সেই ফাল্গুনীর পায়ের ধ্বনি শুনিয়া 'কম্পিত কৌতুকে' নাবী আপনার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; সেদিন 'আম্র-মঞ্জরীর গন্ধে'র ভিতর দিয়া এবং 'মধুপগুঞ্জনে'র ভিতর দিয়া এই নারীর হৃদয়-স্পন্দন মিলিয়া গিয়াছিল বনমর্মরেব সঙ্গে,—'অশোকেব কিশলয়স্তব' বিস্তার করিয়া দিয়াছিল তাহার যৌবনেব নবীন রক্তিমা। কিন্তু তারপরে নারী সসঙ্কোচে সেই উৎসুক হৃদয়দ্বার বন্ধ কবিয়া দিল, 'উচ্ছৃঙ্খল সমীরণে উদ্দাম কুন্তলভার' সংযত করিয়া লইল,—আর –

> অশান্ত তরুণ প্রেম বসন্তের পন্থ অনুসরি'
> স্খলিত কিংশুক সাথে
> জীর্ণ হোলো ধূসর ধূলাতে।

কিন্তু জীবনের সেই প্রথম ফাল্গুনী নিঃশেষে নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই,—তাহাবই ছায়া আজ ফিরিতেছে এই নারীর দেহমন ঘিরিয়া সঙ্গিনীর মত।

> তুমি ভাবো সেই রাত্রিদিন
> চিহ্নহীন
> মল্লিকা-গন্ধের মতো,
> নির্বিশেষে গত।
> জানো না কি যে-বসন্ত সম্বরিল কায়া
> তারি মৃত্যুহীন ছাযা
> অহর্নিশি আছে তব সাথে
> তোমার অজ্ঞাতে।
> অদৃশ্য মঞ্জরী তার আপনার রেণুর রেখায়
> মেশে তব সীমন্তের সিন্দুর লেখায়।
> সুদূর সে ফাল্গুনের শুব্ধ সুর
> তোমার কণ্ঠের স্বর করি' দিল উদাত্ত মধুর।

যে চাঞ্চল্য হ'য়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগভীর॥

'শেষ সপ্তকে'র সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতায় আবার 'ঋতুরঙ্গশালা'র সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বলক্ষ্মী বৈশাখে একদিন বসিয়াছিল দারুণ তপস্যায় রুদ্রের চরণতলে; উপবাসে তাহার তনু হইয়াছিল শীর্ণ, পিঙ্গল হইয়াছিল কেশপাশ। এই দুঃখের দহনে—

ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হোলো
ত্যাগের হোমাগ্নিতে।

এই কঠোর তপস্যার ভিতর দিয়া—

দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জন,
অবনত হোলো দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে॥

'শেষ সপ্তকে'ব পবিশিষ্টে (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড) 'আষাঢ়' নামক কবিতাটির ভিতরেও এই সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতারই রূপান্তর দেখিতে পাই।

'বীথিকা'র 'সন্ন্যাসী' কবিতার সহিত 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গে'র মিল রহিয়াছে। গম্ভীর সন্ন্যাসী মহেশ্বরকে নিরন্তর চঞ্চল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে মন্দাকিনীর কত নির্ঝর ধারা; তাহাবা 'উৎক্ষিপ্ত শীকর-বাষ্পে বাঁধা ইন্দ্রধনু' রচনা করিয়া মহেশ্বরের শুভ্রতনু বর্ণে-বর্ণে বিচিত্রিত করিয়া দিতেছে। 'নন্দীর রুষ্ট তর্জনী' এবং 'ভৃঙ্গীব ভ্রূকুটি' তাহাদের এই চপলতাকে যতই শাসন করিতে চেষ্টা করুক, এই চাপল্যের প্রতি মহেশ্বরের একটি মৌন স্মিত সম্মতি রহিয়াছে। তাই—

এদের প্রশ্রয় দিলে তাই যত দুর্দামের দল
চরাচর ঘেরি' ঘেরি' করিছে উন্মত্ত কোলাহল
সমুদ্র তরঙ্গতালে, অরণ্যের দোলে,
যৌবনের উদ্বেল কল্লোলে।

এই কবিতাটিতেও দুই একটি এমন চরণ আছে যাহা স্পষ্টই 'কুমার-সম্ভবে'র সহিত যুক্ত ; এখানকার প্রসঙ্গের সহিত 'কুমারসম্ভবে'র সেই যোগ কাব্যার্থকে বুদ্ধিগ্রাহ্যত্বের ভিতরেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরম আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছে। যেমন—

'উদ্ধত নন্দীর রুষ্ট তর্জনীরে করে পরিহাস',—

ইহার সহিত 'কুমার-সম্ভবে'র বর্ণনা মিলাইয়া পড়ুন—

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষী॥ (৩।৪১)

শিবের তপস্যাভূমির লতাগৃহদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন নন্দী, বামহস্তে তাঁহার হেমবেত্র ; মুখার্পিত একটি অঙ্গুলি-সঙ্কেতের দ্বারা তিনি সকলকে চপলতা প্রকাশ করিতে বারণ করিতেছিলেন।

এই লতাগৃহদ্বারে নন্দীর তর্জনী-সঙ্কেতের দৃশ্যটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাই নানা যুগের নানা কবিতায় এই চিত্রটির রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দু'একবার ইহার উল্লেখ করিয়াছি। 'শেষ সপ্তকে'র বিংশ সংখ্যক কবিতায় আছে—

দক্ষিণের দিকে শালের গাছ সারি সারি,
দীর্ঘ, ঋজু, পুরাতন,—
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে,
শুক্লনবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে ;—
দূরে কোকিলের ক্লান্ত কাকলিতে বনস্পতি উদাসীন।
ও যেন শিবের তপোবন দ্বারের নন্দী,
দৃঢ় নির্মম ওর ইঙ্গিত।

'ছড়ার ছবি'র 'খেলা' কবিতায়—

এসেই দেখি নিষেধ জাগে কুহেলিকার স্তূপে,
গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন সুগম্ভীরের রূপে।

পংক্তিটির ভিতরেও পূর্বোক্ত ছবিটির সংকেত রহিয়াছে। 'প্রান্তিকে'র আট সংখ্যক কবিতায় আছে 'ক্ষান্ত হল চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনী সংকেতে।' 'রোগশয্যায়'-এর আট সংখ্যক কবিতায় আছে—

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।

'সেঁজুতি'র 'প্রতীক্ষা' কবিতাটির মধ্যে যে ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সহিতও 'কুমার-সম্ভবে'র একটি ক্ষীণ পরোক্ষ যোগ লক্ষ্য করা যায়। আমরা 'পূরবীর' 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির মধ্যে দেখিয়াছি, নিত্য নব সম্ভাবনাময়ী সৃষ্টিই উমা রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই উমার হাসি দেখিয়া জাগিয়া উঠিবার জন্যই মহেশ্বরের ধ্যান-তপস্যার আত্ম-সংহরণ। 'সেঁজুতি'র 'প্রতীক্ষা' কবিতায় এক নবীন প্রকাশময়ী সম্ভাবনাময়ীকে—অর্থাৎ সৃষ্টির অব্যক্ত নবপ্রকাশকে পরোক্ষে উমারূপে কল্পনা করিয়াছেন—তাহারই জন্য যেন মহাকাল তপস্বীর ন্যায় জাগিয়া আছে।—

অসীম আকাশে মহাতপস্বী
মহাকাল আছে জাগি।
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে,
দেয়নি যে দেখা আজো কোনখানে,
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি
মহাকাল আছে জাগি।

... ...

যার পরিচয় কারো মনে নাই,
যার নাম কভু কেহ শোনে নাই,
না জেনে নিখিল পড়ে আছে পথে
যার দরশন মাগি—
তারি সত্যের অপরূপ রসে
চমকিবে মন অদ্ভুত পরশে,
মৃত পুরাতন জড় আবরণ
মুহূর্তে যাবে ভাগি,
যুগ যুগ ধরি তাহার আশায়
মহাকাল আছে জাগি।

'নব জাতকে'র 'ক্যাণ্ডীয় নাচ' কবিতায় তপোভঙ্গের পরে মহাদেবের

তাণ্ডব নৃত্যের পরিচয় রহিয়াছে। 'ক্যাণ্ডীয় নাচে'র ভিতরে একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে ; সে—

নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন-ফেরা,
নহে আবেগ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা,
নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন ;
আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন।

এ নৃত্য মানুষ শিখিয়াছিল সৃষ্টির ভিতরে মহাদেবের যে একটা তাণ্ডব নৃত্য আছে তাহা হইতে ; সমুদ্রের ঢেউ দিয়াছে রক্তে ছন্দের দোলা, ঝঞ্ঝা দিয়াছে মঞ্জীরে প্রলয় নাচের ঝঙ্কার, শূন্যে উত্তোলিত বাহুতে আছে রাহুর হাঁ। সৃষ্টির এই নৃত্য মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য—যে নৃত্য আনন্দের নাচে মোহ-মদিরকে নিঃশেষে দাহন করে—

মহাদেবের তপোভঙ্গে যেন বিষম বেগে
নন্দী উঠল জেগে,
শিবের ক্রোধের সঙ্গে
উঠল জ্বলে দুর্দাম তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
নাচের বহ্নিশিখা
নিদয়া নির্ভীকা।
খুঁজতে ছোটে মোহ-মদের বাহন কোথায় আছে
দাহন করবে এই নিদারুণ আনন্দময় নাচে।

॥ ৬ ॥

কালিদাসের কাব্যগুলি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সে কবিকে কত ভাবে দোলা দিয়া কত রসানুভূতি ও চিন্তা জাগ্রত করিয়াছে আমরা তাহার বিশদ আলোচনা করিলাম। কালিদাসের 'মেঘদূত' 'শকুন্তলা' এবং 'কুমার-সম্ভব' কবিচিত্তকে এমনভাবে অধিকার করিয়াছিল যে বহুস্থানে অর্থালঙ্কার রূপে এই কাব্যগুলির ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার কবিতার ভাবার্থকেও সম্প্রসারিত করিয়াছেন, রসানুভূতিকেও গভীর করিয়া তুলিয়াছেন। যেমন—

এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে.
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে। (শাজাহান, বলাকা)

এখানে এই 'মেঘদূতে'র রূপক গ্রহণের ফলে, শা-জাহানের বিদেহী প্রিয়া বিশ্বের অন্তর্নিহিতা সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ প্রতিমার সহিত একযোগে একটি কবিচিত্তের মানস-প্রতিমা হইয়া উঠিযাছে; তাহার ভিতর দিযাই আবার শা-জাহানের প্রেমিক হৃদয় একটি সর্বজনীন কবিচিত্তের মর্যাদা লাভ করিয়াছে আর এই বিরহী-বিরহিণীর ভিতরকার প্রেম একটা সূক্ষ্ম মহিমা লাভ করিযাছে মধ্যবর্তী এই সৌন্দর্যের 'মেঘদূতে'র দৌত্যে।

'মহুয়া'র 'দূত' কবিতাটির ভিতরে—

ছিনু আমি বিষাদে মগনা
অন্যমনা
তোমার বিচ্ছেদ-অন্ধকারে।
হেনকালে নির্জন কুটীর দ্বারে
অকস্মাৎ
কে করিল করাঘাত,
কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, অতিথি এসেছি দ্বার খোলো।

প্রভৃতি দুষ্মন্তের ধ্যানমগ্না বিরহিণী কুটীর-প্রাঙ্গণে নিষণ্ণা শকুন্তলা এবং অতিথি দুর্বাশাকেই স্মরণ করাইয়া দিবে। এই দৃশ্য-রচনা কবি যে-কথা বলিতে চান তাহার পটভূমি রূপে সুকুমার ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে।

এখানে-সেখানে গানের ভিতরেও এই জাতীয় রূপক, রূপ ও রস উভয় দিক দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছে যেমন—

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে—

... ...

হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তা'র মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। (ফাল্গুনী)

আবার—

শালতাল শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে।
(পূরবী, পঁচিশে বৈশাখ)।

ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা; (রোগশয্যায়, ৩৭)

রবীন্দ্রনাথের উপরে কালিদাসের 'মেঘদূত' এবং 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের প্রভাবই মুখ্য হইলেও কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের প্রভাবও নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের উপরে কাজ করিযাছে। কালিদাস ছিলেন ষড়্ঋতুর কবি। এই ষড়্ঋতুর বর্ণনা প্রসঙ্গক্রমে রহিয়াছে অনেক কাব্যের ভিতরে ছড়ান,—আবার একত্রে সাজান রহিয়াছে 'ঋতু-সংহার' কাব্যের ভিতরে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কলিদাসের এই 'ঋতু-সংহারে'র কবি হিসাবে যে একটি বিশেষ রূপ রহিয়াছে সেই 'যৌবনের যৌবরাজ্যে' আসীন যুবরাজ রূপটিও রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায় নাই। 'চৈতালির' 'ঋতু-সংহার' কবিতার ভিতর দিয়াই কালিদাসের এই বিশেষ রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন এই ষড়্-ঋতুর কবি। এই ষড়্-ঋতুর বর্ণনা এবং বন্দনা যে তাঁহার কাব্য, কবিতা, নাটক, গানগুলির ভিতরেই ছড়াইয়া আছে তাহা নহে, কালিদাসের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও গোটা কাব্য রচনা করিয়া ঋতুর গান করিয়াছেন। 'প্রবাহিণী'র ভিতরকার 'ঋতু-চক্রে'র উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। অবশ্য এখানে রবীন্দ্রনাথ কলিদাসের চোখে ষড়্-ঋতুকে দেখেন নাই, সমস্ত বর্ণনার ভিতরেই প্রকাশিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন দৃষ্টি এবং বিচিত্র স্বতন্ত্র রসানুভূতি। কিন্তু তাহা হইলেও এই 'ঋতু-চক্রে'র

বর্ণনার ভিতরেও কালিদাস যে রবীন্দ্রনাথের মনের কোণে উঁকি দেন নাই এ-কথা বলা যায় না। তাই দেখি—

বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষণে॥
যে-মিলনের মালাগুলি
ধূলায় মিশে হ'ল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে॥
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে॥

(ঋতু-চক্র, প্রবাহিণী।)

কিন্তু সৃষ্টির বুকে এই ঋতু-আবর্তনের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরে একটা নূতন ভাবদৃষ্টি গড়িয়া উঠিতেছিল; ঋতু-বিবর্তন ক্রমে নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দের রূপ পরিগ্রহ করিল। এই ভাবদৃষ্টিরই পূর্ণ পরিণতি রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ—ঋতুরঙ্গশালা'য়। এখানে আসিয়া ঋতু-আবর্তনের ভিতর দিয়া পৃথিবী এবং নটরাজ যে কি করিয়া 'কুমার-সম্ভবে'র উমা-মহেশ্বরের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। এই 'ঋতুরঙ্গশালা'র নটরাজের আভাস রহিয়াছে 'ঋতুচক্র' কাব্যের ভিতরেই। 'ঋতুরঙ্গশালা'র বৈশাখের বর্ণনার সহিত 'ঋতু-চক্রে'র বৈশাখের নিম্নলিখিত বর্ণনাটি মিলাইয়া লইলেই কথাটি স্পষ্ট হইবে।

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস কোন অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে?
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি
এলো গভীর ছায়া ফেলে॥
রুদ্র তপের সিদ্ধি একী ঐ যে তোমার বক্ষে দেখি।
ওরি লাগি আসন পাত হোমহুতাশন জ্বেলে?
নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো
তোমার রক্ত নয়ন মেলে।

ভীষণ, তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাঁধন যত
যেন হানবে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ-যে আশার ভাষা উঠ্‌ল বেজে,
দিলে তরুণ শ্যামল রূপে করুণ সুধা ঢেলে॥

কালিদাসের ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকখানির—বিশেষ করিয়া ইহার চতুর্থ অঙ্কটিব (গ্রন্থের প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য) রবীন্দ্রনাথেরও মনের উপরে একটা গভীর রেখাপাত করিতে পারিত এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা কালিদাসের এই সার্থক সৃষ্টির আর একটা যুগোপোযোগী রূপান্তর আশা করিতে পারিতাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টিতে সে জিনিষটি ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ‘উর্বশী’ কবিতাটিতে আমরা এই ‘বিক্রমোর্বশী’র কিছু প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। নারী-সৌন্দর্য এবং বিশ্বসৌন্দর্যের ভিতরে যে স্পষ্ট কোন বিরোধ নাই বরং নিগূঢ় একটা যোগ রহিয়াছে এ-কথাটি রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বশী’ কবিতার একটা প্রধান কথা। কথাটা কবি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, ‘উর্বশী’র অঙ্কনের ভিতর দিয়া ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈদিক যুগের কবিগণের মনে উর্বশীর আদিম পরিকল্পনার ভিতরেই যেন কথাটি নিহিত ছিল। কালিদাস তাহাব উপরেই কল্পনার রং চাপাইয়াছেন। রাজা পুরূরবা যে কি করিযা প্রকৃতির সর্বত্র উর্বশীর রূপ, রং এবং চপল লীলাবিভ্রম দর্শন করিয়াছিলেন আমবা পূর্বে তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বশী’র বর্ণনা—

সুর-সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী।
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,

দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসংবৃতে।

প্রভৃতি মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে, প্রাচীনের পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথ কত উজ্জ্বল।

উপরে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গির উপরে কালিদাসের যে প্রভাবের কথা বিশদভাবে আলোচনা করিলাম তাহার ভিতর দিয়া পাঠকের মনে হঠাৎ ভ্রান্তি আসিতে পারে; সে ভ্রান্তি এই যে, দেশ-বিদেশের বড় বড় কবিগণের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যদি এত জিনিস গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার স্বকীয়তা কোথায় এবং কতটুকু। এই জাতীয় একটা ভ্রান্তির সম্ভাবনা এইজন্য যে, আমরা এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার বিশেষ একটা দিক লইয়াই আলোচনা করিতেছি, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার সমগ্র পরিচয় ইহাতে ফুটিয়া ওঠে নাই, উঠিবার কথাও নয়।

পূর্বের আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে, কালিদাসের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহার সংখ্যা অনেক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রতিভা লইয়া বিচার করিলে তুলনায় এই পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। অধিকন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষ দিকের আলোচনা তাঁহার 'স্বে মহিম্নি' প্রাতষ্ঠিত সমগ্র কবি-প্রতিভাকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার উপরে কালিদাসের ভাবধারার যে প্রভাবের কথা উপরে আলোচনা করিলাম, ইহার ভিতরেও একটু লক্ষ্য করিলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য আমরা আবিষ্কার করিতে পারিব। স্বাতন্ত্র্যটুকু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে কালিদাসের প্রতিভার সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাব পার্থক্য কোথায় সেই কথাটি একটু বুঝিতে হইবে।

আমরা বাল্মীকি ও কালিদাসের কবি-প্রতিভা লইয়া যখন আলোচনা করিয়াছি তখন দেখিয়াছি, উভয় কবির প্রতিভার ভিতরে একদিকে যেমন ছিল কতকগুলি সাধর্ম্য, অপর দিকে আবার ছিল কতকগুলি প্রকাণ্ড ব্যবধান। কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সেই কথা। আমরা এতক্ষণ কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার ঘনিষ্ঠতার কথা আলোচনা করিতে গিয়া উভয় কবির সাধর্ম্যের কথাটাই নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু এই সাধর্ম্য এবং তজ্জনিত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও উভয় কবির প্রতিভার ভিতরে ছিল একটা প্রকাণ্ড মৌলিক ব্যবধান।

আমরা গ্রন্থের পূর্বার্ধে এবং উত্তরার্ধে প্রসঙ্গক্রমে কালিদাসের কাব্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি তাহার ভিতরে দেখিয়াছি, কালিদাস ব্যক্তি-জীবন ও বিশ্ব-জীবনের সহিত যোগ স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন বিশ্ব-

জীবনকে যতখানি সম্ভব ব্যক্তি-জীবনের কাছে টানিয়া। বহির্বিশ্বকে তাই তিনি প্রধানতঃ দেখিয়াছেন তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ঘরোয়া দৃষ্টি লইয়া, তাহাকে বর্ণনাও করিয়াছেন এই ব্যবহারিক জীবনের ভাষায়। রবীন্দ্রনাথও এই ব্যক্তি-জীবন ও বিশ্ব-জীবনের ভিতরে নিগূঢ় যোগ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কালিদাসের অনেকখানি বিপরীত উপায়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনটাকেই যতখানি পারিয়াছেন টানিয়া লইয়াছেন বিশ্ব-জীবনের ভিতরে। কালিদাস অসীমকে যতটা পারেন সীমার ভিতরে বাঁধিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সীমাকে যতটা পারেন অসীমের ভিতরে মুক্তি দিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ব-জগৎকে মানুষের বাস্তব সুখদুঃখ, মিলন-বিরহ, আশা-নিরাশার রঙে রাঙাইয়া দিয়া দূরের জিনিসকে একান্ত কাছের করিয়া তোলাই কালিদাসের বৈশিষ্ট্য; অপরদিকে তথাকথিত বাস্তব জীবনের ছোট-খাট যাহা কিছু সকলকে শুধু বিশ্ব-জীবনের নিঃসীমতার রহস্যলোকে টানিয়া লইয়া তাহাকে অনির্বচনীয় মহিমা দান করাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

কথাটা অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' লইয়া আলোচনা করিলে। কালিদাসের 'মেঘদূতে'র বর্ণনায় দেখিতে পাই, বাহিরের বিরাট বিশ্বটা চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিয়াছে একটি যক্ষ এবং যক্ষবধূর বিরহকে কেন্দ্র করিয়া। সেখানে আকাশ-মেঘ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখী, গন্ধর্ব-কিন্নর সকলই আমাদের অতি কাছে চলিয়া আসিয়াছে ব্যক্তি-জীবনের সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের লীলাচঞ্চল রূপে। 'কুমার-সম্ভবে'র ভিতরে দেখিতে পাই, বিরাট হিমালয়ও আমাদের কত কাছের জিনিস—আপন জিনিস। কখনও বাৎসল্যের ধারা বুকে করিয়া পিতারূপে, কখনও নবযৌবনা 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' উমার প্রেমচাঞ্চল্যের লীলাভূমিরূপে। 'ঋতু-সংহারে'র ভিতরেও দেখি, ষড়্ঋতুর সকল আবর্তন লইয়া বহির্বিশ্ব চলিয়া আসিয়াছে অনন্তযৌবন মানুষের বাসর কক্ষে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভিতরে দেখিতে পাই, তিনি ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিয়া কেবলই মুক্তি খুঁজিয়াছেন; তাই রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূতে'র ভিতরে সবচেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে এই মুক্তির বাণী—প্রেমের মুক্তি এবং তাহার ভিতর দিয়াই ব্যক্তি-জীবনের মুক্তি। তিনি 'মেঘদূতে'র দিন বলিয়াছেন তাহাকে, যে-দিনটা মেঘেমেঘে অন্ধকার হইয়া শুধু নিশ্চল হইয়া বসিয়া নাই, যে-দিনটা শুধু উদ্দাম উধাও চলে—আর তাহার চলার সঙ্গে চালাইয়া লয় আমাদের প্রেম, যে-প্রেম তাহার অভিসারে

চলিয়াছে 'মানস লোকের অগমপারে' অবস্থিত দয়িতের পানে,—অপূর্ণ হইতে পরিপূর্ণতায়, সীমা হইতে অসীমে।

এই যে সীমার ভিতরে অসীমের আকুতি রবীন্দ্র-প্রতিভার এইখানেই বৈশিষ্ট্য। কালিদাসের ভিতরে আবার এই জিনিসটিই কদাচিৎ মিলিবে। এই বৈশিষ্ট্যের পথেই স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা—শৈশব হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। কালিদাস তাঁহার কবি-প্রতিভার সকল বিরল মাধুর্য এবং চাতুর্য লইয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ বিকাশের পথটি কখনও অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়ান নাই, কালিদাসের সকল দানও কবির এই পথেরই পাথেয় হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ৭ ॥

আমরা গ্রন্থের প্রথম ভাগে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশ্ব-প্রকৃতির বর্ণনা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার ভিতর দিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈদিক-সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের কবিগণ সকলের প্রাকৃতিক বর্ণনার ভিতর দিয়া একটি বিশেষ ভারতীয় মনের পরিচয় পাই। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা সেই একই মনের নানা বিবর্তন বা পরিণতি দেখিতে পাই। আমাদের মনে হয়, এই ক্রম-পরিণতির ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অখণ্ড গতিতেই চলিয়া আসিয়াছে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনও বিশেষ কবিদ্বারাই যে বেশী বা সাক্ষাৎভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন তাহা বলা যায় না, এখানে বৈদিক কবি, উপনিষদের কবি বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি সম্মিলিতভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে বাসা বাঁধিয়াছেন। কথাটি অন্যরূপ করিয়া বলা যাইতে পারে, অতীতের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবি-পুরুষের যে গভীর যোগ তাহার পরিচয় রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাবদৃষ্টির ভিতরেও।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টিটি তাঁহার জীবন-দর্শনের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের প্রধান কথা একটা অখণ্ডবোধ। কালের কোন অন্ধকার গহন গহ্বর হইতে যে এই জীবনের ধারা প্রথম উৎসারিত হইয়াছে তাহা কিছুই বলা যায় না,—কিন্তু কবি

একথাটা গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন যে এ-জীবন তাহার সকল জন্ম-জন্মান্তরের অতীত ইতিহাস, তাহার বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনার ভিতর দিয়া অখণ্ড। ব্যক্তি-জীবনের এই অখণ্ডতাবোধের সহিতই যুক্ত রহিয়াছে বিশ্ব-জীবনের অখণ্ডতা বোধ। বিশ্ব-জীবনের তুচ্ছতম বস্তু বা ঘটনাটিও একান্ত বিচ্ছিন্ন কোন সত্তা বা ক্রিযা নহে; সকল সত্তা ও ক্রিয়া জুড়িয়া চলিয়াছে বিশ্ব-জীবনের একটি অখণ্ড পরিণতি নিরন্তর প্রকাশের পথে। এই ভাবদৃষ্টি লইযা প্রকৃতির দিকে তাকাইলে প্রকৃতির ভিতরে শুধু যে জড় ও চেতনেব কোন ব্যবধানেব প্রশ্ন ওঠে না তাহা নহে,—'আমি'র সহিত 'অপরে'রও কোন ভেদের প্রশ্ন থাকে না,—এইখানেই বিশ্ব-জীবনের ভিতরে অদ্বযযোগ।

বিশ্ব-জীবন সম্বন্ধে এই যে অদ্বয়দৃষ্টি ইহাকে আমি পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি বিশেষরূপে ভারতীয় দৃষ্টি। সেই বৈদিক যুগ হইতে আমবা জানি—প্রকৃতিব যাহা কিছু সকলেব পশ্চাতে রহিযাছেন দেবতা, উপনিষদ্ বলিযাছেন 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'—যে এখানে নানাকেই দেখে—অর্থাৎ সৃষ্টিব যাহা কিছু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিযাই দেখে, সে মৃত্যুব লোক—মৃত্যুকেই পায়। বামায়ণে আমরা এই অদ্বয়দৃষ্টিব এক রূপ দেখিয়াছি, কালিদাসেব কাব্যে আব এক রূপ দেখিযাছি—আব এই সকলেব একটি বিশেষ পবিণতি আসিযা দেখিতে পাই ববীন্দ্রনাথের ভিতবে। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপেও একটা বোম্যান্টিক অদ্বয়বাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল,—তাহাব সহিতও ববীন্দ্রনাথের মনের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায; কিন্তু ভাবতীয সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যেব ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই অদ্বয়বাদেব সহিত আশৈশব এত ঘনিষ্ঠভাবে পবিচিত যে এখানে পাশ্চাত্য-প্রভাবের প্রশ্ন গৌণ হইয়া যায। ভাবতীয মনে এই অদ্বযযোগের সত্যটি যুগে যুগে এতরূপে আবর্তিত হইযা আসিয়াছে যে আজ আর লেখক বা পাঠক কাহারও নিকটে এ-কথাটা একটা নূতনেব আলোক আনে না, আমবা ইহাকে গ্রহণ কবি অতি সহজ ভাবে।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি' সাহিত্যক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথের নিকট প্রকাণ্ড একটা আবিষ্কার ছিল। এই দৃশ্য যে রবীন্দ্রনাথকে কতখানি অভিভূত কবিয়াছিল তাঁহার 'প্রাচীন-সাহিত্যে'র লেখাগুলির মধ্যে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয রহিয়াছে। 'চৈতালি'র ভিতরে 'মিলনদৃশ্য' কবিতাটির মধ্যেই দেখি—

হেসো না, হেসো না তুমি বুদ্ধি-অভিমানী।
একবার মনে আনো, ওগো ভেদজ্ঞানী,
সে মহাদিনের কথা, যবে শকুন্তলা
বিদায় লইতেছিল স্বজনবৎসলা
জন্ম তপোবন হতে—সখা সহকার,
লতা ভগ্নী মাধবিকা, পশু পরিবার,
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী,
দাঁড়াইল চারিদিকে ; স্নেহের মিনতি
গুঞ্জরি উঠিল কাঁদি পল্লব মর্মরে,
ছলছল মালিনীর জল কলস্বরে ;
ধ্বনিল তাহার মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর
মঙ্গলবিদায়মন্ত্র গদ্‌গদগম্ভীর।
তরুলতা পশুপক্ষী নদনদী-বন
নর নারী সবে মিলি করুণ মিলন।

কবি কালিদাস যেরূপ সহজ অনুভূতিতে এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ সহজ অনুভূতিতেই এই দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে অভেদদৃষ্টিতে বা অদ্বয়দৃষ্টিতে এই দৃশ্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব সেই অভেদদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের একান্তভাবেই সহজাত।

এই অদ্বয়দৃষ্টির ফলে পৃথিবী দেখা দিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে সত্যকারের এক 'ধরিত্রী' মূর্তিতে—'নিত্য-নিদ্রাহীন মহাজননী'রূপে। 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় এই ধরিত্রীকে দেখিতে পাই—

দিবা রাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরাণীর মিলন, কলহ,
আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জন,
অযুত পন্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ—

ইহার সকলকে বুকে করিয়া এক মাতৃমূর্তিতে ; এই জননী বিরাজ করেন পত্রপুষ্পজালে বিবিধবর্ণে বিচিত্রিত যবনিকার অন্তরালে ; এবং—

—তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে ;—

এই ধরিত্রীর বুকে 'অহল্যা' যে কন্যার মত পাষাণরূপে এক হইয়া গিয়াছিল—সে যে ধরিত্রীর বুকে বুক মিলাইয়া দিয়া দীর্ঘ দিবানিশি জননীর বিচিত্র অনুভূতিকে গ্রহণ করিতে পারিযাছিল ইহা ত অতি সহজ কথা। আবার শাপান্তে অহল্যা যেদিন পুনরায় মানবীরূপে দেখা দিল সেদিন সে 'ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত সুন্দর সরল শুভ্র'। এই যে মানবীর পাষাণীরূপে ধরণীর বুকে মিশিয়া যাওয়া এবং সেখান হইতে পাষাণীর মানবী রূপে ফিরিযা আসা আমাদের কাছে ইহার ভিতরে কোথাও কোন কষ্ট-কল্পনা নাই ; কারণ আমরা বহু পূর্বে ধরণী-কন্যা সীতাকে মানবী রূপেই সহজভাবে সাগ্রহে বরণ করিযা লইয়াছি ; পাষাণ হিমালয়ের কন্যা উমার লীলা-চাঞ্চল্য এবং প্রেম-তপস্যায় মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। বাল্মীকির সীতার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই অহল্যার সোদরত্ব অতি স্পষ্ট ; সীতাকেও বাল্মীকি-রামাযণে আমরা পাইয়াছিলাম 'ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত সুন্দর সরল শুভ্র'। অহল্যা ধরিত্রী হইতে যখন পৃথক হইয়া মানবী রূপ ধারণ করিয়াছে তখনও সে ধরিত্রী হইতে অনেক দূরে সরিযা যায় নাই, তখনও—

> যে শিশির প'ড়েছিলো তোমার পাষাণে
> বাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
> আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
> যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিযা তোমায়
> ধরণীর শ্যাম শোভা অঞ্চলের প্রায়
> বহু বর্ষ হ'তে—পেযে বহু বর্ষাধারা
> সতেজ, সরস, ঘন—এখনো তাহারা
> লগ্ন হ'য়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
> মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

বাল্মীকির রামায়ণেও দেখিতে পাই, সীতা যেদিন প্রথম মেদিনী ভেদ করিয়া হলক্ষতমুখে জাগিয়াছিল সেদিন তাহার সমস্ত দেহে বিকীর্ণ হইয়াছিল মাঠের শুভ ধূলিকণা,—যেমন করিয়া শিশু-বালিকার দেহে মাখান থাকে শুভ পদ্মরেণু।—পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণৈঃ শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ ॥

'মানসী' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সহিত মানুষের এই নিবিড় নাড়ী বন্ধনের কথা প্রাচীন উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া কিছুটা কল্পনার আশ্রয়ে বলিয়াছেন ; কিন্তু 'সোনার তরী'তে আরোহণ করিয়া তাঁহার ব্যক্তি-পুরুষটিই

এই জননীর সহিত তাঁহার যোগকে স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতির সহিত কোন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিরোধ নাই; সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যকে স্বীকার করিয়াই তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন-স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক্ হ'তে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি'...
(সমুদ্রের প্রতি, সোনার তরী)

'বসুন্ধরা' কবিতার ভিতরে পৃথিবীর সহিত কবির ঘনিষ্ঠতম যোগের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ধূলিমাটির পৃথিবীর সহিত কবির ত শুধু একদিনের এক জীবনের পরিচয় নয়, এই পৃথিবীর ধূলিকণার সঙ্গে—তাহার অন্তর্লীন প্রাণশক্তির সঙ্গে—কবির দেহ-প্রাণ বিলীন হইয়াছিল একটা অজ্ঞাত সম্ভাবনা রূপে,—সেই সম্ভাবনা রূপে ধরণী মায়ের সহিত এক হইয়া কবি পৃথিবীর সহিত অনন্ত গগনে কত দিন কত রাত্রি বিরাট সবিতৃমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন; পৃথিবীর দেহ-প্রাণের সহিত অভেদরূপে জড়িত কবির সেই দেহ-প্রাণের উপরেই কতদিন উঠিয়াছে কত তৃণ, ফুটিয়াছে কত ফুল--তরুরাজিপত্রফুলদলের সহিত ছড়াইয়াছে কত গন্ধরেণু,—

তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে

কী জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ, ...
তাই আজি কোনো দিন, শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্বশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র 'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হ'য়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লব নিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়।

'চৈতালি'র 'মধ্যাহ্ন' কবিতায়ও দেখি সেই একই স্মরণ—

ফিরিয়া এসেছি যেন আদিজন্মস্থলে
বহুকাল পরে, ধরণীর বক্ষতলে
পশুপাখিপতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে, জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

এই সকল কথাই রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার 'ছিন্ন-পত্রে'র অন্তর্গত দু'একখানি চিঠিতে।—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'যে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূব বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত—আমি কত দূরদূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে প'ড়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনী শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম

পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্রে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠচে এবং নারিকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপ্‌চে।"

মাটির সহিত এই যে তাঁহার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর—প্রত্যেকটি প্রাণ-স্পন্দনের যোগ তাহাকে কবি এত নিবিড় করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, মাটির সঙ্গে এই বিচ্ছেদ তাঁহাকে বহুসময়ে বেদনায় পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে; তিনি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিয়াছেন, মানুষের জীবন তাঁহাকে পৃথিবীর স্নেহময় কোল হইতে নানাপাকে বহুদূরে সরাইয়া আনিয়াছে, মানব-জীবন তাঁহাকে মাটির কোল হইতে যত দূরে টানিয়া লইতে চাহিয়াছে কবি ততই বেদনা বোধ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁহার মনে হইয়াছে—

> বাঁধন ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
> সইবে না এই ছাড়াছাড়ি, (মাটির ডাক, পূরবী)

এবং কবিও এই জন্য সারাজীবনই ফিরিয়া ফিরিয়া আপন মাকে চাহিয়াছেন। ধরণীর দুহিতা সীতাও একবার এমনি করিয়াই নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষের সংসারে আসিয়াছিল; কিন্তু সে বেশীদিন এই বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে নাই; সে হয়ত দেখিয়াছিল, প্রকৃতির কোল হইতে মানুষ তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছে; সে তাই আবার লুটাইয়া পড়িয়াছে মায়ের বুকে—ফিরিয়া গিয়াছে ধরণীর অন্তঃপুরে। সীতার সহিত ধরণীর এই নাড়ীর যোগের কথা বিংশ শতাব্দীতে আমাদের কাছে যেন কাহিনীরূপে পর্যবসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সত্য আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে; তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন গভীর বেদনায়—

> বাঁধন ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
> সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,—।

এইজন্যই দেখিতে পাই, পৃথিবীর প্রত্যেকটি পরিবর্তন, তাহার সকল বেশ-বদল—ঋতু-পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তাহার প্রাণস্পন্দন নিরন্তর দোলা দিয়াছে কবির চিত্তকে—সেই দোলার ভিতর দিয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন

ধরণীর আকর্ষণ—তিনি শুনিতে পাইয়াছেন ধরণীর স্নেহময় অন্তঃপুরে কবির সাদর আহ্বান। তাই—

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত ক্ষেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগতো পুলক কি মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কল-কথায়,
সেদিন মনে হ'তো-কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়-কুঞ্জ-ছায়ে;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে।

আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-ক্ষেতে
সূর্য-ওঠার রাঙা-রঙীন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠতো দুলে
কচি ধানের খাম-খেয়ালি খেলায়,
সেদিন আমার হ'তো মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তা'রি যজ্ঞশালায়,
কোন ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি!

(মাটির ডাক, পূরবী)

পৃথিবীর এই মাতৃমূর্তির আমরা প্রথম দেখা পাইয়াছি বেদের ভিতরে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ঋক্‌বেদের বহু ঋকে দ্যাবা-পৃথিবীর স্তব রহিয়াছে এবং সেখানে পৃথিবীকে মাতা বলিয়াই সর্বত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্যত্রও

প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ'—মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহবুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন (৫।৪২।১৬)। পৃথিবীর এই মাতৃমূর্তি সর্বাপেক্ষা পূর্ণ এবং সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে অথর্ববেদের পৃথিবী বর্ণনায়। সেখানে বলা হইয়াছে—

সত্য, বৃহৎ, ঋত, উগ্র, দীক্ষা, তপঃ, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে; সেই পৃথিবী যাহা কিছু ভূত—যাহা কিছু ভব্য—সকলের অধীশ্বরী (পত্নী)—সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করুক।[১] এই পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছে কত উচ্চতা—কত গমনশীলতা—কত সমতল—নানাবীর্য কত ওষধি (১২।১।২); ইহার ভিতরে আছে সমুদ্র—আছে সিন্ধু—আছে জল—আছে অন্ন—আছে কৃষিভূমি; ইহার ভিতরে কর্মচঞ্চল হইয়াছে তাহারা যাহারা প্রাণবন্ত—যাহারা চলে; সেই ভূমি আমাদিগকে প্রথম পেয় দান করুক (১২।১।৩)। এই পৃথিবীতে আমাদের পূর্বজনগণ পূর্বকালে নিজেদের বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল (যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে, ১২।১।৫); এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা, বসুন্ধরা—ইহাই প্রতিষ্ঠাস্থল; ইহা সুবর্ণবক্ষা, যাহা কিছু চলমান তাহাদের নিবেশনী; এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করে; ইন্দ্র ইহার ঋষভ—এই ভূমি আমাদিগকে সম্পদ দান করুক।[২] এই পৃথিবীর অমৃত হৃদয় পরম ব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে (যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ, ১২।১।৮)। এই পৃথিবীর উপরে জলধারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রিদিন সমানে অপ্রমাদে ক্ষরিত হইতেছে—সেই ভূমি আমাদিগকে দুগ্ধ দান করুক—আমাদিগকে ভাস্বর করিয়া তুলুক (১২।১।৯)। এই ভূমি আমাদিগকে সেই ভাবেই দুগ্ধ দান করুক যেমন মাতা দুগ্ধ দান করে তাহার পুত্রকে (স নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ, ১২।১।১০)। হে পৃথিবি, যাহা তোমার মধ্যদেশ, যাহা নাভী—যাহা কিছু বল তোমার দেহ হইতে জাত হইয়াছে—তাহাতেই আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর, আমাদিগকে পবিত্র কর—হে মাতা ভূমি, আমি

---

(১) সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তী।
স নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু॥ (১২।১।১)

(২) বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু॥ (১২।১।৬)

পৃথিবীর সন্তান।[১] বিশ্বের প্রসবিত্রী—ওষধিগণের মাতা ধ্রুবা ভূমি এই পৃথিবী, ধর্মের দ্বারা ধৃতা এই পৃথিবী—শিবা এবং সুখদা এই পৃথিবী—এই পৃথিবীতে আমরা সুখে বিচরণ করিব।[২] যে গন্ধ তোমা হইতে সম্ভূত, ওষধি যে গন্ধকে বহন করে, জল যে গন্ধকে বহন করে—যে গন্ধ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ ভোগ করে,—সেই গন্ধের দ্বারা হে পৃথিবী তুমি আমাকে সুরভি করিয়া তোল, কেহ যেন আমাদিগকে দ্বেষ না করে।[৩] তোমার যে গন্ধ পুষ্করে (নীলোৎপলে) প্রবেশ করিয়াছে; সূর্যের বিবাহে যে গন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল —অমর্ত্যগণ প্রথমে যে গন্ধ (গ্রহণ করিয়াছিল), পৃথিবি, সেই গন্ধের দ্বারা আমাকে সুরভিত কর,—আমাদিগকে কেহ যেন দ্বেষ না করে।[৪] এই পৃথিবীতে আছে শিলা, আছে ভূমি, আছে প্রস্তর—আছে ধূলি; হিরণ্যবক্ষ সেই পৃথিবীকে করি নমস্কার (১২।১।২৬)। হে পৃথিবি, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা সকল, তোমার শরৎ-হেমন্ত, শিশির-বসন্ত—এই তোমার সুনিয়ত ঋতুগুলি—এই তোমার দিনরাত্রি—ইহারা সকলেই আমাদের উপর রস বর্ষণ করুক।[৫] যাহাতে সকল অন্ন,—যাহাতে ব্রীহিযব,—যাহার এই পঞ্চ মানব—পর্জন্যপত্নী বর্ষা-পুষ্ট সেই ভূমিকে নমস্কার (১২।১।৪২)। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য তোমার ভূমিতে যে সভা, যে মিলন, যে সমাবেশ—আমরা সে সম্বন্ধে চারুবাক্যই বলিব (১২।১।৪৬)। যাহা বলিব তাহা মধুময় বলিব; যাহা কিছু দেখিব তাহাই আমার চিত্ত জয় করিবে (১২।১।৫৮), হে মাতা পৃথিবি, তুমি মঙ্গল সহ আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, দ্যুলোকের সহিত, হে কবি, আমাকে শ্রী এবং সম্পদে প্রতিষ্ঠিত কর।

(১) যৎ তে মধ্যং পৃথিবী যচ্চ নভ্যং যাস্ত ঊর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ॥ (১২।১।১২)

(২) বিশ্বস্বং মাতরমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা॥ (১২।১।১৭)

(৩) যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সম্বভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥ (১২।১।২৩)

(৪) যস্তে গন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ যং সঞ্জভ্রুঃ সূর্যায়া বিবাহে।
আমর্ত্যাঃ পৃথিবি গন্ধমগ্রে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥ (১২।১।২৪)

(৫) গ্রীষ্ম স্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহোরাত্রে পৃথিবি নো দুহতাম্॥ (১২।১।৩৬)

এই বৈদিক গাথা হইতে রবীন্দ্রনাথের গাথা কত পৃথক—আবার কত এক! বেশ বোঝা যায়, একটি মনই বহু যুগের বিবর্তনের ভিতর দিয়া পুরাতনের বৃন্তে কত নূতন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগের ভিতরে দেখিতে পাই, সৃষ্টির সকল রূপমুগ্ধতা, রসমাধুর্য, সকল রহস্যবোধ একটা অধ্যাত্ম অনুভূতি এবং বিশ্বাসের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে; তাহার ফলেই কবি নিজের ভিতরে অনুভব করিয়াছেন 'জীবন-দেবতা'কে আর সমগ্র বিশ্বে অনুভব করিয়াছেন এক বিশ্ব-দেবতার লীলা। পূর্বেই বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মদৃষ্টি এবং তাঁহার কবিদৃষ্টি এই উভয়ের ভিতরে কোথাও কোন অমিল বা বেসুর নাই; কারণ তাঁহার জীবনের যাহা কিছু সমস্তেরই মূল উৎস ছিল এক, তাই তাঁহার কবিজনোচিত রসানুভূতি এবং তাঁহার ঋষিজনোচিত অধ্যাত্ম অনুভূতিও ছিল এক। এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি লইয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আর মানুষের সঙ্গে কোথাও আর মানুষের সঙ্গে কোথাও যে এতটুকু অমিল নাই তাহার কারণ, ইহারা সকলেই সেই পরম এক হইতে জাত—সেই পরম একের লীলা-বিভূতিরূপে সেই একেরই প্রকাশ।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গ-মালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে;—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়। (নৈবেদ্য)

রূপের ভিতরে সৃষ্ট হইবার পূর্বে বস্তুর রূপহীন একটা অখণ্ড সত্তা আছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে একটি ব্যক্তিজীবনে রূপ লইবার পূর্বে তাঁহারও এই জাতীয় একটি রূপহীন সত্তা ছিল, সেই সত্তায় তিনি মিলিয়া ছিলেন বিশ্ব-সৃষ্টির সহিত—ইহাই কবির 'প্রাগ্‌ভাব'। আবার এই বিশ্বসৃষ্টি জুড়িয়া চলিয়াছে এক অদ্বয় প্রাণ-শক্তি বা সৃজনী-শক্তির অনাদি অনন্ত লীলা। কবি

এ জীবনে অনুভব করিতেছেন, এই বিশ্বব্যাপী সৃজনী-শক্তির সহিত তাঁহার ব্যক্তিপুরুষের যে লীলা তাহা শুধু কোনও একটি বিশেষ জীবনের নহে ;—তাহা শুধুমাত্র জন্মজন্মান্তরেরও নহে—তাঁহার 'প্রাগ্‌ভাবে'র ভিতরেও কতযুগ ধরিয়া চলিয়াছে এই লীলা।

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি। (উৎসর্গ)

এই যে বিশ্বব্যাপী এক প্রাণ-শক্তি বা সৃজনী-শক্তির লীলা ইহার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের মূল অনুভূতি এবং এই অনুভূতির প্রকাশ রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় জীবনের সকল গদ্য রচনায়— কবিতায় এবং নাটকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ কথাটা এতই প্রধান যে তাহা লইয়া কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বাল্মীকি-কালিদাস প্রভৃতির ভিতর দিয়া একটা অদ্বয়দৃষ্টিই যে ভারতীয় মনে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অদ্বয়দৃষ্টির উপরে প্রত্যক্ষ প্রভাব উপনিষদের। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ কোনও যুক্তিতর্কের উপরে গ্রথিত দার্শনিক মতবাদ নহে, সমস্ত ব্রহ্মবাদের এবং সেই ব্রহ্মবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত অদ্বয়বাদের পশ্চাতে একটি গভীর কবিদৃষ্টি রহিয়াছে, সেইখানেই উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথেরও গভীর যোগ। উপনিষদের বাণীই একদিন

তপোবন-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে

অগ্নিতে, জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। (নৈবেদ্য)

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

এই উপনিষদই বলিয়াছেন,

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা।

একদেব সর্বভূতের মধ্যে গূঢ় হইয়া আছেন, সর্বব্যাপী সর্বভূতের অন্তরাত্মা। 'ঈশা ব্যাপ্তমিদং সর্বং'—যাহা কিছু সবই সেই পরম পুরুষের দ্বারা ব্যাপ্ত; 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং'—তিনিই প্রকাশিত হইতেছেন, তাঁহার ভাস বা দীপ্তি লইয়াই আর সকলে তাঁহার পরে প্রকাশিত হইতেছে; তাঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, ইন্দ্র, বায়ু, যম প্রভৃতি তাঁহার ভয়েই ধাবিত হইতেছে; 'যতো বা ইমানি ভূতানি যায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'—যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জাত হইতেছে, যাহা দ্বারা জাত সকল বাঁচিয়া আছে—যাঁহাতে আবার প্রত্যাগমন করিয়া অভিপ্রবিষ্ট হইতেছে।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

ইহা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি জাত হয়, ইহাতেই আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের 'ধারিণী' পৃথিবী জাত হয়।

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষং
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।

ইহার ভিতরে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং মন ও সমুদয় প্রাণ অশ্রিত রহিয়াছে। এই পুরুষই 'সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি'—সকলকে আবৃত করিয়া ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্॥

বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া স্বমহিমায় অবস্থান করিতেছেন সেই এক; সেই পুরুষের দ্বারাই ইহা সব পূর্ণ। উপনিষদের ঋষিকবিগণের এই উদার বাণী

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে গভীর প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল, ঋষিকবিগণের সুরে তিনিও তাই নিজের সুর মিলাইয়া দিয়াছিলেন।

মধ্য জীবনে কোথাও কোথাও এই সর্বব্যাপী 'এক'কে কবি স্পষ্ট ব্রহ্মরূপেই স্বীকার করিলেও প্রৌঢ় জীবনে এবং বৃদ্ধ জীবনে এই 'এক'কে কবি আর কোনও স্পষ্ট ধর্মবিশ্বাসের কোঠায় টানিয়া আনেন নাই—'এক' সেখানে বিশ্বসৃষ্টির গূঢ় রহস্যের অন্তরালে একটি লীলা-চঞ্চলা সৃজনী-শক্তি—সৃষ্টি-প্রবাহের ভিতর দিয়া নিরন্তর নিজেকে প্রকাশিত করিয়া যাওয়াই তাহার স্বভাব—অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় সেই সৃজনী-শক্তির রূপ এবং স্বরূপ উভয়ই।

প্রকৃতির সহিত কবির দেহ-মন-অন্তরাত্মার এই গভীর যোগ আবার ঘনীভূত রূপে-রসে দেখা দিয়াছে কবির 'বনবাণী'র ভিতর দিয়া। কবির চিত্তে ধরা দিয়াছিল বনের যে বাণী, তাহারই প্রকাশ এই 'বনবাণী'। বনের প্রাণী হইল মুখ্যতঃ বৃক্ষগুলি—তাহারা ধরণীর প্রাণ-রসেরই মূর্ত বিগ্রহ, তাই তাহারা প্রাণী; তাহারা বোবা থাকে তাহাদের নিকট—জীবন রসের গম্ভীর রহস্য যাহারা বুঝিতে পারে না—তাহাদের বাণী অমোঘ রূপে দেখা দেয় জীবনের রসবেত্তার কানে ও প্রাণে। 'বনবাণী'র ভূমিকায় তাই কবি বলিয়াছেন,—

"আমার ঘরের আশে পাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তা'র ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়, তা'র কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।

"ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা'হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।"

গাছের এই বাণী যে প্রথম কান পাতিয়া শুনিয়াছিলেন ভারতবর্ষের আরণ্যক ঋষিরা এ-কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এই ভূমিকায়। সেই আরণ্যক ঋষিরাই বলিয়াছিলেন, গাছের এই ফুলে ফলে পল্লবে দেখা যায় "এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি।" তাঁহারাই প্রথম পাইয়াছিলেন

গাছের বাণী—"যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"—যাহা কিছু সকল প্রাণে অধিষ্ঠিত হইয়া চলিতেছে—প্রাণ হইতেই সকল নিঃসৃত। সেই আরণ্যক ঋষিরা "গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ'—প্রথম-প্রাণ তা'র বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগলো, তা'র কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা!"

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁহার বাস-ভবন, উপাসনা-মন্দির, বিদ্যালয় যাহা কিছু সমস্তরই চারিদিকে গাছ দিয়া ভরিয়া দিয়াছেন; তাহার কারণ, তিনি শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনকে। এই তপোবনের বাণী গাছের বাণী—সর্বব্যাপী প্রাণ-লীলার অফুরন্ত নিত্য নূতন বাণী। এই বাণীর সন্ধান হয়ত একদিন পাইয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যিনি বীরভূমের একটা মরুপ্রান্তর সদৃশ মাঠের ভিতরে তাঁহার ধ্যানের আসন পাতিয়াছিলেন একটি ছাতিম বৃক্ষের তলে। গাছের ভিতরে মৌন-মুখরতায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে যে প্রাণের ভাষা—উহাই প্রাণময়ের ভাষা, এই ভাষাই মহর্ষির প্রাণে আনিয়াছিল মুক্তির বাণী—এই ভাষার ভিতরেই রবীন্দ্রনাথও লাভ করিয়াছেন মুক্তির বাণী। যাহাতে এই বাণী স্পর্শ করে প্রত্যেকটি বালকের প্রাণ এই জন্যই তিনি ছাত্রদের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন শালবনে-ঘেরা আম্রকুঞ্জে'। এই শালবনের মর্মর—আম্রকুঞ্জের মুকুল-গন্ধ, রৌদ্রতপ্ত ঘাসের গন্ধের সঙ্গে 'মাটির মেঠো সুর'—আর তারই সঙ্গে পাখীদের কাকলী—যাহাতে শুধু সুর আছে—ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসানের অর্থ-ভরা কথা নাই—এই সকল মিলিয়া বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি-জীবনের গভীর যোগ আনয়ন করে, সেই গভীর যোগই বহন করে 'একে'র বাণী, সেই 'একে'র উপলব্ধিতেই চিত্তের মুক্তি। শান্তিনিকেতনের আম্রবনের সঙ্গে কবির ছিল তাই একটা আশৈশব আত্মীয়তা সেই আত্মীয়তাকেই তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন জীবনের অপরাহ্নে 'আম্রবন' কবিতায়।—

---

(১) আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতিমাঝে, ঊর্ধ্বে তুলি' ব্যগ্র শাখা তার
শরৎ প্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে, লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা-আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোকে লোকান্তরে,
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, স্ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত উৎসারিত। (প্রান্তিক)

সুদূর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
গন্ধে তব র'য়েছে সঞ্চিত,
ওগো আম্রবন।
যেন নাম-ধ'রে কোন কানে কানে গোপন মর্ম্মর
তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
আজি ক্ষণে ক্ষণ।

আমার ভাবনা আজি প্রসারিত তব গন্ধ সনে
জনম মরণ-পরপার,
ওগো আম্রবন,
যেথায় অমরাপুরে সুন্দরের দেউল-প্রাঙ্গণে
জীবনের নিত্য আশা সন্ন্যাসিনী, সন্ধ্যারতি-ক্ষণে
দীপ জ্বালি' তা'র
পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ।

'বনবাণী'র অন্তর্গত 'বর্ষামঙ্গল' ও 'বৃক্ষরোপণ' উৎসবের ভিতরে বৈদিক ঋষিগণ এবং প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নূতন মন্ত্র এবং সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। প্রথমেই দেখি 'বর্ষা-মঙ্গল গান'—সে বর্ষামঙ্গল-গানের সুরে অথর্ববেদের 'বর্ষা'র গানের সুরের ঝঙ্কার লাগে নাই এমন নহে (অথর্ব ৪।১৫)। এখানে যে কবি বলিলেন—

দহন-শয়নে তপ্ত ধরণী প'ড়েছিলো পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।

ইহার আভাস ঋকৃবেদের ইন্দ্রস্তবেও বহুস্থানে দেখিতে পাই।[১] তারপরে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম প্রভৃতির নিকটে শিশুবৃক্ষের জন্য যে প্রার্থনা জানান হইয়াছে সে প্রার্থনা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছড়াইয়া আছে বেদের বহু গাথায়। আশ্রম-প্রাঙ্গণে তরুণ অতিথি বালক-তরুদলকে সাদর আহ্বান জানান হইয়াছে—

আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে
চল আমাদের ঘরে চল।

(১) ঋক্-(১।৩৩।১১ ; ১।১৬৭।৩)।

শ্যাম-বঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কল-সঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল।

আশ্রম-তরুর এই শিশুরূপের মধুর পরিচয় আমরা পাইয়া আসিয়াছি রামায়ণে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে কালিদাসের রঘুবংশে, কুমার-সম্ভবে এবং শকুন্তলা নাটকে।

পৃথিবীর সহিত নাড়ীর বন্ধন এবং বৃক্ষের সহিত সোদর আত্মীয়তা কবি তাঁহার শেষদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই; নানাভাবে সেই আকর্ষণকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার 'গোধূলি'র কাব্য-সমূহের ভিতরেও। 'পরিশেষে'র 'সান্ত্বনা,' 'বোবার বাণী' প্রভৃতি কবিতার ভিতরেও রহিয়াছে ইহার মধুর পরিচয়।

পশ্চিম গগনে হেলিয়া-পড়া রবির দীপ্তি উজ্জ্বল মহিমা লাভ করিযাছিল 'পত্রপুটে'। সেখানে কবি তাঁহার সেই চিরপরিচিত পৃথিবীর সমগ্র পরিচয একসঙ্গে স্মরণ করিয়া বলিয়া গিযাছেন,—

বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে-মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে। (পত্রপুট, তিন)

সেই উপলব্ধি লইয়াই 'অবনত দিবাবসানের বেদীতলে' কবি শেষ প্রণাম রাখিয়া গিয়াছেন পৃথিবীর পদপ্রান্তে—

হে উদাসীন পৃথিবী
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥ (ঐ)

উপনিষদের ঋষিগণের 'দর্শন' বা উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই গ্রন্থে কবির 'দর্শন' গভীরতার সহিত একটা বলিষ্ঠতাও লাভ করিয়াছে। এই বলিষ্ঠতার পরিচয় শুধু ভাবে নয়, এখানকার ভাষাতেও। রবীন্দ্রনাথের বহু লেখার ভিতরে একটা বৈদিক বিশ্বাস প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে,—আলোই সৃষ্টির বাহন; এই আলোর পাখায় ভর করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে সৃষ্টির স্বপ্ন—

সেই আলো-বাহিত স্বপ্ন বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে অসংখ্য বস্তুসত্তায়। সেই আলো চেতনার ভিতর দিয়া লাভ করিতেছে জ্যোতির্ময় রূপ; তখন তিরোহিত হয় স্থূল দেহভার, অপসৃত হয় 'অন্ধকার রাতের নানা ব্যর্থ ভাবনার অত্যুক্তি', তখন অনুভবে আসে নিজের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুর তেজোময় অগ্নিকণার রূপ—এই তেজোময় রূপের ভিতর দিয়া বিশ্ব-সবিতার সঙ্গে ও পৃথিবীর সঙ্গে অন্বয়যোগ।

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম-সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তা'র উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ ক'রে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
... ...
তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষি-কবির প্রার্থনা মন্ত্র,—
যে মন্ত্রে বলেছিলেন,—হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত কর সেই আবরণ।
আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ,
বলি,—হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন,—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু,
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
আমার অন্তরতম সত্য
আদিযুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে—
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন
সেই সত্য তোমারি।[১] (পত্রপুট, দশ)

---

(১) হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ (ঈশ, ১৫-১৬)

ধর্মের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে 'ব্রাত্য, জাতিহারা'; বিধান-বাঁধা মানুষ তাঁহাকে মানুষ করে নাই, শাস্ত্রের প্রাচীর-ঘেরা শাণ-বাঁধান পথে তাঁহার গতি ছিল না, পূজামন্দিরের রুদ্ধদ্বারে তিনি সত্যের সন্ধান করেন নাই, মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই কোন আচারশীল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাছে; মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন পৃথিবীর নিকট হইতে—

সকল বেড়াব বাইরে
নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
বেদনা-বন্ধুর পথে।

পৃথিবীর সেই মন্ত্র অগ্নিব মন্ত্র—আলোর মন্ত্র—প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্র;—এই আলোব মন্ত্র লইয়া রীতিবন্ধনের বাহিরে সারা জীবন চলিয়াছে কবির আত্ম-বিস্মৃত পূজা,—তাই তিনি ব্রাত্য, তিনি জাতিহীন—পংক্তিহীন।

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনেব আদি মন্ত্রটি
পেযেছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে—
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারিকেল শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে,
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।

হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্ত-চাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্মপূর্বের কোন পুরাতন কালযাত্রা থেকে।
(পত্রপুট, পনেরো)

এই যে বিশ্বময় আলোর মন্ত্র বা অগ্নিমন্ত্র ভারতবর্ষে তাহা প্রথম উদ্গীত হইয়াছিল বৈদিক ঋষি-কবির কণ্ঠে। অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তে বলা হইয়াছে—

অগ্নির্ভূম্যামোষধীষ্বগ্নিমাপো বিভ্রত্যগ্নিরশ্মসু।
অগ্নিরন্তঃ পুরুষেষু গোষ্বশ্বেষ্বগ্নয়ঃ॥
অগ্নির্দিব আ তপত্যগ্নের্দেবস্যোর্বন্তরিক্ষম্।
অগ্নিং মর্তাস ইন্ধতে হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্।
অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যসিতজ্ঞূস্ত্বিষীমন্তং সংশিতং মা কৃণোতু॥
(১২।১।১৯-২১)

"অগ্নি ভূমিতে, ওষধিতে,—জলসমূহ অগ্নিকেই বহন করে,—পাষাণের মধ্যেও অগ্নি; পুরুষগণের মধ্যে অগ্নি—অগ্নি গাভীর মধ্যে—অশ্বের মধ্যে। দ্যুলোক হইতে অগ্নি তাপ দান করে, অগ্নিদেবেরই এই বিশাল অন্তরিক্ষ; হব্যবাহ এবং ঘৃতপ্রিয় অগ্নিকে মর্ত্যবাসীরা ইন্ধনের দ্বারা প্রজ্বলিত করে। অগ্নিবাসা অসিতজাণু পৃথিবী আমাকে ভাস্বর এবং তীক্ষ্ণ করিয়া তুলুক।"[১]

---

(১) তুলনীয়—আত্মাঽসি বায়োর্জ্বলন শরীরমসি বীরুধাম্।
যোনিরাপশ্চ তে শুক্র যোনিস্ত্বমসি চাম্ভসঃ॥

... ...

সর্বমগ্নে ত্বমেবৈকস্ত্বয়ি সর্বমিদং জগৎ।
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ॥
মহাভারত—পি. পি. এস্. শাস্ত্রীর সংস্করণ,
আদিকাণ্ড—(২১৭।২৫, ৩০)

হে জ্বলন, তুমি বায়ুর আত্মা, লতাসমূহের শরীর; তোমা হইতেই জলের উৎপত্তি, তোমারই শুক্র, আকাশের তুমিই উৎপত্তিস্থল।...তুমি এক হইলেও সকলই তুমি, এই নিখিল জগৎ তোমাতেই (বিধৃত) আছে। তুমিই ভূতগণকে ধারণ কর, তুমিই সকল ভুবনকে ভরণ কর।

আলোচনার সমাপ্তিতেও কবির গান মনে পড়িতেছে,—

'পূর্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের ধারে আসি'।

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির পূর্বাচলে তাকাই,—কতদূরে রহিয়াছেন সেই সবিতার জ্যোতির ধ্যানকারী, জননী পৃথিবীর স্তবগানকারী প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ—তারপরে সেই উপনিষদের দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপিয়া একের বাণী—তারপরে রামায়ণ-মহাভারতের যুগের বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঐকাত্ম্যযোগের সেই সরল বিশ্বাস, আর তাহার সহজ প্রকাশ—শৈব কালিদাসের মণ্ডনশ্রী সুশোভিত সৃষ্টি-স্রষ্টা পার্বতী-পরমেশ্বরের মিলন—তাহার পরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত কবিমনের ভিতর দিয়া সেই ভারতীয় মনের অদ্বয়-বিশ্বাসের প্রকাশ,—তাহার বহু পরে বহু শতাব্দীর অতীত-প্রবাহের স্রোতমুখে বিরাট কবিদৃষ্টি লইয়া রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

কবির কণ্ঠে পুরাতন গানে কি বিচিত্র সুর—নিত্য নূতন কত তাহাতে ঝঙ্কার। এইখানেই শেষ নহে—'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' এই ঝঙ্কারই নিজেকে রূপায়িত করিবে নব নব পরিণতিতে। আমরা যদি এই যোগকে স্বীকার করি, সমগ্র দেহ-প্রাণ দিয়া বরণ করি,—আমরা বলিষ্ঠ হইব। বড় দানকে গ্রহণ করিতে চাই বড় অধিকার—নিজেদের ক্ষুদ্রতাকে লইয়া এই দানের সম্মুখে আমরা যেন বিমূঢ় হইয়া না পড়ি—ইহাকে এড়াইয়া চলিবার দুর্বলতার যেন জয়লাভ না ঘটে; ইহাকে দুই হাতে গ্রহণ করিবার ভিতরে আছে যে বীর্যের পরিচয় তাহাতেই লাভ হইবে আমাদের প্রতিষ্ঠা।

॥ সমাপ্ত ॥